প্রকাশক
শ্রীদেবব্রত মৈত্র
৮বি, কলেজ রো,
কলিকাতা-৭০০০০৯

১৯৫৮

মুদ্রণে
নিউ ঘোষ প্রেস
৪/১ ই, বিডন রো,
কলিকাতা-৭০০০০৬

গড়গড়ি কাহিনী

সুচনা

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা মহাদেববাবু মজলিস করিয়া বসেন। সেই মজলিসে যাদব, মাধব, রাঘব, ত্রিলোচন, গদাধর, ঘনশ্যাম প্রভৃতি বন্ধুগণ নিয়মিতরূপে উপস্থিত থাকেন। সেই মজলিসে সকলে গাঁজার ধূম পান করেন। মহাদেববাবুর টাকায় সভার সমুদয় ব্যয় নির্বাহিত হয়। সুতরাং মহাদেববাবু আড্ডাধারী দলের দলপতি। সভার সভ্যগণ সর্বদা তাঁহার প্রিয়পাত্র হইতে চেষ্টা করেন। ভালরূপে আজগুবি গল্প করিতে পারিলেই মহাদেববাবুর সন্তোষভাজন হইতে পারা যায়। গাঁজার ধূম পান করিতে করিতে সভায় প্রতিদিন নানারূপ গল্প হয়।

বর্ষাকাল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আছে। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। পূর্বদিক হইতে ফুর ফুর করিয়া বায়ু প্রবাহিত হইতেছে।

মহাদেববাবু বলিলেন,—"এই দুর্যোগের সময় মজার দুই-একটি গল্প না হইলে প্রাণ শিথিল হইয়া যায়। কাহারও তবিলে কি একটিও ভাল গল্প নাই?"

যাদব বলিলেন,—"কী গল্প শুনিতে ইচ্ছা করেন? একটা ভূতের গল্প করিব?"

মহাদেববাবু উত্তর করিলেন,—"নূতন ধরনের ভূতের গল্প হয় তো বল। পচা গল্প শুনিতে ইচ্ছা হয় না।"

হলধর বলিলেন,—"ভূতের গল্প, সাপের গল্প, বাঘের গল্প, চোর-ডাকাতের গল্প, রাজা-রানীর গল্প, যুদ্ধের গল্প, এ-সব অনেক হইয়া গিয়াছে। নূতন আর কিছু নাই।"

মহাদেববাবু বলিলেন,—"সেকালের মতো একালে আশ্চর্য ঘটনাও ঘটে না। আরব্য উপন্যাসের লোকে কত জিন্ দেখিতে পাইত। পঞ্চাশের উপর আমার বয়স হইয়া গেল। এ পর্যন্ত একটা জিন্ কি

একটা পরীও আমি দেখি নাই। সেজন্য আরব্য উপন্যাসের মতো গল্পও আর একালে হয় না।"

রাঘব বলিলেন,—"একালে তেমন বাদশাও নাই, তেমন রাজাও নাই। বিক্রমাদিত্যের মতো রাজা একালে থাকিলে, কত বত্রিশ-সিংহাসন, কত বেতাল-পঞ্চবিংশতি হইত।"

ঘনশ্যাম বলিলেন,—"ভাল কথা বলিলে! একটি লোকের কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। কিছুদিন পূর্বে বাঁকুড়া হইতে আমাদের বাসায় একজন আসিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত অতি অদ্ভুত। প্রতিদিন রাত্রিতে শয়ন করিয়া সেই গল্প তিনি আমাদের নিকট করিয়াছিলেন। তাহার অনেক কথা আমি একখানি খাতায় লিখিয়া লইয়াছিলাম। ঠিক যেন আরব্য উপন্যাস কি বেতাল পঁচিশের গল্প। এ কলিকালে যে এরূপ ঘটনা হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস হয় না।"

আগ্রহ সহকারে সকলেই সেই গল্প শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ঘনশ্যামবাবুর মনে মনে গৌরব বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন,—"না না, সে মিথ্যা গল্প। লোকটা গল্পে। তাহার কথা বিশ্বাস হয় না, সে-গল্প শুনিবার উপযুক্ত নহে"

হলধর বলিলেন,—"যদি বেতাল-পঁচিশের মতো গল্প হয়, তাহা হইলে এই বাদলার সময় বড়ই মিষ্ট লাগিবে। বল না, ভাই ঘনশ্যাম! সে কী গল্প?"

ঘনশ্যাম উত্তর করিলেন,—"সে কাজের গল্প নহে। সে লোকটা হয় তো গাঁজাখোর। তাহার গল্প শুনিবার উপযুক্ত নহে।"

রাঘব বলিলেন,—"আমরাই কোন গাঁজাখোর নই! গাঁজা-খোরের গল্প গাঁজাখোরকেই ভাল লাগে।"

ঘনশ্যাম বলিলেন,—"গাঁজাখোর বলিলাম বটে, কিন্তু গাঁজা খাইতে তাহাকে আমি কখনো দেখি নাই। গুড়ুক পর্যন্ত সে খায় না। তবে তাহার নিজের মুখেই আমি শুনিয়াছি যে, সে একবার পাগল হইয়া গিয়াছিল। পাগলের গল্প শুনিয়া কী হইবে?"

যাদব বলিলেন,—"তা হউক! পাগলের গল্পই আমরা শুনিব।"

এইরূপে সকলে অনেক সাধ্য-সাধনা করিলেন, কিন্তু ঘনশ্যাম সে-গল্প বলিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। নিরাশ হইয়া সকলে অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। তখন ঘনশ্যামবাবুর ভয় হইল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, সকলে যখন আরও অনেক সাধ্য-সাধনা করিবে, তখন তিনি গল্প আরম্ভ করিবেন। এখন আর কেহ অনুরোধ করিল না দেখিয়া তাঁহার ভয় হইল যে, পাছে গল্পটি বলা না হয়। তিনি ভাবিলেন আর একবার অনুরোধ করিলেই আমি গল্প করিব।

কিন্তু সে-অনুরোধ কেহই আর করিল না। তখন ঘনশ্যাম বাবুকে নিজেই সেই কথা পুনরুত্থাপন করিতে হইল। তিনি বলিলেন,—"গড়গড়ি মহাশয় যে-গল্পটি করিয়াছিলেন, আমার তাহা ভাল লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু তোমাদের ভাল লাগিবে কিনা, সেই ভয়ে আমি বলিতে সাহস করি নাই।"

আড্ডাধারী মহাদেববাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। গম্ভীর স্বরে এখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গড়গড়ি মহাশয় কে?"

ঘনশ্যাম উত্তর করিলেন,—"সেই বাঁকুড়ার লোক, যিনি আমাদের নিকট তাঁহার অদ্ভুত জীবন-বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার নিবাস মানভূম জেলা। কিন্তু এখন তিনি বাঁকুড়া জেলায় শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছেন। তিনি লেখাপড়া জানেন। ইংরাজীতে দুই একটা পাস দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কাহিনী শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ঠিক আরব্য উপন্যাস কি বেতাল-পঁচিশের মত গল্প।"

মহাদেব বাবু বলিলেন,—"গল্পটি যদি এত ভাল, তবে বলই না কেন ছাই! কিন্তু সকলে যতই তোমায় অনুরোধ করিল, ততই যেন তোমার লেজ মোটা হইয়া উঠিল।"

ঘনশ্যাম বলিলেন,—আপনার যখন শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে, তখন নিশ্চয় আমি বলিব। কিন্তু এ একটি গল্প নয়। আরব্য উপন্যাসের মতো অনেকগুলি গল্প। দিনারজাদির মতো আজ সূচনা করিয়া রাখি। তাহার পর আমার খাতাখানি আনিয়া প্রতিদিন কিস্তিবন্দী করিয়া কিছু কিছু বলিব।"

মহাদেববাবু সে-কথায় সম্মত হইলেন। ঘনশ্যামবাবু গল্প আরম্ভ করিলেন।

ঘনশ্যামবাবু বলিলেন—"যাঁহার নিকট আমি এ গল্প শুনিয়াছি, তাঁহার নাম সুবল গড়গড়ি। আমার নিজের কথায় আমি এ গল্প করিব না। গড়গড়ি মহাশয় যেভাবে আমাদের বাসায় বলিয়াছিলেন, আমিও সেইভাবে তাঁহার কথায় গল্পটি করিব।"

প্রথম রজনী

গড়গড়ি মহাশয়

গড়গড়ি মহাশয় বলিতেছেন,—

আমার নাম সুবলচন্দ্র গড়গড়ি। আমাদের বাড়ি মানভূম জিলার সামান্য একখানি গ্রামে। আমাদের গ্রামের নিকট অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে। নিকটে বনও আছে। সেই বনে পূর্বে অনেক ব্যাঘ্র ও ভল্লুক বাস করিত। কখনো কখনো বন্য হস্তীরও উপদ্রব হইত। গ্রামের নিকট আমাদের কিছু সম্পত্তি ছিল। আমাদের নিজের চাষবাসও ছিল।

সে-জন্য সেই সামান্য স্থানে আমরা সম্পত্তিশালী লোক বলিয়া পরিগণিত ছিলাম। পুরুলিয়ার জিলা স্কুলে প্রথম আমি বিদ্যা-শিক্ষা করি। সে স্কুল হইতে পাস দিয়া কলিকাতার কলেজে আমি অধ্যয়ন করি। কলিকাতার কলেজ হইতে আর-একটা পাস দিলাম। ইহার কিছুদিন পরেই আমার পিতার পরলোক হইল। সেজন্য আর আমার লেখাপড়া হইল না। পৈতৃক সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য আমাকে দেশে ফিরিতে হইল।

সে সময় সংসারে আমার মাতা, আমার পরিবার ও এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল অক্রূর, কিন্তু তাহাকে আমরা "ওক্কুর" বলিয়া ডাকিতাম। যখন পিতার পরলোক হয়, তখন ভ্রাতার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসরের অধিক হয় নাই। কনিষ্ঠকে আমি

প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতাম। মাতাঠাকুরানীরও সে চক্ষুর পুত্তলিস্বরূপ ছিল। আমার পরিবারও তাহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন।

বাঁকুড়া জেলার কুতুবপুর নামক গ্রামে আমার শ্বশুরালয়। এক্ষণে সেই স্থানে আমি বাস করিতেছি। আমার শ্বশুরের পুত্র অথবা অন্য কন্যা ছিল না। আমার পিতার পরলোকের পাঁচ বৎসর পরে আমার শ্বশুর-মহাশয়ও ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি আমার স্ত্রী পাইলেন। এই সম্পত্তি পাইয়া আমি মনে করিলাম যে, নিজে আমি ভালরূপে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারি নাই; কনিষ্ঠ অক্রূরকে ভালরূপে লেখাপড়া শিখাইব। এইরূপ মনে করিয়া আমি তাহাকে কলিকাতায় আনিয়া ভাল একটি স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলাম। কলিকাতায় যাহাতে সে পরম সুখে দিনযাপন করিতে পারে, সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া পুনরায় আমি দেশে ফিরিয়া গেলাম।

আরও পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। ভ্রাতার লেখাপড়া বিষয়ে আমি বড়ই নিরাশ হইলাম। তাহার এখন যেরূপ বয়স, তাহাতে তিনটা পাস দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত সে একটিও পাস দিতে পারিল না। পূজা ও গ্রীষ্মের অবকাশে যখন সে বাড়ি থাকিত, তখন তাহার কথা-বার্তায় আমি সন্তোষলাভ করিতে পারি নাই। তাহার চালচলন সম্পর্কেও ক্রমে দুই-একটা কথা আমার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। কলিকাতায় খরচের জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা অধিক টাকা প্রতি মাসে আমি তাহাকে দিতাম। কিন্তু ক্রমে আমি শুনিতে পাইলাম যে, তাহা ব্যতীত মাঝে মাঝে সে গোপনভাবে মাতার নিকট হইতে আরও অনেক টাকা লইত। এই কথা শুনিয়া আমি কলিকাতায় আসিয়া তাহাকে মিষ্ট বাক্যে অনেক বুঝাইলাম। টাকা যে সে অপব্যয় করে নাই, তাহার প্রমাণস্বরূপ সে আমাকে অনেক প্রকার হিসাব দেখাইল। কিন্তু সে যে আমাকে মিথ্যা কথা বলিতেছে এবং বাজে কাজে টাকা উড়াইতেছে এখন তাহা আমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম। আমি মনে করিলাম যে, ইহার লেখাপড়া আর হইবে না, ইহাকে আর কলিকাতায় রাখা উচিত নহে। দেশে লইয়া গিয়া

শীঘ্রই ইহার বিবাহ দিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি তাহাকে দেশে লইয়া যাইতে অনেক চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে কিছুতেই সম্মত হইল না। কলিকাতায় থাকিয়া এখন হইতে যত্ন করিয়া লেখাপড়া শিখিবে, আমার নিকট বার বার সে এইরূপ অঙ্গীকার করিল। অগত্যা একেলাই আমি দেশে ফিরিলাম।

বাড়ি গিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। তাহার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই সময়ে আমাদের মাতাঠাকুরানীর পরলোক হইল। সুতরাং বিবাহ-বিষয়ে অন্ততঃ এক বৎসর কাল বিলম্ব হইয়া গেল। মাতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে কনিষ্ঠকে দেশে আনাইলাম। তাহার চালচলন দেখিয়া আমি বড়ই অসন্তুষ্ট হইলাম। মনে করিলাম যে, তাহাকে আর কলিকাতায় পাঠাইব না। মিষ্টবাক্যে তাহাকে অনেক বুঝাইলাম, কিন্তু সে আমার কথা শুনিল না। আমার অমতেই কলিকাতায় চলিয়া গেল।

কলিকাতায় আমার দুই তিনটি বন্ধু ছিলেন। আমার ভ্রাতার প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিতে তাঁহাদিগকে আমি অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাঁহারা আমাকে মাঝে মাঝে পত্র লিখিতেন। সেই সমুদয় পত্রে ক্রমাগতই মন্দ সংবাদ আসিতে লাগিল। আমার ভ্রাতার চরিত্র দিন দিন মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। ভ্রাতাও আমার নিকট ক্রমাগত টাকা চাহিতে লাগিল। এত দিন মাতার নিকট হইতে গোপনে টাকা লইয়া সে অকুলান কুলান করিত। এখন মাতা নাই। টাকার জন্য আমাকে না লিখিলে আর উপায় নাই। প্রথমপ্রথম ভয়ে ভয়ে নানারূপ ওজর করিয়া সে আমার নিকট টাকা চাহিত। কখনো পীড়া হইয়াছে, কখনো চুরি গিয়াছে, কখনো টাকা হারাইয়া গিয়াছে, পুস্তক কিনিতে হইবে, কাপড় কিনিতে হইবে,···অন্যায় খরচের নিমিত্ত টাকা আবশ্যক হইলে প্রথম প্রথম এইরূপ নানা প্রকার ওজর করিয়া সে আমাকে চিঠি লিখিত। কিন্তু ক্রমে তাহার সে ভয় দূর হইল। পৈতৃক বিষয়ের সে একজন অংশীদার, অর্ধাংশের উপর তাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, সেই টাকা লইয়া সে যাহা ইচ্ছা করিবে,—ক্রমে ক্রমে

সে আমাকে এইরূপ অসম্মানসূচক পত্র লিখিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য যে এইরূপ পত্র পাইয়া প্রথম আমি যার-পর-নাই বিস্মিত হইলাম ও তাহার পর ঘোরতর দুঃখিত হইলাম। ভ্রাতাকে বুঝাইবার জন্য আমি কলিকাতায় আসিলাম। সেখানে আসিয়া আমি তাহাকে অনেক বুঝাইলাম। কিন্তু সে আমার মুখের উপর উত্তর করিতে লাগিল। যাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করি, যাহাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসি সে আমার সহিত এইরূপ কথাবার্তা করিতে লাগিল, এ দুঃখ কি আর রাখিবার স্থান আছে! ভ্রাতাকে কত বুঝাইলাম, কত মিনতি করিয়া তাহাকে বলিলাম। কিন্তু আমার কথা অপেক্ষা তাহার বন্ধুদিগের কথা তাহার নিকট অধিক হইল। দেশে লইয়া যাইবার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে আমি তাহার হাত ধরিলাম। আমার হাত ছাড়াইয়া সে বাসা হইতে চলিয়া গেল।

ঘনশ্যাম বলিলেন,—"গড়গড়ি মহাশয় এইরূপে আমাদের নিকট তাঁহার জীবন-বিবরণ প্রদান করিতে লাগিলেন। আজ রাত্রি হইয়াছে, আজ এই পর্যন্ত থাকুক। কাল আমার খাতা লইয়া আসিব। যতদূর হয়, কাল পুনরায় গড়গড়ি মহাশয়ের গল্প করিব।"

দ্বিতীয় রজনী

গুরুদেব

পরদিন ঘনশ্যাম পুনরায় গল্প আরম্ভ করিলেন।

গড়গড়ি মহাশয় বলিতেছেন—

যদিও আমি নিজে এ পর্যন্ত দীক্ষা গ্রহণ করি নাই, তথাপি শ্রীযুক্ত শ্রীল গোলোক চক্রবর্তী মহাশয় আমাদের বংশের গুরুদেব। ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ি আমাদেরই গ্রামে। কিন্তু তিনি বারো মাস কলিকাতাতেই থাকিতেন, কেবল প্রতিবৎসর পূজার সময় এক মাসের জন্য দেশে যাইতেন। আমি মনে করিলাম যে, কনিষ্ঠকে বুঝাইবার জন্য ঠাকুর মহাশয়কে অনুরোধ করি। ঠাকুর মহাশয় পূর্বে একটি হোটেল

করিয়াছিলেন। হোটেলের কাজে তাঁহার লাভ হয় নাই। এক্ষণে তিনি পাঁঠার দোকান করিয়াছেন। সন্ধান করিয়া আমি সেই পাঁঠার দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। রাস্তার ধারেই দোকান। সেই দোকানে দুইটি ছাড়ানো ছাগল ঝুলিতেছিল। ঠাকুর-মহাশয় তখন ব্যস্ত ছিলেন। একজন খরিদদারকে তখন তিনি আধসের মাংস বিক্রয় করিতেছিলেন। ঠাকুর-মহাশয় বলিতেছিলেন যে, সে-মাংস টাটকা। খরিদদার বলিতেছিল যে, সে-মাংস বাসি। খরিদদার ইহাও বলিল যে, সে খাসি; ঠাকুর-মহাশয় বলিলেন যে, না, সে পাঁঠা। খরিদদার বলিল যে, পিঠের দাঁড়ার মাংস ভাল, সেই মাংস আমি লইব। ঠাকুর মহাশয় বলিলেন যে, পাঁজরার মাংস ভাল, তাহাই লইয়া যাও।

মাংস লইয়া খরিদদার প্রস্থান করিলে, ঠাকুর মহাশয়কে আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। ঠাকুর-মহাশয়ের দক্ষিণ পদ কিছু স্থূল ছিল, অর্থাৎ সে পায়ে গোদ ছিল। সেই স্থূল পাদপদ্মটি তিনি আমার মস্তকে তুলিয়া দিলেন। গোদের গ্যাঁজ হইতে রস প্রবাহিত হইয়া আমার মস্তক সিক্ত হইল, দুই-চারি ফোঁটা আমার চক্ষুর উপর দিয়া বহিয়া গেল। নানারূপ আশিস্ বচনে সম্ভাষণ করিয়া ঠাকুর-মহাশয় আমাকে বাড়ির ভিতর লইয়া গেলেন। একখানি খোলার বাড়িতে ঠাকুর-মহাশয়ের দোকান ছিল। পথের ধারেই দোকান। তাহার পশ্চাতেই ভিতর দিকে খোঁয়াড়। সেই খোঁয়াড়ের ভিতর অনেকগুলি ছাগল ছিল। খোঁয়াড়টি দিন দুই প্রহরেও অন্ধকারে পরিপূর্ণ থাকে। সে জন্য কিরূপ ছাগল ও কতগুলি ছাগল তাহার ভিতর ছিল, তাহা আমি প্রথমে দেখিতে পাই নাই। খোঁয়াড়ের পশ্চাতে বাড়ির সবশেষে, আর-একখানি ঘর। সেই ঘরে ঠাকুর-মহাশয় রন্ধন ও শয়ন করেন। সেই ঘরখানির সম্মুখে একটি বারেণ্ডা ও তাহার পর একটু উঠান ছিল। সেজন্য খোঁয়াড়ের মতো এখানে অন্ধকার ছিল না। ঠাকুর-মহাশয় সেই বারেণ্ডায় আমাকে বসাইলেন। কলিকাতার ও দেশের নানারূপ কথার পর, আমার ভ্রাতার কথা গুরুদেবকে আমি বলিলাম। কিন্তু গুরুদেব আমার সে-কথায় বড় কান দিলেন না। সে-ক্ষেত্রে তিনি যাহা

কিছু বলিলেন, আমার ভ্রাতার পক্ষেই তাহা তিনি বলিলেন—'সে বিশেষ কোনো মন্দ কাজ করে নাই, বড় হইলে তাহার চরিত্র সংশোধিত হইয়া যাইবে,'—এইরূপ ভ্রাতার পক্ষ হইয়াই তিনি আমাকে বুঝাইলেন। লোকপরম্পরায় আমি ইতিপূর্বে শুনিয়াছিলাম যে, ঠাকুর-মহাশয়ের সহিত আমার ভ্রাতার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। ঠাকুর-মহাশয়ের বয়ঃক্রম পঞ্চাশের অধিক; আমার ভ্রাতার ইয়ার তিনি নহেন। কিন্তু নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি ওক্কুরকে কাজে লাগাইতেছেন। এক্ষণে আমার মনে সন্দেহ হইল যে, ওক্কুর যে ভাবে চলিতেছে, সেইভাবে চলিলে গুরুদেবের লাভ আছে, নিতান্ত অলাভ নাই। কথোপকথন করিতে করিতে খোঁয়াড়ের ভিতর হইতে ছাগলদিগের কাতরতাসূচক চীৎকার আমি বার বার শুনিতে পাইলাম। অনেকক্ষণ সেখানে বসিয়া এখন আর আমার ততটা অন্ধকার বোধ হইল না। আমি দেখিলাম যে, ছাগলগুলি অস্থিচর্মসার হইয়া গিয়াছে, ক্ষুধায় ও পিপাসায় তাহারা ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। খোঁয়াড়ে স্থান অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। তাহার ভিতর দশটি ছাগল ধরে কি না সন্দেহ। কিন্তু ঠেশাঠেশি করিয়া ঠাকুর মহাশয় পঁচিশটির অধিক ছাগলে তাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। অতি কষ্টে গায়ে গায়ে ঠেশা-ঠেশি করিয়া তাহারা দাঁড়াইয়া ছিল, শয়ন করিবার স্থান একেবারেই ছিল না।

আমি বলিলাম,—"ঠাকুর-মহাশয়! আপনার ছাগলগুলির বোধ হয় বড় জল-পিপাসা পাইয়াছে।"

গুরুদেব উত্তর করিলেন,—"দুই-একদিনে সমুদয় শেষ হইয়া যাইবে। জল দিবার আর আবশ্যক নাই।"

আমি বলিলাম,—"উহাদের ক্ষুধাও বোধ হয় পাইয়াছে।"

গুরুদেব বলিলেন,—"ক্ষুধা নিশ্চয় পাইয়াছে। আজ তিন দিন উহাদিগকে ক্রয় করিয়া আনিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"উহাদিগকে কী খাইতে দেন?"

গুরুদেব উত্তর করিলেন,—"খাইতে! খাইতে আবার কী দিব! খাইতে দিলে আর ব্যবসা চলে না।"

আমি বলিলাম,—"এরূপ কয় দিন ইহারা অনাহারে থাকে?"

গুরুদেব বলিলেন,—"সাত-আট দিনের অধিক ইহাদিগকে অনাহারে থাকিতে হয় না। সাত-আট দিনের মধ্যেই এক এক খেপ শেষ হইয়া যায়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"একটু একটু জল পান করিতে দেন না কেন?"

গুরুদেব উত্তর করিলেন,—"উহারা গায়ে গায়ে দাঁড়াইয়া আছে। পিপাসায় উহাদের জ্ঞান নাই। জল দিলে বড়ই গোলমাল করে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তবে এ সাত-আট দিন একটু জল পর্যন্ত উহারা পায় না?"

গুরুদেব বলিলেন,—"পূর্বে দুই-এক দিন অন্তর এক-আধ কলসী জল দিতাম। কিন্তু জল দেখিলে তাহা পান করিবার জন্য বড়ই হুড়া-হুড়ি করে। সেজন্য আর দিই না।"

খোঁয়াড়ের দিকে একটু নিরীক্ষণ করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, —"এগুলি কি খাসি?"

গুরুদেব উত্তর করিলেন,—"খাসি! খাসি কোথায় পাইব! খাসির দাম দিবে কে? দুই পয়সা উপার্জন হইবে বলিয়া ব্যবসা করিতেছি। খাসির মাংস দিলে কি আর চলে!"

আমি বলিলাম,—"পাঠাও তো নয়!"

গুরুদেব বলিলেন,—"পাঁঠা! তুমি পাগল! পাঁঠার দাম কত! লোককে দেখাইবার নিমিত্ত কেবল তিন-চারিটি পাঁঠা রাখিয়াছি। বাকিগুলি পাঁঠী।"

আমি অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"পাঁঠী! সে কি! স্ত্রী পশু না খাইতে নাই?"

গুরুদেব উত্তর করিলেন,—"আমি নিজে খাই না, আমি বিক্রয় করি। আমার শিষ্য যজ্‌মান আছে। মাছ-মাংস একেবারে আমি খাই না। সকলেই জানে যে, গোলোক চক্রবর্তী নিষ্ঠাবান্ সদ্‌ব্রাহ্মণ। লেখা-পড়া জানি না, নিজের নামটিও সই করিতে পারি না, ঢেরা দিয়া

সারি। তবুও দেখ, এই নিষ্ঠার জন্য তোমার বাপ-মায়ের কল্যাণে সকলেই আমাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।”

আমাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় বাহিরে একজন খরিদদার আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুর-মহাশয় তাড়াতাড়ি বাহিরে গমন করিলেন। খরিদদারের সহিত তাঁহার কথা-বার্তায় আমি বুঝিতে পারিলাম যে, সে পাঁঠার মাংস ভিন্ন অন্য মাংস লইবে না ; পাঁঠা তাহাকে দেখাইয়া তৎক্ষণাৎ কাটিয়া দিতে হইবে। তাহার জন্য সে অধিক মূল্য দিতে প্রস্তুত আছে। খোঁয়াড়ের ভিতর যে তিন চারিটি পাঁঠা ছিল, তাহার একটিকে ঠাকুর-মহাশয় অনেক কষ্টে বাহির করিয়া খরিদদারকে দেখাইলেন। ক্রেতার তাহা মনোনীত হইল। তাহার পর ঠাকুর-মহাশয় সেই পাঁঠাকে বাড়ির ভিতর আনিলেন। যেখানে আমি বসিয়াছিলাম, তাহার নিকটে দুইটি খোঁটা ভূমিতে প্রোথিত ছিল। পাঁঠাকে ফেলিয়া ঠাকুর-মহাশয় তাহাকে সেই খোঁটায় বাঁধিলেন। তাহার পর তাহার মুখদেশ নিজের পা দিয়া মাড়াইয়া জীয়ন্ত অবস্থাতেই মুণ্ডদিক্ হইতে ছাল ছাড়াইতে আরম্ভ করিলেন। পাঁঠার মুখ গুরুদেব মাড়াইয়া আছেন, সুতরাং সে চীৎকার করিয়া ডাকিতে পারিল না। কিন্তু তথাপি তাহার কণ্ঠ হইতে মাঝে মাঝে এরূপ বেদনাসূচক কাতরধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল যে, তাহাতে আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার পর তাহার চক্ষু দুইটি! আহা! আহা! সে চক্ষু দুইটির দুঃখ আক্ষেপ ও ভর্ৎসনাসূচক ভাব দেখিয়া আমি যেন জ্ঞান-গোচরশূন্য হইয়া পড়িলাম। সে-চক্ষু দুইটির ভাব এখনও মনে হইলে আমার শরীরে রোমাঞ্চ হয়। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমি বলিয়া উঠিলাম, —“ঠাকুর-মহাশয়! ঠাকুর-মহাশয়! করেন কি? উহার গলাটা প্রথমে কাটিয়া ফেলুন। প্রথম উহাকে বধ করিয়া তাহার পর উহার চর্ম উত্তোলন করুন।”

ঠাকুর-মহাশয় উত্তর করিলেন,—“চুপ! চুপ! বাহিরের লোক শুনিতে পাইবে। জীয়ন্ত অবস্থায় ছাল ছাড়াইলে ঘোর যাতনায় ইহার শরীর ভিতরে ভিতরে অল্প অল্প কাঁপিতে থাকে। ঘন ঘন কম্পনে ইহার

চর্মে এক প্রকার সরু সরু সুন্দর রেখা অঙ্কিত হইয়া যায়। এরূপ চর্ম দুই আনা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। প্রথমে বধ করিয়া তাহার পর ছাল ছাড়াইলে সে-চামড়া দুই আনা কম মূল্যে বিক্রীত হয়। জীয়ন্ত অবস্থায় পাঁঠার ছাল ছাড়াইলে আমার দুই আনা পয়সা লাভ হয়। ব্যবসা করিতে আসিয়াছি, বাবা! দয়ামায়া করিতে গেলে আর ব্যবসা চলে না।"

ঠাকুর-মহাশয় এইরূপ বলিতে লাগিলেন, আর ওদিকে তাঁহার হাত চলিতে লাগিল। সিদ্ধহস্ত! শীঘ্রই অনেক চর্ম তিনি তুলিয়া ফেলিলেন। আর একবার আমি পাঁঠার চক্ষু দুইটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম। সেই চক্ষু দুইটি যেন আমাকেও ভৎ‍‌র্সনা করিয়া বলিল,—"আমি দুর্বল, আমি নিঃসহায়, এ ঘোর যাতনা তোমরা আমাকে দিলে, মাথার উপর ভগবান্ কি নাই!"

আমি সেই নিষ্ঠুর দৃশ্য আর দেখিতে পারিলাম না। তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

বাসায় ফিরিয়া ভ্রাতাকে পুনরায় আমি অনেক বুঝাইলাম ও তাহাকে দেশে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে কিছুতেই আমার সহিত দেশে গমন করিল না। নিরাশ হইয়া পর দিন আমি একেলাই কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া যাত্রা করিলাম। দেশে ফিরিয়া কিছুদিন পরে শুনিলাম যে, যেদিন ঠাকুর-মহাশয়ের সহিত আমার কথাবার্তা হইয়াছিল, ঠিক তাহার পরদিন পুনরায় যখন তিনি ঐরূপ চর্মোত্তোলন-কার্যে প্রবৃত্ত ছিলেন, সেই সময় পুলিসের লোকে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। ইতিপূর্বে এই কাজের জন্য তাঁহার আরও তিনবার জরিমানা হইয়াছিল। সেজন্য এবার তাঁহার কিছু অধিক অর্থদণ্ড হইল।

ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া কিছুদিন পরে গুরুদেব দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। দেশে আসিয়া তিনি সকলের নিকট বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, জীবন্ত ছাগলের চর্ম উত্তোলন বিষয়ে আমিই কলিকাতার পুলিসের নিকট সংবাদ দিয়াছিলাম, আমা হইতেই তাঁহার সর্বনাশ হইয়াছে। লোকের নিকট এইরূপ বলিয়া তিনি আমাকে

অভিশাপ প্রদান করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে, এ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ ছিলাম। কিন্তু কেহই আমার কথা বিশ্বাস করিল না। সকলেই আমাকে ছি ছি করিতে লাগিল। সকলেই বলিল যে, যে-লোক গুরুর সর্বনাশ করিতে পারে, তাহার মত পাষণ্ড আর জগতে নাই।

এই পর্যন্ত বলিয়া ঘনশ্যাম সে-রাত্রি গল্প বন্ধ করিলেন। পরদিন পুনরায় তিনি সেই গল্প আরম্ভ করিলেন।

তৃতীয় রজনী

পায়ে বেড়ি।

গড়গড়ি মহাশয় বলিতেছেন—

টাকার জন্য ভ্রাতা আমাকে বার বার পত্র লিখিতে লাগিল। আমি দেখিলাম যে, ভ্রাতাকে কলিকাতায় থাকিতে দিলে তাহার ইহকাল পরকাল নষ্ট হইবে। তাই আমি তাহার খরচের টাকা বন্ধ করিয়া দিলাম। ভ্রাতা প্রথম প্রথম আমাকে মান-সম্ভ্রমের সহিত পত্র লিখিত; তাঁহার পর ক্রমে ক্রমে তাহার পত্র তীব্র ভাব ধারণ করিল। 'এক্ষণে সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, পৈতৃক টাকা লইয়া সে যাহা ইচ্ছা তাহা করিবে, পৈতৃক টাকার হিসাব না দিলে সে আমার নামে নালিশ করিবে'— অবশেষে এইভাবে সে আমাকে পত্র লিখিতে লাগিল। এরূপ পত্রের আমি কোনো উত্তর দিলাম না, তাহার নিকট টাকাও পাঠাইলাম না। মনে করিলাম যে, অর্থাভাবে নিশ্চয় তাহাকে দেশে আসিতে হইবে। তখন তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকে আমি সংসারী করিব। এইরূপ ভাবিয়া আমি একটি সুপাত্রী স্থির করিয়া রাখিলাম।

কিছুদিন পরে কনিষ্ঠ দেশে আসিল। বিবাহ করিবার জন্য আমি তাহাকে বার বার অনুরোধ করিলাম। কিন্তু আমার কথা সে কিছুতেই শুনিল না। টাকাকড়ি সম্বন্ধে ক্রমাগত সে আমার সহিত কলহ করিতে লাগিল। সে বালক থাকিতে পৈতৃক সম্পত্তির কিরূপ আয় ছিল, সে

টাকা কিরূপে ব্যয় হইয়াছিল, সেই হিসাবের জন্য সে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। এই সময় পৈতৃক সম্পত্তির আয় হইতে তাহার অংশের কিছু নগদ টাকা আমার নিকট জমা ছিল। আমি দেখিলাম যে, সে-টাকা তাহার হাতে পড়িলে আর রক্ষা থাকিবে না। বিশেষত দেশে আসিয়াই যত দুষ্ট লোকের সহিত তাহার সৌহৃদ্য হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, আমাদের গুরুদেবের প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। একদিন ভ্রাতাকে আমি বলিলাম,—"ঙক্কুর! দেখ, ভাই! আমার পুত্র-কন্যা কিছুই নাই। পৃথিবীতে তোমা ভিন্ন স্নেহের বস্তু আমার আর কেহ নাই। পৈতৃক যাহা কিছু আছে, সে সমুদয় তোমার। তাহার পর, আমার শ্বশুরের যে সম্পত্তি আমার স্ত্রী পাইয়াছে, তাহাও পরে তোমার হইবে। পৈতৃক সম্পত্তির হিসাব এই মুহূর্তে আমি তোমাকে কড়ায়-গণ্ডায় দিতে পারি। কিন্তু ভাই! পাছে তুমি টাকা অপব্যয় কর ও পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট কর, সেজন্য এক্ষণে হিসাব দিতে আমি আপত্তি করিতেছি। তুমি বিবাহ কর। তোমার দুই একটি পুত্র-কন্যা হউক। তখন সমুদয় হিসাব তোমাকে আমি বুঝাইয়া দিব।"

বলা বাহুল্য যে, আমার সেরূপ কথায় ঙক্কুর সন্তুষ্ট হইল না। আমার নামে সে নালিশ করিবে, এইরূপ ভয় দেখাইয়া তখন সে বাড়ি হইতে চলিয়া গেল। দুই চারি দিন সে আর বাড়ি আসিল না। একদিন দুই প্রহরের সময় তাহার কতকগুলি বন্ধুর সহিত সে বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার বন্ধুগণকে সঙ্গে লইয়া সে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল ও আমার প্রতি নানারূপ কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া সে বলিল,—"অন্য সম্পত্তি বিভাগের জন্য পরে আমি আদালতে নালিশ করিব। কিন্তু আমার অংশের যে নগদ টাকা তোমার কাছে আছে, তাহা এই মুহূর্তে তোমাকে দিতে হইবে। তাহা না দিলে তোমাকে আমি অপমান করিব।"

সেই মুহূর্তে আমি তাহার টাকা ফেলিয়া দিলাম। পিতার মৃত্যুর দিন হইতে হিসাবপত্রও তাহাকে আমি দেখাইতে চাহিলাম। কিন্তু হিসাবের প্রতি সে কটাক্ষও করিল না। অনেকগুলি নগদ টাকা হাতে

পাইয়া বন্ধুদিগের সহিত তৎক্ষণাৎ সে প্রস্থান করিল। সেইদিন আমি আমার গৃহিণীকে বাঁকুড়া জিলায় তাঁহার পিত্রালয়ে আমার শাশুড়ী ঠাকুরানীর নিকট পাঠাইয়া দিলাম।

ইহার পর তিন চারি মাস কনিষ্ঠের আর দেখা নাই। লোক-পরম্পরায় শুনিলাম যে, টাকা পাইয়া দুই চারিজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া সে কলিকাতায় গমন করিয়াছে।

একদিন আমি কাছাকাছি একটি গ্রামে প্রজার কাছে খাজনা আদায় করিতে গিয়াছিলাম। বাড়ী ফিরিয়া আসিতে আমার সন্ধ্যা হইয়াছিল। বৃহৎ একটি মাঠ দিয়া আমি আসিতেছি, এমন সময় মানুষের অতি মৃদু কাতর স্বর আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সেই কাতর স্বর অনুসরণ করিয়া নিকটে গিয়া আমি দেখিলাম যে, মাঠের মাঝখানে এক গাছতলায় একটি লোক পড়িয়া আছে। আমি কাছে গিয়া উপস্থিত হইলে সে আমার কাছে একটু জল প্রার্থনা করিল। কিছুদূরে একটি পুষ্করিণী ছিল। পুষ্করিণীতে আমার চাদর ভিজাইয়া সেই জল আনিয়া আমি তাহাকে পান করাইলাম। লোকটির কথায় বুঝিতে পারিলাম যে, সে পশ্চিমদেশীয় লোক। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে সে আমাকে বলিল যে,—তাহার নিবাস জৌনপুর জিলা। পত্নীর সহিত পদব্রজে সে জগন্নাথ দর্শনে গিয়াছিল। সে স্থান হইতে সে দেশে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পথে বিসূচিকা রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাহার পত্নীর পরলোক হয়। পুরীধামেই তাহাদের টাকা ফুরাইয়া গিয়াছিল। ভিক্ষা করিয়া অতি কষ্টে তাহারা পথ পর্যটন করিতেছিল। যে-পথে সচরাচর যাত্রী গমনাগমন করে, সে পথে লোকে বড় ভিক্ষা প্রদান করে না। সেজন্য সে এই গ্রাম্য-পথ অবলম্বন করিয়াছিল। সেই দিন প্রাতঃকালে এই মাঠ দিয়া যাইতে যাইতে সে-ও সহসা বিসূচিকা রোগগ্রস্ত হইয়াছে। চলিবার শক্তি তাহার নাই। পিপাসায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে।

বিদেশী লোকটির জন্য আমার মনে অতিশয় দুঃখ হইল। আমি দেখিলাম যে, রোগে তাহার মৃত্যু না হউক, মাঠের মাঝখানে জীয়ন্ত

অবস্থাতেই সেই রাত্রিতে তাহাকে শৃগাল-কুকুরে ছিঁড়িয়া খাইবে। তাহার পর সেই অনাথা নিঃসহায় ব্যক্তি পিপাসায় একটু জলের জন্য কতই না যন্ত্রণা ভোগ করিবে! সে অবস্থায় আমি তাহাকে ফেলিয়া যাইতে পারিলাম না। তাহাকে আমি বুকে তুলিয়া লইলাম। অতি কষ্টে আস্তে আস্তে আমার বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলাম। অনেক রাত্রিতে আমি বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বাহিরের একটি চালায় লোকটিকে রাখিয়া তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। আমাদের গ্রাম হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে এক হাতুড়ে ডাক্তার ছিলেন। তাঁহাকে আনিতে পাঠাইলাম! কিন্তু তিনি আমার ভ্রাতার ইয়ার। তিনি আসিলেন না। অন্য যাহা কিছু ঔষধ পাইলাম, লোকটিকে তাহাই সেবন করাইলাম। কিন্তু কোনো ফল হইল না! দুই দিন পরে সেই অনাথা হিন্দুস্থানী আমার বাড়িতে মৃত্যু-মুখে পতিত হইল।

তাহার সংকারের জন্য আমি প্রতিবাসীদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু কেহই আসিলেন না। বরং গ্রামের সকল লোকেই আমার উপর খড়্গ-হস্ত হইলেন। সকলে বলিলেন,—"সুবল উন্মাদ পাগল হইয়াছে। তাহা না হইলে বিসূচিকা রোগগ্রস্ত, অজ্ঞাত-কুলশীল একটা বিদেশীকে বাড়ি আনিবে কেন? সে নিজে পাগল হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু গ্রামের ভিতর বিসূচিকা আনিয়া সে আমাদিগকে বিপদগ্রস্ত করে কেন?"

গ্রামের লোক যে নিতান্ত অন্যায় কথা বলিল, তাহা নহে। বরং আমি নিজেই যে অন্যায় কাজ করিয়াছি, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু কী করিব! সেই অনাথ লোকটিকে সে অবস্থায় মাঠের মাঝখানে ফেলিয়া আসিতে আমি পারি নাই।

আমার একজন প্রজার একখানি গোরুর গাড়ী ছিল। সেই গরুর গাড়িতে মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গিয়া আমি একলাই তাহাকে দাহ করিলাম।

পরদিন আমি একজন প্রতিবাসীর গৃহে গমন করিয়াছিলাম।

তিনি তামাক খাইয়া আমাকে বলিলেন,—"সুবলভায়া! তামাক ছাড়িয়া দিয়াছ, না?"

ইহার অর্থ আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম,—"তামাক ছাড়িয়া দিব কেন?"

যাহা হউক, তিনি আমাকে হুঁকা দিলেন না, নিজেই ধূমপান করিয়া হুঁকাটি রাখিয়া দিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন,—"যে-লোকটিকে তুমি বাড়ি আনিয়াছিলে, যাহার শব তুমি দাহ করিয়াছ, সে কি জাতি তাহার কিছুই ঠিক নাই। এ কথা লইয়া গ্রামে ঘোরতর গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। অন্য লোক দূরে থাকুক, তোমাদের ঠাকুর-মহাশয়ও তোমার বাড়িতে আর জলগ্রহণ করিবেন না।"

ফলকথা, সেইদিন হইতে গ্রামে আমি একঘরে হইলাম। ক্রমে শুনিলাম যে, আমাদের ঠাকুরমহাশয়ের উদ্যোগেই সকলে আমাকে একঘরে করিয়াছেন। যাহা হউক আমি চুপ করিয়া রহিলাম। গ্রাম-বাসীদের বাড়িতে গমনাগমন বন্ধ করিয়া দিলাম। আমার বাড়িতেও কেহ আসিতেন না। সেইদিন হইতে আমি তামাক ছাড়িয়া দিলাম।

কিছুদিন পরে শুনিলাম যে, আমার ভ্রাতা দেশে আসিয়াছে। গ্রামে এক বন্ধুর বাড়িতে সে উঠিয়াছে। আরও শুনিলাম যে, পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগের জন্য সে আদালতে নালিশ করিবে। আমার নিকট হইতে যে টাকা পাইয়াছিল, তাহা খরচ হইয়া গিয়াছে। মকদ্দমা-খরচের জন্য সে তাহার অংশ বন্ধক দিবে। এইরূপ কথা শুনিয়া আমি ভ্রাতাকে বলিয়া পাঠাইলাম যে,—সম্পত্তি বিভাগের জন্য মকদ্দমা করিবার প্রয়োজন কি? গ্রামের দুই-এক জন ভদ্রলোককে সে মধ্যস্থ মনোনীত করুক। তাঁহারা যেরূপ বিভাগ করিয়া দিবেন, আমি তাহাতেই সম্মত হইব। অথবা সে না হয়, নিজেই বিভাগ করুক। তাহার যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ অংশ সে আমাকে প্রদান করুক। তাহাতে আমি কিছুমাত্র আপত্তি করিব না।

ভ্রাতার নিকট হইতে আমার এ প্রস্তাবের কোনোরূপ উত্তর পাইলাম না।

পাঁচ দিন পরে, একদিন সন্ধ্যার সময় বাড়ির ভিতর আমার ঘরে বসিয়া আমি পুস্তক পাঠ করিতেছিলাম। সহসা সাত আটজন লোকের সহিত আমার ভ্রাতা সেই ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে প্রবেশ করিয়াই তাহারা আমার হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিল। আমি চীৎকার করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কাপড় দিয়া তাহারা আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর, আমাকে শয়ন করাইয়া তাহারা আমার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিল ও সেই মুণ্ডিত মস্তকে ও ঘাড়ে কাগজের মত কী যেন বসাইয়া দিল। অবশেষে আমার পা দুইটি তাহারা শিকলে বাঁধিল। কিছু পরে আমার মাথা ও ঘাড় খুবই জ্বলিতে লাগিল। সে জায়গায় হাত দিতে পারিলে আমার যাতনার অনেক শান্তি হইত। কিন্তু তাহারা আমার হাত বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। শরীরের কোনখানে চুলকাইতে অথবা কোনখানে বেদনা হইলে সেখানে হাত দিতে না পারিলে যে কি বিষম কষ্ট হয় তাহা যে ভুগিয়াছে, সেই জানে। কিছুক্ষণ পরে আমার বোধ হইল যে তাহারা আমার মাথা ও ঘাড়ে বেলেস্তারা দিয়াছে, কারণ, সেই দুই জায়গায় বড় বড় দুইটি ফোস্কা হইয়াছে বলিয়া আমার অনুভব হইল। রাত্রি দুই প্রহরের পর তাহারা আমার মুখ খুলিয়া দিল। তখন আমি আমার ভ্রাতাকে ডাকিলাম। ভ্রাতা ঘরের বাহিরে ছিল, কিন্তু আমার নিকট আসিল না। আমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারের কারণ কী, তখন আমি আর সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

নিকটস্থ গ্রামের সেই যে হাতুড়ে ডাক্তারের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছিলাম, তিনি এই গুণ্ডাদের মধ্যে ছিলেন, আর তিনিই আমার মস্তক মুণ্ডন করিয়া ঘাড়ে ও মাথায় বেলেস্তারা দিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—"মহাশয়ের মস্তিষ্ক কিছু বিকৃত হইয়াছে। চিকিৎসার জন্য আপনার ভ্রাতা আমাকে আনিয়াছেন। ভয় নাই, আপনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন। তবে আপনার এই উন্মত্ততা কিছু গুরুতর। আরোগ্য লাভ করিতে কিছু বিলম্ব হইবে। এইরূপ উন্মত্ততার গুণ এই যে, উন্মাদের মনে মানুষ খুন করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। সেজন্য মহাশয়কে বন্ধন করিয়া রাখিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি। আমাদের অপরাধ ক্ষমা

করিবেন। আপনার মঙ্গলের জন্য আপনাকে আপাততঃ কিছু কষ্ট দিতে বাধ্য হইতেছি।"

আমি উত্তর করিলাম,—"আমি উন্মত্ত! আমি পাগল! আমার উপর এ অত্যাচার কেন? মা'র পেটের ভাই হইয়া জ্যেষ্ঠ সহোদরের উপর কেহ যে এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারে, তাহা আমি স্বপ্নেও কখনো ভাবি নাই। আর এ গ্রামের লোকই বা কিরূপ নিষ্ঠুর যে, তাহাদের সম্মুখে এরূপ ঘোরতর অত্যাচার হইতেছে, অথচ কেহ কিছু বলিতেছে না!"

ডাক্তার উত্তর করিলেন,—"যে পাগল হয়, সে নিজে বুঝিতে পারে না। অন্য লোককে সে পাগল মনে করে। আপনিও সেইরূপ মনে করিতেছেন। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই জানে যে, আপনি পাগল। তা না হইলে গুরুর নামে কেহ পুলিসে নালিশ করে না, পাগল না হইলে ওলাউঠা রোগগ্রস্ত একটা সাঁওতালকে মাঠ হইতে ঘরে কেহ আনে না।"

আমি দেখিলাম যে, বাক্য দ্বারা সেই ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করা বৃথা। তথাপি আমি বলিলাম,—"আমার ভ্রাতাকে একবার ডাকিয়া দাও। আমাকে ছাড়িয়া দিতে বল। পৈতৃক সমুদয় সম্পত্তি কল্যই তাহাকে আমি লিখিয়া দিব। পৈতৃক সম্পত্তির এক কপর্দকেও আমার প্রয়োজন নাই। তাহার পর কল্যই আমি এ-স্থান পরিত্যাগ করিয়া আমার শ্বশুরালয়ে গমন করিব।"

এইরূপ অনেক বিনয় করিয়া আমি বলিলাম কিন্তু আমার ভ্রাতা আমার নিকটে আসিল না। কেহই আমাকে ছাড়িয়া দিল না। চীৎকার করিতে করিতে বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহারা পুনরায় আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিল, আর বলপূর্বক আমাকে ধরিয়া রহিল। সুতরাং আমাকে চুপ করিতে হইল। ডাক্তার আমাকে বলিলেন,—"বৃথা আপনি চেষ্টা করিতেছেন, বৃথা গোলমাল করিতেছেন। গ্রামের সকলেই জানে যে, আপনি পাগল হইয়াছেন। কেহই আপনার সাহায্য করিতে এখানে আসিবে না।

আপনি যদি স্থিরভাবে থাকিতে অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে আপনার মুখের কাপড় ও হাতের বন্ধন খুলিয়া দিতে পারি। কিন্তু এই উন্মত্ত অবস্থায় পাছে আপনি অন্য লোককে খুন করেন, সেজন্য পায়ে আপনার বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকিবে।”

নিরুপায় হইয়া আমি সেইরূপ অঙ্গীকার করিলাম। তাহারা আমার মুখের কাপড় ও হাতের বন্ধন খুলিয়া দিল। ইহাতেও আমি অনেকটা সুস্থ বোধ করিলাম। কিন্তু আমার মস্তক ও ঘাড় অতিশয় জ্বলিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে, ঘরে আমাকে চাবি দিয়া সকলে চলিয়া গেল। শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ঘরের ভিতর একলা বসিয়া আমি কত কী যে চিন্তা করিতে লাগিলাম, মনে কত যে দুঃখ হইল, তাহা আর আপনাদিগকে কী বলিব, আপনারাই তাহা ভাবিয়া দেখুন!

পরদিন প্রাতঃকালে প্রথমেই গুরুদেব আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আমার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তিনি অতিশয় শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমার মাথায় তাঁহার পদধূলি দিয়া তিনি বলিলেন,—“আমি জানি যে, সজ্ঞান অবস্থায় তুমি আমার সর্বনাশ কর নাই, পাগল অবস্থাতেই তাহা করিয়াছিলে। আশীর্বাদ করি, বাবা, তুমি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ কর।”

গ্রামের আরও কয়েক জন লোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আমি উন্মত্ত হইয়াছি, সেজন্য অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শীঘ্র আমি আরোগ্য লাভ করিতে পারিব, সে আশ্বাসও অনেকে আমায় প্রদান করিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহাদিগকে আমি সুহৃদ্ বলিয়া জানিতাম, তাঁহাদিগের নিকট আমি অনেক মিনতি করিয়া বলিলাম যে, আমি পাগল হই নাই, আমি সজ্ঞানেই আছি। কিন্তু কেহই আমার কথা বিশ্বাস করিলেন না। সকলেই বলিলেন যে, পাগল না হইলে কেহ গুরুর সর্বনাশ করে না, ওলাউঠা রোগগ্রস্ত সাঁওতালকে কেহ ঘরে আনে না। আমার অনেক কাকুতি-মিনতি-বাক্যে একজন কেবল আমার শ্বশুরালয়ে আমার গৃহিণীর

নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

দিনের বেলা আমার ভ্রাতার এক বন্ধু আমার জন্য আহার্য দ্রব্য লইয়া আসিলেন। কিন্তু সেদিন আমি জল পর্যন্ত গ্রহণ করিলাম না। পাড়ার অনেক ছেলেও সেদিন আমাকে দেখিতে আসিল। কেহ বলিল, —"সুবলদাদা," কেহ বলিল,—"সুবলকাকা, পাগল হইয়াছে, আয় ভাই দেখি।"

ঘরের তখন দ্বার বন্ধ ছিল। জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া তাহারা আমাকে দেখিতে লাগিল। আমি তখন মুখ বুজিয়া ছিলাম। তথাপি একটি ছেলে বলিয়া উঠিল—"ঈশ্! একবার দাঁত দেখ! ঠাকুরমা বলিয়াছেন যে, একবার ছাড়া পাইলে আর রক্ষা রাখিবে না, পাড়ার যত ছেলেকে ঐ লম্বা লম্বা দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া একেবারে খণ্ড খণ্ড করিয়া খাইয়া ফেলিবে।"

এই বলিয়া তাহারা জানালা দিয়া ছোট ছোট ঢিল ছুড়িয়া আমাকে মারিতে লাগিল। তাহার পর আমার উঠানের পেয়ারা গাছে উঠিয়া পেয়ারা খাইল। পেয়ারা গাছ হইতে আমার বাড়ির এক কোণে দুই ঝাড় আখ দেখিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া খাইতে খাইতে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর সেই ডাক্তার ও আর তিনজন লোক পুনরায় আসিলেন। কিন্তু আমার ভ্রাতা আমার নিকট আসিল না। একটি গেলাসে কিছু ঔষধ লইয়া ডাক্তার বাবু আমাকে তাহা খাইতে বলিলেন। আমি কিছুতেই খাইলাম না।

ডাক্তারবাবু বলিলেন,—"এ ডাক্তারি ঔষধ নহে, দেশী গাছ-গাছড়া। অনেক কষ্টে আমি ইহা জোগাড় করিয়াছি। এই ঔষধ সেবন করিলে সত্বর আপনি আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন।"

ঔষধ খাইতে আমি কিছুতেই সম্মত হইলাম না। আমাকে তিনি অনেক বুঝাইলেন, অনেক ভয় দেখাইলেন, কিন্তু ঔষধ খাইতে কিছুতেই আমি স্বীকৃত হইলাম না। তখন ডাক্তারবাবু, তাঁহার সঙ্গীদের সহায়তায় বলপূর্বক আমাকে শয়ন করাইয়া, আমার বুকে হাঁটু দিয়া সেই ঔষধ আমাকে সেবন করাইলেন। ইহার পর কী হইল, আর আমি ঠিক

বলিতে পারি না। ঔষধ সেবন করিবামাত্র আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

চতুর্থ রজনী

যিনি ভূমিকম্প করেন

কতদিন এরূপ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া ছিলাম, তাহা আমি বলিতে পারি না। ক্রমে আমার অল্প অল্প জ্ঞানের উদয় হইল। জ্ঞান হইবার পর একদিন রাত্রিকালে আমি আমার ভ্রাতার ব্যবহার ও নিজের অবস্থা ভাবিতেছিলাম। আমার স্ত্রী ও শাশুড়ী ঠাকুরানী আমার শোচনীয় অবস্থার সংবাদ পাইলেন কি-না ও ভ্রাতার হাত হইতে তাঁহারা আমাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন কি-না, এইরূপ নানা চিন্তায় মন আমার নিতান্ত কাতর হইতেছিল। এমন সময় ঘরের এক কোণ হইতে কে আমাকে ডাকিল,—"সুবল! সুবল!"

অনেক মিনতি করিয়া ডাক্তারের কাছে রাত্রিবেলায় আমি একটি আলোকের প্রার্থনা করিয়াছিলাম। ডাক্তার তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। আমার ঘরের এক পার্শ্বে মিট্‌মিট্ করিয়া একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। "সুবল! সুবল!"—বলিয়া কেউ যখন আমাকে ডাকিল, তখন আমি চমকিয়া উঠিলাম। সে-শব্দ শুনিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমাকে যে ডাকিতেছে, সে ঘরের ভিতরেই আছে। ঘরের এদিকে ওদিকে চারিদিকে আমি চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু ঘরের ভিতর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে আমি মনে করিলাম যে, ভ্রমবশত এইরূপ শব্দ শুনিয়াছি, প্রকৃত কেহ আমাকে ডাকে নাই। এইরূপ মনে করিয়া পুনরায় আমি আমার অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। এমন সময় পুনরায় সেই শব্দ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।

পুনরায় কে যেন আমাকে ডাকিল,—"সুবল! সুবল!"

পুনরায় আমি চমকিয়া উঠিলাম। চমকিত হইবার আরও কারণ এই যে, এবার আমি সে কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু আশ্চর্যের

বিষয় এই যে, যাঁহার এ কণ্ঠস্বর, বহুকাল পূর্বে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

পুনরায় সেই শব্দ হইল,—"সুবল। সুবল।"

আমি বলিলাম,—"কে আমাকে ডাকিতেছেন? আমি কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।"

সেই স্বর বলিল,—"আমাকে দেখিতে পাইতেছ না কেন, এই যে আমি বসিয়া আছি।"

আমি বলিলাম,—"কোথায়?"

স্বর উত্তর করিল,—"এই ঘরের কোণে।"

যেদিক হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই কোণের দিকে চাহিয়া আমি বলিলাম,—"ও কোণে তো কিছুই নাই, কেবল জলের কলসিটি রহিয়াছে।"

স্বর উত্তর করিল,—"আমি এই জলের কলস। এ জন্মে আমি জলের কলস হইয়াছি।"

আমি বলিলাম,—"আপনি জলের কলস হইয়াছেন! আপনি কে?"

স্বর উত্তর করিল,—"আমি সনাতন নস্কর। গত জন্মে আমি তোমার প্রতিবেশী ছিলাম। আমাকে মনে নাই?"

সত্য বটে, সনাতন নস্কর নামে আমাদের এক বৃদ্ধ প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি অতি সজ্জন ছিলেন। তাঁহাকে আমরা বিশেষরূপে মান্য করিতাম। অবাক্ হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনি নস্করমহাশয়? এ-জন্মে আপনি মেটে কলসি হইয়াছেন? মানুষ মরিয়া কলসি হয়?"

কলসি উত্তর করিলেন,—"মানুষ মরিয়া নানা রূপ হয়। সে-রূপের সংখ্যা চৌরাশি হাজার।"

আমি বলিলাম,—"জীবিত অবস্থায় আপনি একজন সাধুপুরুষ ছিলেন, তবে কেন আপনাকে সামান্য একটি মেটে কলস হইতে হইয়াছে?"

নস্করমহাশয়, অর্থাৎ কলসি, উত্তর করিলেন,—"আমি তো তবু অনেক

ভাল দ্রব্য হইয়াছি। জগবন্ধুকে জান? জগবন্ধুর মা মরিয়া সামান্য একখানি খুরি হইয়াছে।"

আমি বলিলাম,—"আমি শুনিয়াছি যে, জীবাত্মার ক্রমে ক্রমে উন্নতি হয়। কুম্ভকারের দ্রব্যে পরিণত হইলে জীবাত্মার উন্নতি কিরূপে হয়?"

নস্করমহাশয় উত্তর করিলেন,—"জগবন্ধুর মা এখন খুরি হইয়া আছেন। পরজন্মে তিনি হয় তো একখানি সরা হইবেন। আর তার পরজন্মে হয় তো তিনি মালসী হইবেন। তারপর হয় তো তিনি একখানি তিজেল হইবেন, তারপর তোলো হাঁড়ি—এইরূপ ক্রমে ক্রমে তিনি উন্নতি লাভ করিবেন। আমি এখন কলস আছি। পরজন্মে আমি হয় তো পূজার ঘট হইব। তাহার পর হয় তো পিতলের ঘড়া হইব। কিন্তু আমি আর অধিক বকিতে পারি না। আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। পিপাসায় বড় কাতর হইয়াছি। তোমার উপর যে সমুদয় অত্যাচার হইয়াছে, কয় দিন তাহা এই কোণে বসিয়া সমস্ত আমি দেখিয়াছি। তোমার পিতার পুত্র যে এমন কুলাঙ্গার হইবে, স্বপ্নেও তাহা কখনো আমি ভাবি নাই। কয়দিন এক ছটাক জলও কেহ আমাকে প্রদান করে নাই। শুষ্ক হইয়া আমি ঢন্ ঢন্ করিতেছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এক্ষণে কী করিতে আপনি আমাকে আজ্ঞা করেন?"

নস্করমহাশয় বলিলেন,—"প্রথমে আমাকে লইয়া বাহিরে চল। তাহার পর পুষ্করিণী হইতে আমাকে জলে পূর্ণ করিয়া আমার পিপাসা নিবারণ কর। তাহার পর, আমি এ পাপ পৃথিবীতে আর থাকিতে ইচ্ছা করি না। কলিকাতায় লইয়া আমাকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ কর।"

আমি বলিলাম,—"গুরু ও তাহার বন্ধুগণ পায়ে বেড়ি দিয়া আমাকে লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কী করিয়া আমি আপনাকে বাহিরে লইয়া যাইব?"

নস্করমহাশয় উত্তর করিলেন,—"তোমার পায়ের দিকে চাহিয়া দেখ।"

আমি আমার পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। আশ্চর্য! এতক্ষণ আমি কিছুই জানিতে পারি নাই; আমার পায়ে বেড়ি নাই, আমার পায়ে শৃঙ্খল নাই।

অদ্ভুত মানিয়া সেই কলসিকে লক্ষ্য করিয়া নস্করমহাশয়কে আমি নমস্কার করিলাম। কিন্তু পুনরায় আমার মনে আর একটি সন্দেহ উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম,—"সত্য বটে, আমার পদদ্বয় মুক্ত হইয়াছে, কিন্তু ঘরের দ্বারে বাহিরে তাহারা কুলুপ দিয়া গিয়াছে। ঘর হইতে কী করিয়া আমি বাহির হইব?"

নস্করমহাশয় বলিলেন,—"দ্বার খুলিয়া দেখ।"

শয্যা হইতে আস্তে আস্তে উঠিয়া আমি কপাট টানিয়া দেখিলাম। ঘরের দ্বার স্বচ্ছন্দে খুলিয়া গেল। আরও আশ্চর্য হইয়া নস্করমহাশয়কে আমি বারবার নমস্কার করিলাম।

কলসি পুনরায় আমাকে বলিলেন,—"সুবল! আর তোমার এখানে থাকা উচিত নহে। তোমার ভ্রাতা কুলাঙ্গার, না করিতে পারে এমন কাজ নাই। তোমার প্রতি সে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহার দণ্ড সে শীঘ্রই পাইবে। এক্ষণে আমি তৃষ্ণায় বড় কাতর হইয়াছি। পুষ্করিণীতে লইয়া শীঘ্র আমাকে জলে পূর্ণ কর। তাহার পর কলিকাতায় লইয়া গিয়া শীঘ্র আমাকে মা গঙ্গার নির্মল পবিত্র সলিলে নিক্ষেপ কর। পৃথিবীতে আর আমি থাকিতে ইচ্ছা করি না। আহা! জগবন্ধুর মা, যিনি খুরি হইয়া কালযাপন করিতেছেন, তাঁহাকেও সঙ্গে লইতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু তাহার কপালে নাই। কপালে থাকিলে এই উদ্যোগে পরজন্মে তিনি সরারূপ লাভ করিতে পারিতেন। তাঁহার পর অনায়াসে তিনি মালসী হইতে পারিতেন।"

পুনরায় বিছানার নিকট আসিয়া, ঘরের যে জায়গায় আমার বাক্সটি থাকিত, সেইদিকে আমি চাহিয়া দেখিলাম। সেখানে আমার বাক্স নাই। বুঝিতে আর বাকি রহিল না। বাক্সটি ভ্রাতা লইয়া গিয়াছেন। পথ-খরচের জন্য আমি কী করিব, এখন সেই ভাবনা আমার মনে উদয় হইল। কিন্তু নস্কর মহাশয়ের কি আশ্চর্য মহিমা! এই সময় ঘরের

আর এক কোণে একপ্রকার খড়-খড় শব্দ হইতে লাগিল। সেইদিকে তাকাইয়া আমি দেখিতে পাইলাম যে কী একটি গোলাকার দ্রব্য ইঁদুরে টানিয়া গর্তের ভিতর লইতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু গর্তটির মুখ সংকীর্ণ, সে জন্য গোলাকার দ্রব্যটি গর্তের ভিতর সহজে প্রবেশ করিতেছে না। তাড়াতাড়ি নিকটে গিয়া আমি দেখিলাম যে, সে দ্রব্যটি আমাদের ঘরের লক্ষ্মী-ঝাঁপি—বেত নির্মিত পোয়া, শালগ্রামের সহিত যাঁহাকে পূজা না করিয়া কখনো আমি জলগ্রহণ করিতাম না। আজ তাহার এই দুর্দশা দেখিয়া হৃদয় আমার বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। আমি মনে মনে ভাবিলাম,—"মা। তবে সত্য সত্যই তুমি এ পাপসংসার পরিত্যাগ করিয়াছ!"

মনে মনে আমি এইরূপ খেদ করিতেছি, এমন সময় ঘরের অন্য কোণ হইতে নস্করমহাশয় বলিয়া উঠিলেন,—"সুবল। লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে যে মোহরটি আছে, তাহা বাহির করিয়া লও। এ বিপদের সময় তাহা লইতে দোষ নাই। ইহাতে তোমার পথ-খরচ হইবে।"

এইরূপে আদিষ্ট হইয়া পোয়ার ভিতর হইতে আমি মোহরটি বাহির করিয়া লইলাম। তাহার পর অন্য কোণ হইতে মৃন্ময় কলসরূপধারী নস্করমহাশয়কে অতি ভক্তিভাবে তুলিয়া লইলাম। ধীরে ধীরে বাড়ি হইতে বাহির হইলাম। প্রথমেই বৃহৎ একটি সরোবরে গিয়া সুশীতল জলে কলসটি পূর্ণ করিলাম। নস্করমহাশয়কে এইরূপে পরিতৃপ্ত করিয়া পূর্ণকলসটি কাঁধে তুলিয়া আমি কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

যথা সময়ে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া অতি ভক্তিভাবে কলসটি আমি গঙ্গাজলে সমর্পণ করিলাম। তাহার পর যথাশক্তি নস্করমহাশয়ের শ্রাদ্ধ করিলাম।

শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া, আমি কোথায় যাই, কী করি, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। অবশেষে বাঁকুড়ায় শ্বশুরালয়ে গমন করাই স্থির করিলাম।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি ক্রমে গড়েরমাঠে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে নির্জন একটি গাছের নিচে বসিয়া নিজের অবস্থার

কথা ভাবিতে লাগিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া গেল। পথে এক-একটি গ্যাসের লণ্ঠন জ্বলিয়া উঠিল। আকাশে এক একটি করিয়া নক্ষত্র উদিত হইল। সাহেব ও মেমদের গাড়ির আলো আকাশভ্রষ্ট নক্ষত্রের মতো দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল।

এই সময় সহসা এক বৃদ্ধ আমার নয়নগোচর হইলেন। আমার নিকট হইতে প্রায় দশ হাত দূরে তিনি বসিয়া ছিলেন। অত দূরে তিনি বসিয়া ছিলেন, তথাপি তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আমি শুনিতে পাইতেছিলাম। দ্রুতবেগে অতি কষ্টে শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য সাধিত হইলে যেরূপ শব্দ হয়, তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে সেইরূপ শব্দ নির্গত হইতেছিল। বৃদ্ধের যাতনা দেখিয়া আমার মনে দুঃখ হইল।

আমি তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মহাশয়ের কি হাঁপানি রোগ আছে? নিশ্বাস ফেলিতে কি আপনার বড় কষ্ট হইতেছে?"

কিছু রুক্ষভাবে তিনি উত্তর করিলেন,—"হাঁপানি রোগ থাকিবে কেন? আমি অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছি, সেইজন্য এত দ্রুতবেগে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"দ্রুতবেগে দৌড়িয়া আসিয়াছেন? এ বয়সে ছুটাছুটি করা উচিত নয়।"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন,—"তোমাদের মতো দৌড়িয়া আমাকে পথ চলিতে হয় না। আকাশপথে আমি ভ্রমণ করি। এই মাত্র জাপান হইতে আসিতেছি।"

তাঁহার কথায় আমার প্রত্যয় হইল না। মানুষ হইয়া শূন্যপথে কেহ কি ভ্রমণ করিতে পারে! না, জাপান হইতে একমুহূর্তে কেহ ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে! আমি মনে করিলাম লোকটা পাগল।

তথাপি আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"জাপানে, মহাশয় কী জন্য গিয়াছিলেন?"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন,—"সেখানে আমি ভূমিকম্প করিতে গিয়াছিলাম। পৃথিবীতে যত ভূমিকম্প হয়, সে সমুদয় ভূমিকম্প আমিই

করিয়া থাকি। ভূমিকম্প করিয়া আমি জীবিকা নির্বাহ করি।"

আমি ঘোরতর বিস্মিত হইলাম। মানুষে যে আবার ভূমিকম্প করে, ভূমিকম্প করা যে আবার মানুষের একটা ব্যবসায়, এ কথা আমি পূর্বে কখনো শুনি নাই। এখন আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল যে লোকটা বদ্ধ পাগল।

তথাপি পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"পিতা-মাতার নিকট আমি শুনিয়াছি যে, সহস্রফণা বাসুকী পৃথিবী বহন করিয়া আছেন। একটি মস্তক শ্রান্ত হইলে, যখন তাহা পরিবর্তিত করিয়া অন্য মস্তকে তিনি পৃথিবী গ্রহণ করেন, তখনই পৃথিবী কম্পিত হয়, আর তাহাকেই লোকে ভূমিকম্প বলে। এ-কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আপনার কথা কিরূপে আমি বিশ্বাস করিতে পারি?"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন,—"সে-সব গাল-গল্প! বাসুকীকে আর ভূমিকম্প করিতে হয় না। বাসুকীর মস্তক-পরিবর্তনে যদি ভূমিকম্প হইত, তাহা হইলে এককালে সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হইত। এইমাত্র আমি জাপানে বৃহৎ একটি ভূমিকম্প করিয়া আসিতেছি। কিন্তু দেখ সে ভূমিকম্প কলিকাতায় হয় নাই।"

আমি উত্তর করিলাম,—"সত্য বটে, বাসুকী দ্বারা ভূমিকম্প হইলে এককালে সমস্ত পৃথিবীতেই হইত। কিন্তু তথাপি, মহাশয় যে-ভূমিকম্প করেন, তাহাও আমার বিশ্বাস হয় না।"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন,—"প্রত্যক্ষ যদি দেখিতে পাও, তাহা হইলে তো বিশ্বাস করিবে? যদি তোমার প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে এই মুহূর্তে সামান্য একটু ভূমিকম্প করিয়া তোমাকে আমি দেখাইতে পারি। কিন্তু দেখ, ইহাই আমার উপজীবিকা। সে-ভূমিকম্পের মূল্য তোমাকে দিতে হইবে।"

আমি বলিলাম,—"আচ্ছা, এক টাকার ভূমিকম্প আমি ক্রয় করিতে পারি।"

এই কথা বলিয়া,—পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া আমি তাহার হাতে দিলাম।

টাকাটি পাইয়া বৃদ্ধ ভূমির উপর ফুৎকার করিলেন। তৎক্ষণাৎ বহুদূর পর্যন্ত নিকটের ভূমি কাঁপিয়া উঠিল, আর নিকটস্থ বৃক্ষসমূহ হেলিতে দুলিতে লাগিল। তাহার উপর যে সমুদয় কাক বসিয়া ছিল, বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া তাহারা উড়িতে লাগিল। সভয়ে কা কা রবে তাহারা চারিদিক পূর্ণ করিল। আমিও ঘোরতর শংকিত হইলাম। কিন্তু চিন্তা করিবার কি ভয় করিবার আমি আর সময় পাইলাম না। নিম্নদিক্ হইতে মুখ তুলিয়া বৃদ্ধ আমার শরীরে একটি ফুঁ দিল। তৎক্ষণাৎ আকাশ-পথে নক্ষত্রবেগে আমার শরীর ধাবিত হইল। প্রাণের আশা আমি একেবারে পরিত্যাগ করিলাম। ভয়ে আমি জ্ঞান-গোচর-শূন্য হইয়া পড়িলাম। সামান্য একটু যা জ্ঞান ছিল, তাহার সহায়তায় আমি ভাবিলাম যে, পৃথিবীর উপর পড়িলেই আমার দেহ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে, আর তৎক্ষণাৎ আমার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইবে।

হু হু শব্দে আমি নিম্নে পতিত হইতে লাগিলাম। ভূমিতে পড়িতে আর অধিক বিলম্ব নাই। ঝড়ের ন্যায় শোঁ শোঁ শব্দে বায়ু আমার কানের কাছ দিয়া উপরদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। চৌরঙ্গীর উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা ক্রমেই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, গাছপালা ক্রমেই স্পষ্টরূপে আমার নয়নগোচর হইতে লাগিল। আর বিলম্ব নাই। এইবার সবলে ভূমির উপর পতিত হইতে হইবে, ইহলীলা এইবার শেষ হইবে। এমন সময় সহসা আমার হাতে কী ঠেকিয়া গেল। প্রাণপণ যত্নে তাহা আমি ধরিয়া ফেলিলাম। চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম যে, তাহা এক গির্জার চূড়া। কলিকাতার দক্ষিণে যে কাথিড্রাল নামক গির্জা নৈবেদ্যের উর্ধ্বদেশের ন্যায় যাহার শিখরদেশ সূক্ষ্ম হইয়া আকাশ অভিমুখে উত্থিত হইয়াছে, উহা সেই গির্জার চূড়া।

পঞ্চম রজনী

সাগর বক্ষে

প্রাণপণ যত্নে সেই গির্জার চূড়া আমি ধরিয়া রহিলাম। আপাতত অল্পক্ষণের জন্য আমার প্রাণ বাঁচিয়া গেল বটে, কিন্তু আমি সুস্থির থাকিতে পারিলাম না। সেই সময় বায়ু সবলে প্রবাহিত হইতেছিল। বায়ুবলে গির্জার চূড়াকে প্রদক্ষিণ করিয়া আমার দেহ দ্রুতবেগে ঘুরিতে লাগিল। বায়ুর গতি নির্দেশ করিবার জন্য কেহ কেহ ছাদের উপর উচ্চ স্থানে যে-যন্ত্র স্থাপিত করেন, সেই যন্ত্রের ন্যায় গির্জার চূড়াকে বেষ্টন করিয়া আমি ক্রমাগত ঘুরিতে লাগিলাম।

সে রাত্রি এই ভাবে কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে গির্জার নিচে দুই একটি লোককে আমি দেখিতে পাইলাম। উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া আমি তাহাদিগকে ডাকিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার চীৎকার কেহই শুনিতে পাইল না, কেহই আমাকে দেখিতে পাইল না। সমস্ত দিন আমি বায়ুবলে সেইরূপ চক্রবৎ ঘুরিতে লাগিলাম। সমস্ত দিন আমি মাঝে মাঝে চীৎকার করিলাম। কিন্তু প্রাণ বাঁচাইবার জন্য আমার সমুদয় চেষ্টা বিফল হইল। গির্জার সেই চূড়া অনুসরণ করিয়া কতবার নিজে নামিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহাতেও আমি কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। এইরূপে চারিদিন ও পাঁচ রাত্রি কাটিয়া গেল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আমার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। কখন আমাকে সেই আশ্রয়স্থান ছাড়িয়া দিতে হয়, জ্ঞানশূন্য হইয়া কখন আমি ভূতলে পতিত হই, তখন কেবল সেই চিন্তা মনে উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু বলিতে আমার লজ্জা হয়, জীবনধারণের জন্য সেই সময় আমি একটি উপায় আবিষ্কার করিলাম। সে উপায়টি অতি ঘৃণিত! কিন্তু কী করিব! এরূপ অবস্থায় পড়িলে মানুষের ভাল-মন্দ বিচার থাকে না।

মহাদেববাবুকে লক্ষ্য করিয়া ঘনশ্যাম বলিলেন, "আড্ডাধারী-মহাশয়!

আমরা দেখিলাম যে, গড়গড়ি মহাশয় সেই জীবনধারণের উপায় গোপন করিতেছেন। সেজন্য তাঁহাকে আমরা নানারূপ প্রবোধ বচনে উৎসাহিত করিলাম। আমাদের প্রবোধ বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া গড়গড়ি মহাশয় পুনরায় তাঁহার গল্প আরম্ভ করিলেন।"

এই কলিকাতা শহরে অসংখ্য কাক আছে। সকল স্থানেই তাহা উপবিষ্ট হয়। গির্জার মাথায় কয়দিন আমাকে ঘূর্ণিত হইতে দেখিয়া কাকেরা মনে করিল যে, এ-বস্তুটা মানুষ নহে, বায়ুর গতিনির্দেশ করিবার কোনরূপ একটা যন্ত্র। সাহেবরা এই যন্ত্র এরূপ উচ্চ স্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন। এইরূপ মনে করিয়া কাকেরা নির্ভয়ে আমার মস্তকে বসিতে আরম্ভ করিল। সেই কাক ধরিয়া আমি ভক্ষণ করিতে লাগিলাম, তাহার মাংসভক্ষণে ক্ষুধা ও শোণিতপানে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে লাগিলাম। ঐরূপ স্থানে রন্ধন করিবার কোনো সুযোগ ছিল না। সুতরাং কাক-গুলিকে কাঁচা অবস্থাতেই ভক্ষণ করিতে হইল। গির্জার মাথায় এইরূপে আমি দিনাতিপাত করিতে লাগিলাম!

কিন্তু এরূপ ঘূর্ণায়মান অবস্থায় গির্জার শিখরদেশে মানুষ চিরজীবন অতিবাহিত করিতে পারে না। কিরূপে সেই ঘোর বিপদ হইতে মুক্ত হইব সর্বদাই সেই চিন্তা করিতে লাগিলাম। চিন্তা করিতে করিতে বেলুনের কথা আমার স্মরণ হইল। বেলুনের সহায়তায় মানুষ আকাশে উড্ডীয়মান হয়। তাহার পর পারাশুট, অর্থাৎ বৃহৎ একটি ছাতার সহায়তায় মানুষ অনেক উচ্চ স্থান হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করে। আমি মনে করিলাম যে, সেই উপায়ে আমিও নিজেকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিব।

যেদিন হইতে আমি গির্জার মাথায় ঘুরিতেছিলাম, সেই দিন হইতে অনেক কাটা ঘুঁড়ি আমার নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম। প্রতিদিন অনেকগুলি কাটা ঘুঁড়ির সুতাও আমার গায়ে ও গির্জার মাথায় লাগিয়া যাইতেছিল। এখন হইতে আমি সেই ঘুঁড়িগুলি ধরিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় দুইশত ঘুঁড়ি সংগ্রহ করিলাম। তাহাদের সুতা একত্রিত করিয়া মোটা দড়ির মতো করিলাম। তাহার সহিত আমার চাদরখানিও

যোগ করিলাম। সেই দুই শত ঘুঁড়ি পৃথক্ পৃথক্ রাখিলাম বটে, কিন্তু সকলকেই সেই দড়ি ও চাদরে সংযুক্ত করিলাম। এইরূপ আয়োজন করিয়া যেদিন বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছিল, সেইদিন আমি ঘুঁড়িগুলি ছাড়িয়া দিলাম। যেই দড়ি ও চাদর আমার শরীরে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়াছিলাম। বায়ুভরে ঘুঁড়িগুলি সেই উড়িল, সঙ্গে সঙ্গে সেই সময় আমিও গির্জার চূড়া ছাড়িয়া দিলাম। ঘুঁড়িগুলি বায়ুভরে আকাশপথে চলিতে লাগিল, দড়ি ধরিয়া আমি তাহার নিচে ঝুলিতে লাগিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ঘুঁড়িগুলি মাটির দিকে নামিল না, আকাশের উপর উঠিতে লাগিল। ইহার কারণ এই যে, ঘুঁড়ি ছিল অনেকগুলি, বায়ুও অধিক প্রবল ছিল, আর মনোদুঃখে ও ভালরূপ আহার অভাবে আমার শরীর শীর্ণ শুষ্ক ও লঘু হইয়া গিয়াছিল।

হু হু শব্দে আমি আকাশে উঠিতে লাগিলাম। মেঘরাশি পার হইয়া অসীম আকাশের নিবিড় নীল প্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, আকাশে তখন সূর্য ছিল না। ভাগ্যে সেদিন কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি ছিল, আকাশে চন্দ্র ছিল না। সূর্য, কি চন্দ্র আমার মাথায় লাগিয়া গেলে বড়ই বিপদ ঘটিত। কিন্তু আকাশের উপর নক্ষত্র বিজ্ বিজ্ করিতেছিল। পাছে নক্ষত্র আমার চক্ষুতে লাগিয়া যায়, সেজন্য আমাকে বড়ই সতর্ক হইতে হইল। যতদূর সাধ্য অতি সাবধানে নক্ষত্রের নিকট দিয়া ঘুঁড়িগুলি চালাইতে লাগিলাম।

তথাপি হঠাৎ একটি নক্ষত্রের গায়ে আমার ঘুঁড়িগুলি লাগিয়া গেল। আকাশ-পটে নক্ষত্রগণ চুম্‌কির মতো আটা দিয়া জোড়া থাকে। কেবল যেগুলি মজবুত, সেইগুলি পিত্তলনির্মিত পেরেকের মতো পোতা থাকে। নিচে হইতে তাহাদের স্থূল গোড়াগুলি আমরা দেখিতে পাই। কোনো কোনো পুরাতন পেরেকের মতো নক্ষত্রের গোড়া আল্‌গা হইয়া গিয়াছে। খোঁচার মতো তাহারা উঠিয়া আছে। এইরূপ একটা নক্ষত্রের গায়ে আমার ঘুঁড়ি লাগিয়া গেল। নক্ষত্রটি তৎক্ষণাৎ আকাশ-পট হইতে খসিয়া পড়িল। সেই সঙ্গে আমার পঞ্চাশখানি ঘুঁড়ি ছিঁড়িয়া গেল। প্রথম আমার বড় ভয় হইয়াছিল, কিন্তু ইহা আমার

শাপে বর হইল। এখন আমি পৃথিবীর দিকে অল্প অল্প নামিতে লাগিলাম। এখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে ঘুড়ির সংখ্যা কিছু অধিক হইয়াছিল, সেইজন্য তাহারা নিচে নামে নাই, আমাকে লইয়া উপরে উঠিয়াছিল। একে একে ঘুড়িগুলিকে আমি কাটিয়া দিতে আরম্ভ করিলাম। ঘুঁড়ির সংখ্যা যতই অল্প হইতে লাগিল, ততই আমি নীচে নামিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে একপ্রকার কোলাহল শব্দ আমার কর্ণগোচর হইল। তখন ঘোর রাত্রি, নিবিড় অন্ধকার! নিচের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কিসের কোলাহল তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। আরও নিচে নামিলাম! সর্বনাশ! সুন্দরবন পার হইয়া আমি সমুদ্রের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। কিসের কোলাহল, এখন তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু আর উপায় নাই। সমুদয় ঘুড়ি প্রায় কাটিয়া দিয়াছি, পুনরায় উপরে উঠিবার আর উপায় নাই। ফলকথা, অবিলম্বে ঝপ্ করিয়া আমি সমুদ্রের জলে পড়িলাম। পর্বতসমান তরঙ্গ আমাকে একবার আকাশে তুলিতে লাগিল, একবার পাতালে নামাইতে লাগিল। নাকে মুখে আমার জল প্রবেশ করিতে লাগিল। ভয়ানক লোনা জল! ভাগ্যে আমি সাঁতার জানিতাম, তাই জলের উপর ভাসিয়া থাকিতে পারিলাম। কিন্তু সমুদ্রের পর্বতসমান ভীষণ তরঙ্গের ভিতর পড়িয়া মানুষ কতক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে। প্রাণের আশা আমি একেবারে ছাড়িয়া দিলাম। মনে মনে আমি ঠাকুরদের নাম করিতে লাগিলাম।

হাত-পা শিথিল হইয়া কখন্ জলমগ্ন হই, সেই প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় নিকটে বৃহৎ একটি ঝিনুক দেখিতে পাইলাম। আপনারা পুষ্করিণীতে যে ঝিনুক দেখিয়াছেন, এ সেরূপ নহে, এ সমুদ্রের ঝিনুক, বৃহৎ একখানি মানোয়ারি জাহাজের মতো। ঝিনুকটি হাঁ করিয়া সমুদ্র-জল পান করিতেছিল! আমি মনে করিলাম, ঝিনুকটির ভিতর গিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করি। এইরূপ মনে করিয়া আমি তাহার মুখের ভিতর প্রবেশ করিলাম। কিন্তু যেই তাহার ভিতর গিয়াছি, আর

ঝিনুক তৎক্ষণাৎ তাহার খোলা দুইখানি বন্ধ করিয়া দিল। যাহা হউক, পূর্বেই বলিয়াছি যে, ঝিনুকটি বৃহৎ একখানি মানোয়ারি জাহাজের মতো বড়। সেজন্য তাহার ভিতর বায়ুর অভাব ছিল না, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস কার্যে আমার কোন ক্লেশ হয় নাই। ঝিনুকের পেটের ভিতর তাহার নাড়ীর এক অংশ বালিশ করিয়া আমি শয়ন করিলাম। গির্জার চূড়ায় ঘূর্ণায়মান অবস্থায় অনেক দিন আমি নিদ্রা যাইতে পারি নাই। ঝিনুকের ভিতর আজ যেমন শয়ন করিলাম, তেমনি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

জীয়ন্ত সামুদ্রিক ঝিনুকের ভিতর শয়ন করিয়া কয় দিবস আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। বোধ হয়, তিনচারি দিন একাদিক্রমে নিদ্রা গিয়া থাকিব। নিদ্রা হইতে উঠিয়া ক্ষুধায় আমি কাতর হইলাম। ঝিনুকের উদরটি নিতান্ত অন্ধকারময় ছিল না কারণ, উহার পেটের ভিতর জালার মতো বৃহৎ একটি মুক্তা ছিল। সেই মুক্তার আলোকে ঝিনুকের উদরদেশ আলোকিত ছিল। ইতিপূর্বে ঝিনুক-মাংসের আমিষ গন্ধ আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছিল। এক্ষণে হাত দিয়া দেখিলাম যে, ঝিনুকটি বৃহৎ বটে, কিন্তু তাহার মাংস নিতান্ত কঠিন নহে। কাকের মাংস ভক্ষণে কাঁচা মাংসের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা দূর হইয়াছিল। সুতরাং জঠরের জ্বালায় আমি এইবার ঝিনুকের কাঁচা মাংস খাইতে আরম্ভ করিলাম। কথায় আছে যে এমন কাজ নাই, যাহা ক্ষুধার্ত ব্যক্তি না করিতে পারে।

ঝিনুকের উদরে থাকিয়া তিন মাস কাল তাহারই মংাস ভক্ষণ করিয়া আমি জীবনধারণ করিলাম। তিন মাস পরে সে-মাংস নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন কী খাইয়া প্রাণধারণ করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। তাহার মাংসভক্ষণে ঝিনুকটি কিছুদিন পূর্বে মরিয়া গিয়াছিল। সেজন্য শেষকালের মাংসে কিছু দুর্গন্ধও হইয়াছিল। দুইদিন উপবাসী থাকিয়া বাহির হইবার চেষ্টায় ভিতর হইতে ঝিনুকের খোলা ধরিয়া আমি টানাটানি করিতে লাগিলাম। আমার টানাটানিতে সহসা বজ্রপাতের মতো শব্দ হইয়া ঝিনুকটি দুই খণ্ড হইয়া গেল। এক-এক খণ্ড এক-

একখানি জাহাজের মতো সমুদ্রের উপর ভাসিতে লাগিল। যে খণ্ডের উপর আমি ছিলাম, তাহাতে জালার মতো প্রকাণ্ড মুক্তাটি ছিল না। অপর খণ্ড, যাহাতে মুক্তাটি ছিল, তাহা কিছুদূরে ভাসিতেছিল। আমি ভাবিলাম যে, যেমন করিয়া হউক, মুক্তাটি আমার দেশে লইয়া যাইতে হইবে। অতবড় মুক্তা কেহ কখনো দেখে নাই, উহার মূল্য সাত রাজার ধন। উহা বিক্রয় করিয়া পুরুষ-পুরুষানুক্রমে আমি ধনবান হইতে পারিব। এইরূপ মনে করিয়া আমি জলে ঝাঁপ দিয়া ঝিনুকের অপর খণ্ড, যাহার উপর মুক্তা ছিল, সাঁতার দিয়া তাহাতে গিয়া উঠিলাম।

আমাকে লইয়া ঝিনুকের খোলা সেই অকূল সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে চলিল। দুই দিন পরে দূরে একখানি জাহাজ দেখিতে পাইলাম। দাঁড়াইয়া, আমি আমার চাদর নাড়িয়া, জাহাজের লোককে সঙ্কেত করিতে লাগিলাম! কিন্তু তাহারা আমাকে দেখিতে পাইল না। অবিলম্বে জাহাজখানি অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

এইরূপে আরও পাঁচদিন কাটিয়া গেল। সাত দিন আমি অনাহারে ছিলাম, জল পর্যন্ত আমার উদরে যায় নাই। আমার শরীর ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িল, দুর্বলতায় আমার নিদ্রা আসিয়া গেল। অজ্ঞান-অভিভূত হইয়া আমি শুইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ নিদ্রা গিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। সমুদ্র-তরঙ্গে ঝিনুকের খোলাখানি উঠিতে-নামিতেছিল, সর্বদাই খোলাখানি সমুদ্রবক্ষে দুলিতেছিল। সহসা 'খ্যাস' করিয়া একটি শব্দ হইল ও সেই মুহূর্তে ঝিনুকের খোলাখানি স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহাতেই আমার নিদ্রা-ভঙ্গ হইল।

আমি দেখিলাম যে, ঝিনুকের খোলাখানি সমুদ্রতীরে লাগিয়াছে। তখন সন্ধ্যা হয় হয় হইয়াছে। অত দুঃখের পর আমি যে পুনরায় তীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাহা দেখিয়া আমার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। মনে করিলাম যে, উপরে নিশ্চয় গ্রাম আছে। গ্রামে গিয়া প্রথমে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ করিব, তাহার পর একখানি গোরুর গাড়ি আনিয়া মুক্তাটিকে লইয়া যাইব।

এইরূপ মনে করিয়া ঝিনুকের খোলা হইতে আমি নামিলাম, কিন্তু যেই আমি নামিয়াছি সঙ্গে সঙ্গে পর্বতপ্রমাণ একটি তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। তরঙ্গটি আমার মাথায় উপর দিয়া চলিয়া গেল। তরঙ্গ দ্বারা তাড়িত হইয়া আমি অনেক দূরে বালুকাময় শুষ্ক চড়ার উপর গিয়া পড়িলাম। তাড়াতাড়ি পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যেখানে ঝিনুকের খোলা ছিল, সেইদিকে তাকাইলাম। দেখিলাম যে নিম্নগামী তরঙ্গ-জলের সহিত ঝিনুকের খোলাখানি দূর সমুদ্র অভিমুখে চলিয়া যাইতেছে। হায়! হায়! আমার বহুমূল্য মুক্তাটি ভাসিয়া গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া রহিলাম। ঝিনুকের খোলাখানি সমুদ্রের মাঝখানে চলিয়া গেল,—অবিলম্বে সমুদ্র-তরঙ্গে লীন হইয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

সেই সময় পশ্চিমদিকে সূর্যদেব অস্ত গেলেন। বালুকাময় সমুদ্র-পরিত্যাগ করিয়া আমি উপরে উঠিতে লাগিলাম। উপরে উঠিয়া লোকালয় দেখিতে পাইলাম না। প্রথমে নিবিড় হেঁতাল বন দেখিতে পাইলাম। তাহার পর অন্যান্য গাছও দেখিতে পাইলাম। নিবিড় অরণ্য, যেদিকে তাকাই সেইদিকেই বন। আমি মনে করিলাম যে, এ জায়গাটি হয় সাগরদ্বীপ অথবা সুন্দরবনের অপর কোনো অংশ।

আরও অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বন নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইতে লাগিল। তখনও অল্প অল্প আলোক ছিল। সেই আলোকে দেখিতে পাইলাম যে, আমার দক্ষিণদিকে বনের ভিতর দিয়া কী একটা বৃহৎ জন্তু অতি নিঃশব্দে আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে। তখন আমার বড় ভয় হইল। আমি নিশ্চয় বুঝিলাম যে, এ অন্য জন্তু নহে, এ ব্যাঘ্র, দূর হইতে আমায় অনুসরণ করিতেছে, সুবিধা পাইলেই লম্ফ-প্রদানপূর্বক আমার ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। আমি তাড়াতাড়ি একটি গাছে উঠিয়া পড়িলাম। গাছে কিছুদূর উঠিয়াছি, আর বাঘ ভয়াবহ গর্জন করিয়া একলম্ফে সেই বৃক্ষতলে আসিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি আমি গাছের আরও উপরে উঠিতে লাগিলাম, বাঘ উচ্চ এক লম্ফ প্রদান করিয়া গাছ হইতে আমাকে পাড়িতে চেষ্টা করিল। কিন্তু আমি

তখন যেখানে উঠিয়াছিলাম, লম্ফ প্রদান করিয়াও বাঘ ততদূর পৌঁছিতে পারিল না। বাঘ পুনরায় ভূতলে পতিত হইল। ভীষণ গর্জন করিতে করিতে পুনরায় সে উঠিয়া দাঁড়াইল, আর আমার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু দুইটি গোলাকার অগ্নিশিখার মতো জ্বলিতে লাগিল।

গাছের উপর যতদূর উঠিতে পারা যায়, ততদূর আমি উঠিলাম। তাহার পর সরু ডালপালা তাহার উপর আর উঠিতে পারিলাম না। গাছটি একটু হেলা, অর্থাৎ বাঁকাভাবে জমি হইতে উঠিয়াছিল। সর্বনাশ! বাঘ গাছের উপর উঠিতে আরম্ভ করিল। আমি ভাবিলাম আর রক্ষা নাই। এইবার আমার আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে। প্রাণপণ যত্নে আমি গাছটি নাড়া দিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহাতে বাঘের কিছুমাত্র ক্ষতি হইল না। বাঘ ক্রমাগত গাছের উপর উঠিতে লাগিল।

আমার নিকট হইতে বাঘ আর পাঁচ হাত দূরে আছে, আমার নিকট হইতে আর চারি হাত আছে, আমাব নিকট হইতে আর তিন হাত আছে, আমার নিকট হইতে আর দুই হাত আছে। ভয়ে থরথর করিয়া আমার শরীর কাঁপিতে লাগিল।

বাঘ আমার একহাত নিচে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাকে ধরিবার জন্য সে হাত বাড়াইল। যদিও ইহার পর ডালপালা খুবই সরু ও ভঙ্গপ্রবণ ছিল, তবু প্রাণের দায়ে আমি আরও একটু উঁচুতে গিয়া উঠিলাম। আশ্চর্য! সেই সময় আমার মাথার উপর খিলখিল শব্দে কি যেন হাসিয়া উঠিল।

চকিত হইয়া আমি উপরে তাকাইলাম। দেখিলাম যে, ঠিক আমার মাথার উপর সরু এক ডালে এক নরমুণ্ড ঝুলিতেছে। দেহ হইতে মুণ্ডটি নূতন কর্তিত হইয়াছে, কারণ তাহার গলা হইতে তখনও ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়িতেছিল। মাথাটির মাঝখানে একগোছা চুল ছিল। সেই টিকিটি গাছের ডালে বাঁধা ছিল। টিকি দ্বারা লম্বিত হইয়া মুণ্ডটি নারিকেলের মতো বৃক্ষশাখায় ঝুলিতেছিল। মুণ্ডটি খিলখিল করিয়া হাসিতেছিল, আর আমাকে খাইবার জন্য মুখ হাঁ করিয়াছিল। কী

ভয়ানক তাহার দুই পাটি দাঁত।

উপরে অদ্ভুত ভয়াবহ মুণ্ড, নিচে দুরন্ত ব্যাঘ্র, আমি বড়ই বিপদে পড়িলাম। কিন্তু তখন অন্য সকল চিন্তা আমার মন হইতে দূর হইল। মনে করিলাম যে,—মুণ্ড! তুমি ভূত হও, আর রাক্ষস হও, তোমার দ্বারা আমি ব্যাঘ্রের মুখ হইতে রক্ষা পাইব।" এইরূপ ভাবিয়া আমি মুণ্ডটিকে ধরিয়া টান মারিলাম। তাহার শিখার কেশগুচ্ছ চড়চড় করিয়া ছিঁড়িয়া গেল। একটানে মুণ্ডটিকে গাছের ডাল হইতে ছিঁড়িয়া টিকি দিয়া ধরিলাম। সম্মুখে টাটকা নরমুণ্ড দেখিয়া ব্যাঘ্রের মুখে যেন একটু হাসি দেখা দিল। যথালাভ মনে করিয়া সে হাত দিয়া মুণ্ডটি ধরিল। পরক্ষণেই এক লম্ফ দিয়া গাছের নীচে গিয়া পড়িল। তাহার পর নর-মুণ্ডটিকে মুখে লইয়া ব্যাঘ্র দ্রুতবেগে বনের ভিতর প্রবেশ করিল।

ষষ্ঠ রজনী

ডাকিনীর বাড়ি

আমি বৃক্ষ হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় আর একটি ভয়াবহ দৃশ্য আমার নয়নগোচর হইল। জন্তু নহে, মনুষ্য নহে, কিরূপ নূতন একপ্রকার জীব এইসময় বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইল। মানুষের মতো তাহার আকৃতি, কিন্তু প্রায় ছয় হাত লম্বা। মূর্তিটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণের নরদেহ অনেকদিন রৌদ্রে শুষ্ক করিলে যেরূপ হয় মুর্তিটি সেইরূপ শীর্ণ ও শুষ্ক ছিল। তাহার শরীরে মাংস একেবারেই ছিল না। শুষ্ক চর্ম দ্বারা কেবল হাড়গুলি আবৃত ছিল। তাহার মুখ কৃষ্ণবর্ণের বৃহৎ একটি ঝুনা নারিকেলের মতো ছিল। মাথার চুল ঠিক ছোবড়ার মতো, কাঁধ পর্যন্ত ঝুলিয়া ছিল। তাহার স্তন নাভিদেশ পর্যন্ত পড়িয়াছিল। অলঙ্কারস্বরূপ তাহার দুই কানে দুইটি সাদা কৃমি ঝুলিতেছিল। নোলকের মতো নাকেও একটি কৃমি ছিল। সেই কৃমির ডগায় মুক্তার জায়গায় বড়ো একটি কোলা ব্যাঙ ঝুলিতেছিল। মূর্তিটির

কোমর রক্তবর্ণের ঘাগরা দ্বারা আবৃত ছিল, কিন্তু সে ঘাগরা কেবল হাঁটু পর্যন্ত পড়িয়াছিল। তাহার নিচে শুকনা বাঁশের মতো পা দুইখানি অনাবৃত ছিল। মুখমণ্ডলে মানুষের যেখানে চক্ষু থাকে, ইহার সেই জায়গায় দুইটি কোটর ছিল, আর সেই কোটরের মধ্যে দুইটি রক্তবর্ণের বর্তুল ঘূর্ণিত হইতেছিল। এখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেই ভয়াবহ মূর্তি মাঝে মাঝে মুখ হাঁ করিতেছিল, আর সেই সময় তাহার মুখের ভিতর হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। সেই আগুনের আলোকে আমি তাহার শরীরের ভাবভঙ্গী দেখিতে পাইলাম। সেই আলোকে আমি তাহার দাঁত দুই পাটিও দেখিতে পাইলাম। কি লম্বা কি উজ্জ্বল সাদা দাঁত! যেন নরমাংস চিবাইবার জন্য সেই দাঁত গঠিত হইয়াছে। সেইরূপ ভয়ানক দৃশ্য পূর্বে আমি কখনো দেখি নাই। ভয়ে আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। নীরবে গাছের উপর আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। আমি যে গাছে বসিয়াছিলাম, এই ভয়াবহ মূর্তি আসিয়া সেই গাছে আরোহণ করিল। কিছুদূর উঠিয়া একটি মোটা ডালের উপর ঘোড়ায় চড়ার মতো সে উঠিয়া বসিল। তাহার পর বিড়-বিড় করিয়া সে কিরূপ শব্দ করিল। আর সেই মুহূর্তে বৃক্ষটি আকাশের উপর উঠিয়া হু-হু শব্দে বায়ুর ন্যায় চলিতে লাগিল। তখন আমি সকল কথা বুঝিতে পারিলাম। গাছটি ডাকিনীর গাছ। সেই অদ্ভুত জীব ডাকিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে। পূর্বে আমার ধারণা ছিল যে ডাকিনীদিগের আকৃতি ঠিক মানুষের মতো হয়। কিন্তু সেদিন আমার সে ভ্রম দূর হইল। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে ডাকিনীদিগের আকৃতি কতকাংশে মানুষের মতো হইলেও উহারা অতি ভয়াবহ জীব।

গাছ, দেশ-প্রদেশ, নদ-নদী অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় এক পার্বত্য প্রদেশে গিয়া উপস্থিত হইল। চারিদিকে গিরিশ্রেণী, সেই সমুদয় গিরিশ্রেণী নিবিড় অরণ্যে আবৃত। ইহাই কি হিমালয় প্রদেশ।

এই স্থানে উপস্থিত হইয়া বৃক্ষ পৃথিবীতে অবতরণ করিল। পৃথিবী স্পর্শ করিবামাত্র ইহার মূল এরূপভাবে ভূমিতে লাগিয়া গেল, যেন বীজ

হইতে উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষটি সেই স্থানেই চিরকাল বর্ধিত হইয়াছে। ডাকিনী লম্ফ প্রদান করিয়া বৃক্ষ হইতে নামিল। সেই মুহূর্তে নিকটস্থ এক গিরিগহ্বর হইতে আর-একটি ডাকিনী বাহির হইল। তাহার আকৃতিও ঠিক প্রথম ডাকিনীর মতো ছিল। কিন্তু ইহার মুখ কৃষ্ণ-বর্ণের ঝুনা নারিকেলের মতো নহে, শুকনা লাউয়ের মতো। দ্বিতীয় ডাকিনী নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"নারিকেলমুখী! মুণ্ড আনিয়াছ?" তাহার প্রশ্ন শুনিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, প্রথম ডাকিনীর মুখ নারিকেলের মতো, সেইজন্য তাহার নাম নারিকেলমুখী। নারিকেলমুখী উত্তর করিল,—"হাঁ লাউমুখী! মুণ্ড আনিয়াছি। ভাল মুণ্ড! আজ চমৎকার ডাঁটা খেলা হইবে।"

নারিকেলমুখীর এই উত্তরে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, গহ্বর হইতে যে ডাকিনী বাহির হইল, তাহার নাম 'লাউমুখী।'

লাউমুখী বলিল,—"তবে আমি আমার মুণ্ড লইয়া আসি, আর জয়-পরাজয় বিচার করিবার জন্য ভূমিকম্প-দাদাকে ডাকিয়া আনি।"

এই কথা বলিয়া পুনরায় সে গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিল। অল্পক্ষণ পরে সে টাটকা একটি নরমুণ্ড হাতে লইয়া বাহির হইল। তাহার সঙ্গে এক বৃদ্ধও গহ্বর হইতে বাহির হইলেন। ডাকিনীদ্বয়ের মুখ-নির্গত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আলোকে আমি দেখিলাম যে, ইনি সেই বৃদ্ধ, পৃথিবীতে ভূমিকম্প করা যাঁহার ব্যবসায়। তাঁহাকে দেখিয়া আমার বড় ভয় হইল। কিন্তু নারিকেলমুখী গাছের নিচে দাঁড়াইয়া আছে, পলায়ন করিবার কোনো উপায় ছিল না। সেজন্য গাছের উপর আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

বৃদ্ধের সহিত, মুণ্ড হাতে লইয়া লাউমুখী গিরিগহ্বর হইতে বাহির হইয়া বলিল,—"কৈ নারিকেলমুখী! তোমার মুণ্ড কৈ? রাত্রি অধিক হইয়াছে। শীঘ্র এস, ডাঁটা খেলা আরম্ভ করি। কে হারে, কে জিতে, ভূমিকম্প ঠাকুরদাদা তাহার বিচার করিবেন।"

"আমার মুণ্ড লইয়া আসি।"—এই কথা বলিয়া নারিকেলমুখী বৃক্ষে আরোহণ করিতে লাগিল। আমার বড় ভয় হইল। যেখানে মুণ্ড

ঝুলানো ছিল, সেখান হইতে সরিয়া গাছের আর-এক ডালে গিয়া আমি লুকাইয়া থাকিতে চেষ্টা করিলাম।

নারিকেলমুখী গাছে উঠিয়া মুণ্ড অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু যেখানে মুণ্ড ঝুলিতেছিল, সেখানে মুণ্ড নাই। "এ কী হইল! মুণ্ড কোথায় গেল!"—এইরূপ বলিতে বলিতে ঘোরতর বিস্মিতা হইয়া সে গাছের এ শাখা সে-শাখা হাতড়াইতে লাগিল। সামান্য সেই গাছে কতক্ষণ আর আমি লুকাইয়া থাকিতে পারি? সহসা তাহার বাখারি মতো হাত আমার গায়ে ঠেকিয়া গেল। "এ কি!" এই কথা বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ আমাকে ধরিয়া ফেলিল। তাহার পর জোর করিয়া গাছ হইতে নামাইয়া সে আমাকে ভূমিকম্পের নিকট লইয়া গেল।

বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া নারিকেলমুখী বলিল,—"দাদা! গাছে আমার মুণ্ড নাই। তাহার পরিবর্তে গাছে এই আস্ত মানুষটি ছিল। এই মানুষ বোধ হয় আমার মুণ্ড চুরি করিয়াছে।"

ভূমিকম্প বৃদ্ধ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?"

আমি উত্তর করিলাম,—"আমি আপনার অপরিচিত নহি। কলিকাতা গড়ের মাঠে যাহাকে আপনি একটাকার ভূমিকম্প বিক্রয় করিয়াছিলেন, আমি সেই ব্যক্তি।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"বটে! তুমি সেই ব্যক্তি। ইহার মুণ্ড লইয়া তুমি কী করিয়াছ?"

মুণ্ড লইয়া যাহা করিয়াছিলাম, সত্য সত্য বৃদ্ধকে সেই বিবরণ আমি প্রদান করিলাম। বৃদ্ধ তাহা শুনিয়া বলিলেন,—"এ বড় বিষম কথা! নাতিনী দুইটি মুণ্ডে মুণ্ডে ঠোকাঠুকি করিয়া ডাঁটা খেলে। তোমাদের মতো ইহাদের পা নাই যে, ইহারা ফুটবল খেলিবে। কিন্তু এ বড় অন্যায় কথা যে, তোমরা তাহাদিগকে এ সামান্য খেলা হইতেও বঞ্চিত করিবে। অন্য লোক হইলে, তাহার মুণ্ডটি ছিঁড়িয়া আমি নাতিনীকে ডাঁটা খেলিতে দিতাম। কিন্তু তুমি আমার খরিদদার। সেজন্য তোমার মুণ্ড আমি ছিঁড়িয়া লইতে পারি না। কিন্তু নারিকেল-মুখীর মনোদুঃখ তোমায় নিবারণ করিতে হইবে। তাহাকে তোমার

বিবাহ করিতে হইবে। আজ রাত্রিতেই তাহার সহিত তোমার আমি বিবাহ দিব। লাউমুখী! বিবাহের আয়োজন কর। শাঁখ আনো। আমি নিজে শাঁখ বাজইব। লাউমুখী, তুমি উলু দাও।”

লাউমুখী তৎক্ষণাৎ উলুধ্বনি করিল। উলু! উলু! উলু! তাহার উলুধ্বনিতে জগৎ ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

নারিকেলমুখীর দিকে আমি একবার চাহিয়া দেখিলাম। তাহার রূপ দেখিয়া আমার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। এ কিম্ভুতকদাকার ডাকিনীকে কিরূপে আমি পত্নীরূপে বরণ করিব!

অতি মিনতিসহকারে আমি ভূমিকম্প মহোদয়কে বলিলাম,—“মহাশয়! আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিলেন, তাহা আমার শিরোধার্য। কিন্তু মহাশয়! আমি হইলাম মানুষ, ইনি হইলেন ডাকিনী। ইঁহার সহিত কিরূপে আমার পরিণয় হইতে পারে? তাহা ব্যতীত ঘরে আমার আর একটি পত্নী আছেন। সপত্নীর নিকট গিয়া আপনার নাতিনীর সুখ হইবে না।”

ভূমিকম্প ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—“সেজন্য তোমার কোনো চিন্তা নাই। তোমাকে আমরা ছাড়িয়া দিব না। নারিকেলমুখী তোমাকে ভেড়া করিয়া চিরকাল এইখানে রাখিয়া দিবে।”

আমি বলিলাম,—“সে সুখের কথা বটে। কিন্তু মহাশয়! এরূপ সুপাত্রীর উপযুক্ত পাত্র আমি নই।”

ভূমিকম্প উত্তর করিলেন,—“সে চিন্তা তোমাকে করিতে হইবে না। নারিকেলমুখীর ভাব দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, তোমাকে উহার পছন্দ হইয়াছে।”

এই কথা শুনিয়া নারিকেলমুখী ঈষৎ হাসিল।···পুনরায় ঈষৎ হাসিয়া ব্যাঙ লাগানো নোলকটি একবার নাড়িল। তাহার অপূর্ব রূপ ও হাবভাব দেখিয়া আমার মন একেবারে মোহিত হইয়া গেল। আমি ভাবিলাম যে, মৃত্যু হউক, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, তথাপি এই কদাকার ডাকিনীকে আমি বিবাহ করিতে পারিব না।

বৃদ্ধের নিকট আমি বারবার অনেক ওজর-আপত্তি করিলাম, কিন্তু

বচনে আমি অনেক সাধ্যসাধনা করিলাম। কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই আমাকে নিষ্কৃতি দিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া আমি বলিলাম,—"মহাশয়! ইনি ডাকিনী, আমি মানুষ। কিছুতেই আমি ইহাকে বিবাহ করিব না। আপনি আমার মাথা কাটিয়া ইহাকে দিন। আমার মুণ্ড লইয়া ইনি ভাঁটা খেলুন। বিবাহ আমি ইহাকে কিছুতেই করিব না।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"তুমি আমার খরিদদার। তোমার মুণ্ড আমি কিছুতেই কাটিয়া ভাঁটা করিতে পারি না। নারিকেলমুখীকে তোমার নিশ্চয় বিবাহ করিতে হইবে। লাউমুখী! শাঁখ আনো। উলু দাও।"

পুনরায় উলুধ্বনিতে আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এইবার উলু দিতে দিতে লাউমুখী আমার নিকটবর্ত্তী হইয়া মৃদুস্বরে বলিল,— "বল যে, ঐ মন্দিরে গিয়ে কালীর গলার মুণ্ডমালা হইতে একটি মুণ্ড আনিয়া দিতেছি।"

আমি চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, কিছু দূরে বনের ভিতর একটি ভগ্ন মন্দির রহিয়াছে। লাউমুখীর সঙ্কেত আমি বুঝিতে পারিলাম।

ভূমিকম্প-বৃদ্ধকে আমি বলিলাম,—"এ বিবাহকার্য অল্পক্ষণের জন্য আপনি স্থগিত রাখুন। আমি আপনাদের মুণ্ড লইয়াছি, তাহার পরিবর্তে আর একটি মুণ্ড আনিয়া দিতেছি।"

বিস্মিত হইয়া ভূমিকম্প আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর একটি মুণ্ড তুমি আনিয়া দিবে! সে-মুণ্ড তুমি কোথায় পাইবে?"

আমি উত্তর করিলাম,—"ঐ মন্দিরে মা আছেন। মায়ের গলায় যে মুণ্ডমালা আছে, তাহা হইতে একটি মুণ্ড আমি আনিয়া দিব।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ সন্ধান তোমাকে কে বলিয়া দিল?"

আমি কোনো উত্তর করিলাম না।

ভূমিকম্প-বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন,—"এ কথার উপর, কথা বলিবার আমাদের শক্তি নাই। যখন তুমি মা জগদম্বার নাম করিয়াছ, তখন আর আমরা কোনো আপত্তি করিতে পারি না। যদি তুমি মায়ের

মুণ্ডমালা হইতে ভাল একটি মুণ্ড আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে আমরা ছাড়িয়া দিব। কিন্তু মায়ের গলা হইতে মুণ্ড আনয়ন করা নিতান্ত সহজ কাজ নহে।"

আমি বলিলাম,—"সহজ হউক আর কঠিন হউক, আমি এ-কাজ করিতে চেষ্টা করিব।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"বেশ! তবে চল, সকলে মন্দিরে যাই। আমরা মন্দিরের বাহিরে থাকিব। নারিকেলমুখী ও লাউমুখীর সহিত আমি সম্মুখদিকে পাহারা দিব। শাঁখমুখীকে ডাকিয়া আন, সে নিজের দলবলের সহিত পশ্চাৎদিকে পাহারা দিবে। তুমি পলাইতে পারিবে না।"

শাঁখমুখী তাহার দলবলের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে আমরা মন্দিরের নিকট গেলাম। আমি মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। ঠিক দ্বারে শ্রীমতী নারিকেলমুখী পাহারা-রহিলেন। তাঁহার বামদিকে ভূমিকম্প মহাশয় ও দক্ষিণদিকে শ্রীমতী লাউমুখী বসিয়া রহিলেন। মন্দিরের পশ্চাৎদিকে শাঁখমুখী তাঁহার দলবলের সহিত পাহারা দিতে লাগিল।

সপ্তম রজনী

মুণ্ডমালা

ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমি দেখিলাম যে, মন্দিরটি অতি প্রাচীন, কিন্তু নিতান্ত ভগ্ন হয় নাই। ভিতরে একটি কালীমূর্তি আছে। মূর্তিটি বোধ হয় পাথরের। মন্দিরের একপার্শ্বে একটি কুলুঙ্গি আছে, সেই কুলুঙ্গিতে লৌহ-নির্মিত একটি প্রদীপ মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল। মায়ের পাদপদ্মে ফুল ও কুলুঙ্গিতে প্রদীপ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, মায়ের নিত্য-পূজা হইয়া থাকে। বোধ হয়, ডাক ও ডাকিনীগণ তাঁহার পূজা করে। কিন্তু আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার। মায়ের হাতে ও গলায় যে নরমুণ্ড রহিয়াছে, সে মুণ্ডগুলি প্রস্তরনির্মিত কৃত্রিম মুণ্ড নহে। প্রকৃত টাট্‌কা নরমুণ্ড। কিন্তু সকল মুণ্ডই মুণ্ডিত, কেবল

উপরিভাগে এক-একটি শিখা আছে। সেই টিকি দ্বারা আবদ্ধ হইয়া মুণ্ডগুলি মালার সূত্রে লম্বিত আছে। ডাকিনীর বৃক্ষে আমি যেরূপ মুণ্ড দেখিয়াছিলাম, আর সেই মুণ্ডটি বৃক্ষশাখায় যেভাবে টিকি দ্বারা লম্বিত ছিল, মায়ের গলদেশেও সেইরূপ মুণ্ড ছিল ও সেইভাবে লম্বিত ছিল।

মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অতি ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে মাতাকে আমি প্রণাম করিলাম। তাহার পর মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া স্তবস্তুতি করিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,—"মা জগদম্বে! তুমি জগতের মাতা। মা! তুমি দক্ষিণ হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া জগৎকে অভয় ও বর প্রদান করিতেছ, আমাকে মা তুমি অভয় প্রদান কর। আমি মা, বড় বিপদে পড়িয়াছি। তোমার নিকট মা, কোনো বিষয় অবিদিত নাই। কত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে আমি ডাকিনীর হাতে পড়িয়াছি। মা! নারিকেলমুখীকে আমি কিছুতেই বিবাহ করিতে পারিব না। কিন্তু মা, সে আমাকে জোর করিয়াই বিবাহ করিবে। তোমার মুণ্ডমালা হইতে যদি একটি মুণ্ড আমাকে প্রদান কর, তাহা হইলে, মা, এ-বিপদ হইতে আমি পরিত্রাণ পাই। কিন্তু মা, তোমার অনুমতি বিনা আমি মুণ্ড লইতে পারি না। সেই অনুমতি, মা, তুমি আমাকে প্রদান কর।"

মা বোধ হয় আমার স্তবে সন্তুষ্টা হইলেন। কারণ, আমি দেখিলাম যে, তাঁহার অভয় ও বর হস্তযুগল নিম্নগামী হইল, আর তাঁহার মুখমণ্ডল প্রসন্নভাব ধারণ করিল।

মায়ের এইরূপ প্রসন্নভাব দর্শন করিয়া মুণ্ডমালা স্পর্শ করিতে আমার সাহস হইল। পূর্বেই বলিয়াছি যে, মুণ্ডগুলি টিকি দ্বারা লম্বিত ছিল। আমি মনে করিলাম যে, অনায়াসেই একটি মুণ্ড খুলিয়া লইতে পারিব। এইরূপ মনে করিয়া প্রথমে আমি বন্ধন খুলিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে-বন্ধন কিছুতেই খুলিতে পারিলাম না। তাহার পর আমি মনে করিলাম যে, মুণ্ডটি অনায়াসে ছিঁড়িয়া লইতে পারিব। মুণ্ডটি ধরিয়া টানিতে লাগিলাম। আমার দেহে যত বল ছিল, সমুদয় বল

প্রয়োগ করিয়া দুই হাতে টানাটানি করিতে লাগিলাম। কিন্তু কিছুতেই ছিঁড়িতে পারিলাম না। তাহার পর মায়ের হাতের খড়্গখানি লইয়া শিখাটি কাটিতে চেষ্টা করিলাম। খড়্গ অতি সুতীক্ষ্ণ ছিল, তথাপি শিখার একগাছি কেশও কাটিতে পারিলাম না। তাহার পর কুলুঙ্গি হইতে সেই লৌহ-প্রদীপটি আনিয়া দীপশিখা দ্বারা টিকিকেশগুচ্ছ দগ্ধ করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহার একগাছি কেশও দগ্ধ হইল না। নিরুপায় হইয়া সে-মুণ্ডটি ছাড়িয়া অন্য মুণ্ডগুলি একে একে টানিয়া দেখিলাম। কিন্তু একটি মুণ্ডও মালা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলাম না। অবশেষে মায়ের বামহস্তের মুণ্ডটি দুই হাতে ধরিয়া টানিতে লাগিলাম। বাহির হইতে ডাকিনীগণ খল্‌খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমার টানাটানি দেখিয়া মুণ্ডটির মনে বোধ হয় দয়া হইল। ঈষৎ হাসিয়া সে আমাকে বলিল,—"বৃথা টানাটানি! ভগদত্তর হাতি আনিয়া যদি তুমি টানা-হেঁচড়া কর, তাহা হইলেও কিছু করিতে পারিবে না।"

আমি বলিলাম,—"তবে, মহাশয়, কৃপা করিয়া আপনি নিজে গমন করুন। আপনি না গমন করিলে নারিকেলমুখী আমাকে বিবাহ করিবে।"

মুণ্ড বলিল,—"বেশ তো! অমন চমৎকার পত্নীরত্ন লাভ করিবে, সে তো আনন্দের বিষয়।"

আমি বলিলাম,—"মহাশয়! এ তামাসার সময় নহে। আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। আমার প্রতি আপনি কৃপা করুন।"

মুণ্ড বলিল,—"মন্দ কথা নহে! আমি নারিকেলমুখীর নিকট স্ব-ইচ্ছায় গমন করিব। আমাকে লইয়া লাউমুখীর সহিত সে ভাঁটা খেলিবে। লাউমুখীর যে আর-একটি মুণ্ড আছে, তাহার সহিত আমাকে ঠোকাঠুকি করিবে। যদি আমি ভাঙ্গিয়া যাই, তাহা হইলে লাউমুখী জিতিবে; আর যদি লাউমুখীর মুণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে নারিকেলমুখী জিতিবে। ভাবিয়া দেখ, এরূপ কাজে কোন্ মুণ্ড স্ব-ইচ্ছায় গমন করে?"

আমি বলিলাম,—"মহাশয় দেবতা! মায়ের বামহস্তে আপনি

বিরাজ করিতেছেন। আমি আপনার নিকট কৃপাভিক্ষা করিতেছি। কৃপা করিয়া যদি আপনি আমাকে রক্ষা করেন, তবেই হয়।”

মুণ্ড বলিল,—“দেখ! আমরা বেতাল। আমরা সমস্যা, হেঁয়ালি, গল্প ভালবাসি। সমস্যা দিলে বিক্রমাদিত্যের ন্যায় পূরণ করিতে পারিবে?”

আমি বলিলাম,—“না মহাশয়! আমার সে শক্তি নাই। আমি পাড়া-গেঁয়ে অজ্ঞ লোক।”

মুণ্ড বলিল,—“তবে তুমি একটি গল্প কর, আমি শুনি। তাহার পর, ডাকিনীর হাত হইতে তোমাকে উদ্ধার করিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।”

আমি বলিলাম,—“মহাশয়! পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমি একজন পাড়া-গেঁয়ে অজ্ঞ লোক। গল্প আমি জানি না।”

বেতাল অর্থাৎ মুণ্ড বলিল,—“তুমি সমস্যা-পূরণ করিতে পারিবে না, তুমি গল্প বলিতে পারিবে না, কোনো কাজ করিতে পারিবে না। অথচ, তোমার ইচ্ছা যে, আমি গিয়া আর একটি মুণ্ডের সহিত ঠোকাঠুকি করি। এ কি কাজের কথা! যাও! নারিকেলমুখীকে বিবাহ করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর-কন্না কর।”

আমি বড় বিপদে পড়িলাম। গল্প আমি জানি না। অথচ, গল্প না বলিলে মুণ্ডলাভ হয় না। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া আমি বলিলাম, —“মহাশয়! ভাল গল্প আমি জানি না। তবে দুই-একখানি পুস্তকে ও সংবাদপত্রে গুটিকত গল্প আমি পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু সে-গল্প কি আপনার ভাল লাগিবে?”

বেতাল বলিল,—“সেই গল্প আমি ভালবাসি। বিলম্ব করিও না, শীঘ্র আরম্ভ কর।”

আমি বলিলাম,—“আচ্ছা, মহাশয়! একটি গল্প আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কিন্তু এ গল্পটি সামান্য এক গোপ-কন্যার কথা। সেই গোপকন্যার নাম ছিল আহুরী।”

বেতাল বলিল,—“আহুরী! গোয়ালার মেয়ে! তাহার গল্প শুনিতে

আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। সে আত্নরীর কী হইয়াছিল, তাহা বল।”

আমি বলিলাম,—“এ গল্পটি আমি কোনো সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলাম। গল্পটি যেরূপ পাঠ করিয়াছি, সেইরূপ আপনাকে বলিতেছি। শ্রবণ করুন।”

এই বলিয়া আমি আত্নরী ও আরশির গল্প বলিতে আরম্ভ করিলাম। মায়ের বামহস্তে মুণ্ড ও মালার মুণ্ডগণ মনোযোগপূর্বক আমার গল্প শুনিতে লাগিল।

আহুরী ও আরশি

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাঁচ কম পাঁচ কুড়ি

"আহুরি! আহুরি!" প্রাচীরের গায়ে গোবরলেদি দিতে দিতে আহুরীর মা চীৎকার করিয়া কন্যাকে ডাকিতে লাগিলেন।

"ও আহুরি! আহুরি! ও আভাগি!"—আহুরীর মা পুনরায় চীৎকার করিয়া ডাকিলেন।

ঘরের ভিতর হইতে আহুরী সাড়া দিল। সামান্য একখানি মেটে ঘর। তাহার পাশে একটু রান্নার চালা। অপরদিকে গোরু থাকিবার আর-একটি ছোট চালা।—এই হইল আহুরী ও আহুরীর মায়ের ঘর। জাতিতে উহারা গোয়ালা। ছুইটি দুগ্ধবতী গাভী,—এই হইল তাহাদের সম্পত্তি।

"বেলা হইয়া গেল যে! কখন্ হাটে যাইবি? দুপুরবেলা হাটে গেলে কি আর দই বিক্রি হইবে?"—আহুরীর মা পুনরায় চীৎকার করিয়া মেয়েকে বকিতে লাগিলেন।

গাভী দুইটির দুগ্ধ ও দধি বিক্রয় করিয়া, আহুরীর মা দিনপাত করেন। যখন দুগ্ধ না থাকে, তখন ধান কিনিয়া চাউল প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন। সেই পরিশ্রমে যাহা লাভ হয়, তাহাতে একপ্রকার চলিয়া যায়,—তবে কষ্টে।

একবার আহুরীর মায়ের সৌভাগ্য-সূর্যের উদয় হইয়াছিল। সে আজ প্রায় দশ বৎসরের কথা। তখন আহুরীর মাতামহী অর্থাৎ আহুরীর আয়ী, বা দিদিমা জীবিতা ছিলেন। একদিন গোরু হারাইয়া গিয়াছিল। বনে-বাদাড়ে আহুরীর দিদিমা খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন। সেদিন নিকটের একখানি গ্রামে এক শৃগাল ক্ষেপিয়াছিল। সে গ্রামের অনেকগুলি লোককে দংশন করিয়াছিল। পাছে আমাদের গ্রামে

আসিয়া আমাকে কামড়ায়, এই ভয়ে আতুরীর মাতামহী ছোট একটি ঠেঙা হাতে করিয়া গোরু খুঁজিতেছিলেন।

যাইতে যাইতে দেখিলেন যে, সামান্য একটি মেঠো পথের ধারে একজন সাহেব বসিয়া আছেন। সাহেব পাখি মারিতে আসিয়াছিলেন। শ্রান্ত হইয়া, বন্দুকটি পাশে রাখিয়া, গাছতলায় বসিয়া, পকেট হইতে কী বাহির করিয়া সাহেব খাইতেছিলেন। সভয়ে আতুরীর দিদিমা একপাশ দিয়া চলিয়া গেলেন। দুই-চারি হাত গিয়া, সাহেব কী করিতেছেন, তাহা দেখিবার জন্য একবার মুখ ফিরাইলেন। সর্বনাশ! দেখিলেন যে, সাহেবের পিঠের জামার উপর সামনের দুই পা রাখিয়া তাঁহার ঘাড়ের উপর একটা শৃগাল উঠিতেছে! অন্য স্ত্রীলোক হইলে ভয়ে পলায়ন করিত। কিন্তু আতুরীর আয়ী ডাকা-বুকো সাহসী স্ত্রীলোক ছিলেন।

"ও সাহেব, পাগলা শেয়াল! ও সাহেব, শেয়াল!"—এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে তিনি সাহেবের পশ্চাৎদিকে আসিয়া শৃগালটিকে হাতের ঠেঙ্গার বাড়ি দুই ঘা মারিলেন। শৃগাল সাহেবকে ছাড়িয়া আতুরীর দিদিমাকে আক্রমণ করিল ও দুই-তিন স্থানে বিলক্ষণ দংশন করিল! মুহূর্তমধ্যে সাহেবও উঠিয়া বন্দুকের কুঁদোর আঘাতে শৃগালকে বধ করিলেন।

আতুরীর মাতামহীকে শৃগালে দংশন করিয়াছে, রক্ত পড়িতেছে, তাহা দেখিয়া সাহেব সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। সাহেব বলিলেন,—"তুমি আমার সঙ্গে শহরে চল, ভাল ডাক্তার দেখাইয়া তোমার চিকিৎসা করাইব। তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ, তোমার ঋণ আমি কিছুতেই শুধিতে পারিব না।"

আতুরীর দিদিমা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন,—"তোমার সহিত শহরে গেলে, ডাক্তারের ঔষধ খাইলে, আমার জাতি যাইবে। আমি ঘরে লোহা পোড়াইয়া দিব, কলার ভিতর করিয়া স্বজানি বসাত খাইব; তাহা করিলেই ভাল হইয়া যাইব। আমি বৃদ্ধা বিধবা; আমাদের সহজে মৃত্যু হয় না।"

সাহেব তাহার পর তাঁহাকে ছোট একটি চামড়ার থলি, অর্থাৎ মনিব্যাগ, দিলেন ও বলিলেন,—"তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ। সে-ঋণ ইহাতে শোধ হয় না। তবে আমার নিকট যাহা ছিল, সমস্ত আমি তোমাকে দিলাম। ইহার ভিতর যাহা আছে, তাহা খরচ করিয়া নিজের চিকিৎসা করাইবে।"

এই বলিয়া সাহেব প্রস্থান করিলেন।

বাড়ি আসিয়া আতুরীর আয়ী মনিব্যাগ খুলিয়া দেখিলেন যে, তাহার ভিতর পাঁচটি টাকা ও ছোট একখানি ছাপার কাগজ রহিয়াছে। টাকা কয়টি লইয়া তিনি কাগজখানি ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু আতুরীর মা বলিলেন,—"মা! কাগজখানি ফেলিয়ো না, এ হয়তো সামান্য কাগজ নয়; সেই যারে বলে নোট, এ হয়তো তাই। হাটবারদিন হাটে গিয়া গদাধর কাপড়ওয়ালাকে দেখাইবে। এ নোট কি না, সে তোমায় বলিয়া দিবে।"

হাটবারদিন সমুদায় বৃত্তান্ত বলিয়া আতুরীর দিদিমা গদাধরকে কাগজখানি দেখাইলেন। গদাধর সৎ লোক! গদাধর বলিল,—"এ নোট বটে! একশত টাকার নোট। কিন্তু নোট ভাঙ্গাইতে হইলে বাটা লাগে। এই কাগজখানি লইয়া আমি তোমাকে পাঁচ কম পাঁচ কুড়ি টাকা দিতে পারি।"

কিন্তু তাহাকে তৎক্ষণাৎ কাগজখানি না দিয়া আতুরীর দিদিমা আরও পাঁচজনকে দেখাইলেন। অন্যান্য লোক কেহ চারিটাকা কম, কেহ তিন টাকা কম, কেহ দুই টাকা কম পাঁচ কুড়ি টাকা দিতে চাহিল। কিন্তু আতুরীর দিদিমা তবুও কাগজখানি কাহাকেও দিলেন না। বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া মেয়েকে বলিলেন,—"এত নগদ টাকা এখন এই কুঁড়ে-ঘরে আনিলে বাড়িতে ডাকাত পড়িবে, আমাদের সকলকে কাটিয়া ফেলিবে। আমার ঘা সারিয়া গেলে, আমি ভাল হইলে, চুপি চুপি টাকাগুলি আনিয়া ঘটি করিয়া এক স্থানে পুতিয়া রাখিব। এখন খরচ করিয়া ফেলা হইবে না। সময় আছে, অসময় আছে। অসময়ে কাজে লাগিবে।"

তাহাই স্থির হইল। আদুরীর মাতামহী নোটখানি লুকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু কোথায় রাখিলেন, সে কথা কাহাকেও বলিলেন না, মেয়েকেও বলিলেন না। আদুরীর দিদিমার জলাতঙ্করোগ ঘটিল না বটে; কিন্তু অল্পদিন পরে জ্বরবিকার-রোগে সহসা তাঁহার মৃত্যু হইল। পীড়ার প্রারম্ভেই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। সুতরাং নোটখানি কোথায় যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারিলেন না।

তাঁহার মৃত্যু হইলে, আদুরীর মা ঘর আতি-পাতি করিয়া সর্বত্র খুঁজিলেন, কিন্তু নোট কিছুতেই পাইলেন না। নোটখানির জন্য অনেক কাঁদিলেন, অনেক দুঃখ করিলেন, অবশেষে নিরাশ হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। সুতরাং আদুরীর মাতার সৌভাগ্যসূর্য যেমনি উদয় হইল, তেমনি অমাবস্যা-নিশির নিবিড়তম-রাশিতে মিশিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চন্দ্রহার

"আদুরি! আদুরি! পোড়ারমুখি! বেলা উল্‌টে গেল যে! তোর জন্যে কি হাট বসিয়া থাকিবে? পোড়ারমুখি! দইটুকু না বেচিলে নুন লঙ্কা, হলুদ কোথা হইতে আসিবে? আর কি সে নোট আছে, যে মট্‌ করিয়া ভাঙ্গাইব আর এক মালসা টাকা লইয়া আসিব? তা যে, কপালগুণে কাঠের ময়ূরে হার গিলিল। তোর কি! তুই দুই দিন পরে শ্বশুরবাড়ি যাবি। আমার এমন কেউ নাই যে, একবেলা একমুঠা ভাত দেয়।"

এইরূপ বলিয়া মা আদুরীকে বকিতে লাগিলেন।

ঘরের ভিতর হইতে আদুরী বলিল,—"যাই মা! যাই! এই যাই! এখনও তত বেলা হয় নাই।"

আদুরী কিছু বিলম্ব করিতেছিল, সত্য। বিলম্ব করিবার বিশেষ কারণও ছিল। আদুরী নিতান্ত বালিকা নহে, অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী। দুইবার শ্বশুরবাড়ী ঘর করিয়াছে। সংসারের কাজ লইয়া ছোট ননদ

অর্থাৎ স্বামীর ছোট ভগিনীর সহিত কলহ হইয়াছিল। বিনা দোষে ছোট ননদ তাহাকে মারিয়াছিল। ভগিনীকে কিছু বলিতে না পারিয়া স্বামী আদুরীকে মায়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আজ কয় মাস আদুরী মাতার গৃহে বাস করিতেছে; কিন্তু তাহার সর্বদা ভয় পাছে শ্বশুরবাড়ির লোক, লাগাইয়া-ভাঙ্গাইয়া স্বামীকে পর করিয়া দেয়। স্বামী পূর্বে যেরূপ ঘন ঘন তাহার নিকট আসিতেন, এক্ষণে সেরূপ ঘন ঘন আর আসেন না। গতকল্য আসিবার কথা ছিল; কিন্তু আসেন নাই। তাহাও আদুরীর এক দুঃখের কারণ হইয়াছিল। স্বামী হয়তো হাটে আসিবেন, স্বামীর সহিত হয়তো হাটে সাক্ষাৎ হইবে, এই ভাবিয়া আদুরী আজ একটু ভাল করিয়া সাজ-গোজ করিতেছিল। সেইজন্যই আদুরীর ঘর হইতে বাহির হইতে বিলম্ব হইতেছিল। মা, আদুরীর মনের কথা জানেন না; বিলম্ব দেখিয়া মা চীৎকার করিয়া ডাকিতেছিলেন।

আহুরীর একখানি ভাল কালোপেড়ে কাপড় ছিল। সেই ধবধবে কাপড়খানি আজ সে পরিধান করিল। একটু তেল মাখিয়া মাথার চুল গুলি আঁচড়াইল। গর গরে চুন খয়ের দিয়া একটি পান খাইল। ঘরের ভিতর মেটে দেওয়ালের গায়ে পেরেকে বহুদিনের ছোটএকখানি আরসি থাকিত। পান খাইয়া ঠোঁট লাল হইল কি না, তাহা দেখিবার জন্য পেরেক হইতে আহুরী-আরশিখানি পাড়িয়া লইল। আরশিখানি হাতে লইয়া ঠোঁট একটু ফুলাইয়া মুখ দেখিতে লাগিল। যে দুই-এক গাছি চুল এলোথেলো ভাবে আশে পাশে পড়িয়াছিল, তাহা সোজা করিয়া দিল।

একমনে এইরূপ ভাবনা করিতে ব্যস্ত আছে, এমন সময়ে বাহির হইতে মা পুনরায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"পোড়ারমুখি! আজ কি তুই আর বার হবি না?"

"যাই মা! যাই!"—এই কথা বলিয়া আহুরী আরশিখানি দেওয়ালের গায়ে পেরেকে ঝুলাইতে গেল। দৈবক্রমে আরশির সূতা পেরেকে না লাগিয়া পাশ দিয়া গেল। আরশিখানি তাহার হাত হইতে

পড়িয়া চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। দুঃখে ও ভয়ে আদুরীর মন নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িল। বহু দিনের আরশি। এই আরশিতে তাহার দিদিমা যৌবনকালে মুখ দেখিয়াছিলেন, চুল বাঁধিয়াছিলেন; তাহার মাও তাহাই করিয়াছিলেন। আদুরী নিজেও বাল্যকাল হইতে এই আরশিতে মুখ দেখিতেছিল। আজ সেই আরশিখানি তাহার অসতর্কতায় ভাঙ্গিয়া গেল। মা সহজেই উগ্রস্বভাববিশিষ্টা স্ত্রীলোক; কথায় কথায় সর্বদা বকিয়া ঝকিয়া থাকেন। আজ মা যে কত তিরস্কার করিবেন, তাহার ঠিক নাই। খণ্ড খণ্ড হইয়া আরশি ঘরের মেঝেতে পড়িয়া রহিল। সে সব কাচের খণ্ড আদুরী আর তুলিল না। ভয়-বিহ্বল চিত্তে, শশব্যস্ত হইয়া দধির ভাড় মাথায় লইয়া, সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঘরের ভিতর ঝণাৎ করিয়া কী শব্দ হইল?"

আদুরী তাহার উত্তর না দিয়া কেবল বলিল,—"ইশ! অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে!" এই বলিয়া হনহন করিয়া সে চলিয়া গেল!

হাটের নিকট বড় একটি আমবাগান আছে। সেই আমবাগান পার হইয়া হাটে প্রবেশ করিতে হয়। আদুরী দেখিল যে, সেই আমবাগানের ভিতর একজন পুরুষ একটি স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্তা কহিতেছেন। পুরুষ মানুষটি যে তাহার স্বামী, আদুরী তাহা চিনিতে পারিল। স্ত্রী-লোকটির কেবল পশ্চাৎ দিক সে দেখিতে পাইল, তাহাকে সে চিনিতে পারিল না।

আদুরী রাগিয়া সোজা পথ ছাড়িয়া ঘুর পথ ধরিল। কাঁটা খোঁচা পায়ে ফুটিতে লাগিল। কিন্তু আদুরীর তাহাতে গ্রাহ্য নাই। মনের আবেগে দ্রুতবেগে সে চলিতে লাগিল। সহসা একটা কাঁটায় বাধিয়া তাহার সেই কালোপেড়ে কাপড়খানি ফালা ফালা হইয়া ছিঁড়িয়া গেল। বহুকালের সঞ্চিত আরশিখানি ভাঙ্গিল, স্বামী পর হইয়া গেল, বড় সাধের কালোপেড়ে কাপড় ছিঁড়িয়া নষ্ট হইল!—আদুরীর আর দুঃখের সীমা রহিল না।

নিকটে একটি ছোট পুষ্করিণী ছিল। সেই পুষ্করিণীর ধারে, এক নির্জন গাছতলায়, দধির ভাঁড়টি মাথা হইতে নামাইয়া সে ভূমিতে রাখিল। তাহার পর বাম হাতের উপর গাল রাখিয়া বসিয়া বসিয়া নীরবে সে কাঁদিতে লাগিল। দরদর ধারায় চক্ষের জল তাহার হাত বাহিয়া পড়িতে লাগিল। বিপদের উপর বিপদ! এমন সময় কোথা হইতে একটা কুকুর আসিয়া সেই দধিভাণ্ডের ভিতর মুখ প্রবেশ করাইয়া দধি খাইতে চেষ্টা করিল। দধিভাণ্ড গড়াইয়া পুষ্করিণীর ভিতর পড়িল।

আর কিছু বাকি রহিল না! দুর্ভাগ্য একেবারে চরম সীমায় উঠিল। "হে ঠাকুর! আমার উপর আজ কেন এত লাগিয়াছ?" এই বলিয়া আদুরী আরও অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই স্থানে বসিয়া কাঁদিল। নিজের দুঃখ চাপা দিয়া, "মাকে আজ কী বলিয়া মুখ দেখাইব."—কেবল তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। যাহা হউক, আর কী করিবে? অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া সে ধীরে ধীরে উঠিল। তাহার পর হাটে প্রবেশ করিল। সেখানে স্বামীকে দেখিতে পাইল না। একজন অপরিচিত লোকের নিকট হইতে দুই আনা পয়সা ধার করিয়া লঙ্কা, হলুদ, লবণ প্রভৃতি যাহা আবশ্যক ছিল তাহা ক্রয় করিল। তাহার পর দুই প্রহর অতীত হইয়া গেলে, বিষণ্ণবদনে বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

বাড়ি আসিয়া, আদুরী দাওয়ার উপর থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল ও দুই হাতে চক্ষু দুইটি ঢাকিয়া অবিরত কাঁদিতে লাগিল। মা যত বলিলেন,—আদুরী, কাঁদিস কেন?—আদুরী, কাঁদিস কেন?"—আদুরী তাহার কোন উত্তর না দিয়া, কেবল ততই কাঁদিতে লাগিল। মা সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

অনেক সান্ত্বনার পর অবশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে আদুরী বলিল,—মা! আজ যে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না।"

মা বলিলেন,—আজ যাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিস, প্রতিদিন যেন তাহার মুখ দেখা আমাদের ভাগ্যে ঘটে।"

এ আবার কী কথা! আরশির জন্য তো গালাগালি তিরস্কারই হইবে,—তাহা না হইয়া, মায়ের মুখে মিষ্ট কথা। চক্ষু হইতে হাত দুইখানি সরাইয়া বিস্মিতভাবে আদুরী মাতার মুখপানে চাহিল।

আদুরীর মা বলিলেন,—"হাটের কাছে আমবাগানে জামাইকে দেখিয়া তুই ঘুরপথে চলিয়া গিয়াছিলি কেন? তোর বড় ননদ, যে তোকে বড় ভালবাসে, তাহার শ্বশুরবাড়ী হইতে সে আজ হাটে আসিয়াছিল। তোর ছোট ননদ বিনা অপরাধে তোকে মারিয়াছে,—ভাই-ভগিনীতে সেই কথা হইতেছিল। হাটের মাঝখানে ঘরের কথা না বলিয়া আমবাগানে একটু আড়ালে গিয়া ভাই-ভগিনীতে কথাবার্তা হইতেছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া তুই ঘুরপথ দিয়া পলাইয়া গেলি কেন?"

আদুরীর তখন চক্ষু ফুটিল। আদুরী তখন বুঝিতে পারিল যে, তাহার স্বামী অন্য কোনো স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতেছিলেন না, আপনার বড় ভগিনীর সহিত কথাবার্তা কহিতেছিলেন।

আদুরীর মা পুনরায় বলিলেন,—"তোর বড় ননদ তোকে দেখিতে আসিয়াছে। তোর জন্য চমৎকার একখানি নীলাম্বরী শাড়ি আনিয়াছে, গুলবসানো ভাল নীলাম্বরী কাপড়;—দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। জামাইও আসিয়াছেন। তাঁহারা স্নান করিতে গিয়াছেন। আর আদুরি! এখনও তোকে আমি সকল কথা বলি নাই। বড় আহ্লাদের কথা, আদুরী—

স্বামী আসিয়াছেন শুনিয়া, আদুরীর মন প্রফুল্ল হইল। সহাস্য বদনে আদুরী জিজ্ঞাসা করিল,—কী মা? কী আহ্লাদের কথা?"

আদুরীর মা বলিলেন,—"বল দেখি, কী? সেই যারে বলে চন্দ্রহার।

ব্যগ্র হইয়া আদুরী জিজ্ঞাসা করিল,—"কী মা? কী? বল না।"

আদুরীর মা বলিলেন,—"এত দেশ থাকিতে তোর আয়ী আর স্থান পায় নাই। আরশির পিছনের কাঠ খুলিয়া, নোট যে তাহার ভিতর গুঁজিয়া রাখিবে, আবার কাঠটি যেরূপ ছিল, সেইরূপ করিয়া জুড়িয়া দিবে, এত কারখানা যে তোর আয়ী করিবে,—এ-কথা আমি কী করিয়া

জানিব ? অন্য কোনোখানে লুকাইয়া রাখিলে পাছে উইপোকায় খাইয়া ফেলে সেইজন্য, বোধ হয়, তোর আয়ী আরশির ভিতর রাখিয়াছিল। যাহা হউক, ভাগ্যে আজ তুই আরশিখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিলি, তাই তো নোটখানি বাহির হইয়া পড়িল। আমি ঘরের ভিতর গিয়া দেখিলাম, আরশি চুরমার হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া রাগে আমার সর্ব শরীর জ্বলিয়া গেল। তোরে গালি দিতে দিতে কাচগুলি কুড়াইতেছি এমন সময় দেখি না পাশে একখানি কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে। কাগজখানি তুলিয়া দেখিলাম যে, সেই নোট ! তখন তোরে যে কত আশীর্বাদ করিলাম, তা বলিতে পারি না।"

সেদিন বড় আনন্দের দিন বটে। স্বামী আসিয়াছেন, বড় ননদ আসিয়াছেন, নীলাম্বরী কাপড় হইয়াছে, তাহার পর সেই এক ঘটি টাকার কাগজ পুনরায় লাভ হইয়াছে। স্বামীর সহিত কথাবার্তা হইলে আহুরীর মুখে আর হাসি ধরে না !

আহুরীর মা পঞ্চাশ টাকা দিয়া মেয়েকে রূপার চন্দ্রহার গড়াইয়া দিলেন। সময় অসময়ের জন্য বাকি টাকা ঘটি করিয়া ঘরের এক কোণে পুতিয়া রাখিলেন।

ভুতের বাড়ি

দ্বিতীয় মুণ্ড

ঘনশ্যাম বলিলেন,—সুবল গড়গড়ি মহাশয় আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—গল্পটি সমাপ্ত করিয়া মুণ্ডকে আমি বলিলাম,—'তবে, মহাশয়। এখন চলুন।'

আমি কোনো উত্তর পাইলাম না।

কোনো উত্তর না পাইয়া মুণ্ডের দিকে আমি চাহিয়া দেখিলাম। আশ্চর্য! মায়ের বাঁহাতে মুণ্ড নাই। মুণ্ডের জায়গায় চমৎকার একটি রক্তবর্ণের বৃহৎ মুক্তা রহিয়াছে। মুণ্ড এক্ষণে সেই মুক্তার আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এমন মুক্তা কখনো দেখি নাই। সমুদ্রের মাঝখানে জ্বালার মতো মুক্তা দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার এরূপ জ্যোতি ছিল না। মায়ের বাঁ হাতে এ রক্ত-মুক্তার প্রভায় চারিদিক্ আলোকিত হইয়া ছিল।

কিছুক্ষণ আমি স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। এখন কী করা উচিত, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। চিন্তা করিয়া অবশেষে এই স্থির করিলাম যে, ডাকিনীর কাছে যাইতে একে একে সমস্ত মুণ্ডকে অনুরোধ করিব। একান্ত কাহাকেও যদি না লইয়া যাইতে পারি, সকল মুণ্ডই যদি ইহার মতো রক্ত-মুক্তার রূপ ধারণ করে, তাহা হইলে শেষকালে মায়ের এই খড়্গে আমি নিজের মুণ্ড মায়ের পাদপদ্মে সমর্পণ করিব।

এইরূপ স্থির করিয়া মুণ্ডমালার নিম্নদেশে যে মুণ্ডটি ছিল, তাহাকে আমি বলিলাম,—"মহাশয়, আপনাদিগকে খুলিয়া কি কাটিয়া কি ছিঁড়িয়া লইয়া যাই, এরূপ শক্তি আমার নাই, তবে অনুগ্রহ করিয়া যদি আমার সহিত স্ব-ইচ্ছায় ডাকিনীর নিকট গমন করেন, তবেই আমার পরিত্রাণ হয়।"

মুণ্ডমালার মুণ্ড বলিল,—"একটি গল্প বল।"

আমি বলিলাম,—"এইমাত্র একটি গল্প করিলাম, কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হইল না। গল্পটি শুনিয়া আমাকে ফাঁকি দিয়া মায়ের হাতে উনি রক্ত-মুক্তার আকার ধারণ করিলেন।"

মালার মুণ্ড বলিল,—"তবে ডাকিনীকে গিয়া বিবাহ কর।"

ইহার শেষ পর্যন্ত দেখিতে হইবে, মনে মনে আমি এইরূপ স্থির করিয়াছিলাম। সেজন্য অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া আমি আর-একটি গল্প বলিতে আরম্ভ করিলাম।

আমি বলিলাম,—"মুণ্ড-মহাশয়! এবার আমি আপনার নিকট এক ভূতের গল্প করিব। এ বিলাতী ভূত, দেশী ভূত নহে, এ ঘটনাটি বিলাতে ঘটিয়াছিল।"

মুণ্ড বলিল,—"তবে শীঘ্র আরম্ভ কর, ভূতের গল্প শুনিতে আমি বড় ভালবাসি।"

আমি বলিলাম,—"এ গল্পটি টম্‌সাহেবের কথা, আমার নিজের কথা নহে। মনে করুন, যেন টম্ সাহেব এ গল্পটি করিতেছেন।"

প্রথম পরিচ্ছেদ

টম সাহেব

টম্ সাহেব বলিতেছেন—

সম্প্রতি একজন পুরাতন বন্ধুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। হাসিতে হাসিতে তিনি আমাকে বলিলেন,—"দেখ টম্, এ লণ্ডন নগরে একখানি ভূতের বাড়ি আছে।"

আমি উত্তর করিলাম,—"বটে! সত্য বলিতেছ, না তামাসা করিতেছ? তুমি পণ্ডিত লোক, ভূতে তোমার বিশ্বাস নাই।"

আমার বন্ধু বলিলেন,—"না ভাই, না, তামাসা নয়। সেই বাড়ি আমি ভাড়া লইয়াছিলাম। তিন দিনের অধিক তাহাতে বাস করিতে পারি নাই। বিশেষ কিছু যে ভয়ানক দেখিয়াছি, তাহা নহে। তবে কিরূপ শব্দ হয়, মনের ভিতর সর্বদাই কেমন একটা আতঙ্ক হয়। কিন্তু

সেই বাড়িতে একজন বৃদ্ধা বাস করে। কী করিয়া সে থাকে, তা জানি না। বৃদ্ধা বলিল,—"কোন ভাড়াটিয়াই সে বাড়িতে দুই দিনের অধিক বাস করিতে পারে না।"

বন্ধুর কথা শুনিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম। ভূতের বাড়ি! এত দিনের পর বুঝি আমার সাধ মিটিল। ভূত কিরূপ দেখিতে, চিরকাল আমার মনে একান্ত বাসনা। সেই সাধ মিটাইবার জন্য আমি শ্মশানে বনে জঙ্গলে ঘোর নিশীথে কত যে ঘুরিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ভূত দেখা আমার কপালে কখনো ঘটে নাই। আজ কি ভগবান আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন! দেখা যাউক, কী হয়।

বন্ধুর নিকট হইতে সে-বাটির ঠিকানা জানিয়া লইলাম। বাড়ির নিকট গিয়া দেখিলাম—তালা বন্ধ! প্রতিবাসীর নিকট শুনিলাম যে, সে বাড়িতে যে বৃদ্ধা বাস করিত, সম্প্রতি তাহার মৃত্যু হইয়াছে। রাত্রি-কালে ভূতে ঘাড় ভাঙ্গিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। সেই পর্যন্ত সে বাড়ির ভিতর মনুষ্য দূরে থাকুক, কাক পক্ষী কেহ প্রবেশ করে না। সে বাড়িতে নেঙটি ইন্দুর কি বড় ইন্দুর, কোনো ইন্দুর বাস করে না। আমার আরও কৌতূহল জন্মিল। প্রতিবাসীদের নিকট হইতে গৃহস্বামীর ঠিকানা জানিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি ধনবান্ লোক।

ভূতের বাড়ি আমি ভাড়া লইব শুনিয়া তিনি আমাকে বলিলেন,—"বাড়ির যে দুর্নাম আছে, তাহা বোধ হয়, শুনিয়া থাকিবেন। আমি এতদিন নানা দেশ ভ্রমণ করিতেছিলাম। সম্প্রতি দেশে আসিয়াছি। আমার খুড়ামহাশয় ঐ বাড়ি ক্রয় করিয়াছিলেন। কবে হইতে ঐ বাড়িতে ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হয়, তাহা আমি বলিতে পারি না। সপরিবারে নিজে আমি ঐ বাড়িতে দুইদিন বাস করিয়াছিলাম। দুইদিনের পর প্রাণভয়ে পলাইয়া আসিলাম। আপনি যদি সে-বাড়িতে কিছুদিন বাস করিতে পারেন, তাহা হইলে ভাড়ার টাকা লওয়া দূরে থাকুক, বরং ঘর হইতে আপনাকে কিছু দিতে প্রস্তুত আছি।"

যাহা হউক, আমি চাবি লইয়া আসিলাম। আমার একজন

ডানপিটে বীরপুরুষ চাকর ছিল। ভূত-প্রেত দানা-দৈত্য কিছুই সে মানিত না। মনে তাহার অপরিমিত সাহস, দেহে তাহার অসীম বল। তাহাকে আমি সকল কথা খুলিয়া বলিলাম, আর জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেমন হে, তুমি আমার সহিত সে বাড়িতে রাত্রি যাপন করিবে ?"

চাকর উত্তর করিল,—"ভূত! ভূত আমার কাছে আসিবে ? আমি ভূতের বাবা! দেখি, কেমন আমার সম্মুখে ভূত বাহির হয়! ভূতের চড়চড়ি করিয়া খাইব।

তাহার কথা শুনিয়া আমার মনে আহ্লাদ হইল। ভূত মানি আর নাই মানি, তবু যেন স্থানবিশেষে প্রাণটা কেমন ছেঁক ছেঁক করে, গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে। একজন সঙ্গী থাকিলে মনে অনেকটা সাহস হয়। চাকরের হাতে চাবি দিয়া আমি বলিলাম,—তুমি তবে সেই বাড়ীতে যাও, ঘর দরজা পরিষ্কার করিয়া রাখ, বিছানা ঠিক করিয়া রাখ। আমার পিস্তল ও ছোরা লইয়া যাও, তোমার নিজেরও পিস্তল ও ছোরা ছাড়িও না। সন্ধ্যাবেলা আমি সেখানে যাইব।"

সন্ধ্যার সময় আমি সে বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার চাকর দরজা খুলিয়া দিল। চাকরের মুখে ঈষৎ হাসির রেখা দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হে, সব ভাল তো ?"

ভৃত্য বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ, সব ভাল।" এই কথা বলিয়া চাকর আর একটু ঈষৎ হাসিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিছু দেখিয়াছ, নাকি ?"

সে উত্তর করিল,—"আজ্ঞে না, কিছু দেখি নাই, তবে আমার কাছে কে যেন ফুশ্ ফুশ্ করিয়া কথা কহিতেছিল। এরূপ শব্দ বার বার শুনিয়াছি।"

আমি বলিলাম,—"তোমার ভয় হইয়াছে নাকি ?"

চাকর হাসিয়া বলিল,—"ভয়! আমার শরীরে ভয় নাই, আমি ভূতের বিধাতাপুরুষ। যদি ভূত দেখিতে পাই, আনন্দ হইবে, ভয়ের লেশ মাত্র মনে উদয় হইবে না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভূতের খেলা

চাকরের সহিত এইরূপ কথা কহিতে কহিতে আমি বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলাম। সঙ্গে আমার একটি কুকুর ছিল। কুকুরটি অতি বিক্রমশালী, ভীরুতা কাহাকে বলে সে জানিত না। আপনা অপেক্ষা দ্বিগুণ দেহবিশিষ্ট বড় বড় ডালকুত্তাকে তাড়া করিয়া তাহার ঘাড় ধরিত। কোনো নূতন বাড়িতে গেলে প্রথমেই সে কোথায় ইঁদুর আছে, কোথায় আরশোলা আছে, তাহার জন্য গলি-ঘুঁজি এ-কোণ সে-কোণ শুঁকিয়া ফোঁশ্ ফোঁশ্ করিয়া বেড়াইত। কিন্তু আজ সেই কুকুরের ব্যবহার দেখিয়া আমার বড়ই আশ্চর্য বোধ হইল। প্রথমত সে সেই বাড়ির ভিতর কিছুতেই প্রবেশ করিবে না। অনেক আদর করিয়া ভুলাইয়া যদিও প্রবেশ করাইলাম, কিন্তু ভয়ে একবারে জড়সড় হইয়া গেল। পদদ্বয়ের ভিতর লাঙ্গুল রাখিয়া কুণ্ডলী হইয়া সে কাঁপিতে কাঁপিতে আমার পায়ে পায়ে জড়াইতে লাগিল। লম্ফ ঝম্ফ নাই, শব্দ নাই, ইন্দুর অনুসন্ধান নাই। আজ সে নীরব, আজ তাহার কিছুই নাই। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমরা এ-ঘর সে-ঘর বেড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। প্রকাণ্ড অট্টালিকা, একতালা, দোতলা, তেতালায় কত যে কামরা, তাহা বলিতে পারি না। দেখিতে দেখিতে আমরা বৃহৎ একখানি ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই ঘরের ভিতর, ভূতের দৌরাত্ম্য যাহাকে বলে, তাহার প্রথম সূচনা হইল।

ঘরটি আমার চাকর পরিষ্কার করে নাই। মেজেতে ঘন হইয়া ধুলা পড়িয়াছিল। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ দেখিলাম, আমার ঠিক সম্মুখে একটি পায়ের দাগ পড়িল। শিশুর পদচিহ্ন। তাহার আগে, কি আশেপাশে আর দাগ নাই, কেবল সেই একটি দাগ মাত্র। অগ্রসর হইয়া সেই পদচিহ্নের উপর আমার নিজের পা রাখিলাম। অমনি, ঠিক সেই সময়ে আমার সম্মুখে আর একটি পায়ের দাগ পড়িল। আমি চাকরের গা টিপিলাম, চাকরও আমার গা টিপিল। এইরূপে

যতই যাই, আগে আগে ধূলার উপর ততই এক-একটি শিশুপদচিহ্ন অঙ্কিত হইতে থাকে। কিন্তু কেবল এক পায়ের চিহ্ন, দুই পায়ের দাগ পড়ে না। যখন ঘরের অপর প্রান্তে প্রাচীরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন আর দাগ পড়িল না।

সে-ঘর হইতে বাহির হইয়া আমরা অন্যান্য ঘর পরিদর্শন করিতে লাগিলাম। ক্রমে একখানি বড় ঘরে গিয়া বসিলাম। তখন রাত্রি হইয়াছিল। চাকর বাতি জ্বালাইয়া আমার সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিল। সহসা ঘরের অন্য দিক্ হইতে একখানি চৌকি আকাশপথে উড়িয়া ঠিক আমার সম্মুখে পড়িল। আমি বলিলাম,—"বাঃ! মন্দ কথা নয়!"

ক্রমে দেখিলাম, সেই চৌকির উপর কী যেন বসিয়া রহিয়াছে। মানবের আকৃতি বটে, কিন্তু তাহার দেহ যেন অতি তরল ধূম দ্বারা গঠিত। কুকুরটি ভয়বিহ্বল হইয়া ঘোরতর আর্তনাদ করিতে লাগিল। চাকর তাহাকে শান্ত করিতে গেল। ঘাড় হেঁট করিয়া কুকুরকে শান্ত করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয় কি আমার পিঠে কিল মারিলেন?

আমি উত্তর করিলাম,—"না, কী হইয়াছে?"

চাকর বলিল,—"আমার পিঠে কে যেন ভয়ানক একটা কিল মারিল।"

আমি বলিলাম,—"এ সব কাণ্ডকারখানা বোধ হয় বদমায়েশ লোকের। কী করিয়া করিতেছে, ধরিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব বাহির না করিয়া আমি ক্ষান্ত হইব না।"

তারপর সেই ঘর পরিত্যাগ করিয়া আমরা দ্বিতলে গিয়া উঠিলাম। আমার শয়ন-ঘর দ্বিতলেই নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তখনও নিদ্রা যাইবার সময় হয় নাই। সুতরাং সব তলায় অন্যান্য ঘর পরিদর্শন করিতে লাগিলাম। একটি ক্ষুদ্র কামরার নিকট উপস্থিত হইয়া চাকর বলিল,—'এ কী হইল! এ ঘরের দরজা বন্ধ কেন? আমি এইমাত্র ইহার চাবি খুলিয়া কপাট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি।' আমি

দরজা টানিয়া দেখিলাম, ভিতর হইতে কে খিল বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বিস্ময়ে দরজার দিকে চাহিয়া আছি, এমন সময়ে, আশ্চর্য ব্যাপার। দ্বার আস্তে আস্তে আপনি খুলিয়া গেল। আমরা দুইজনে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। একপ্রকার অমানুষিক গন্ধে ঘর ক্রমে পরিপূরিত হইতে লাগিল। এক প্রকার ভৌতিক ত্রাসে আমাদের হৃদয় অবসন্ন হইতে লাগিল। সে আশঙ্কা যে কী, তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। নরজীবনের প্রতিকূল কোনো একটা ভীষণ পদার্থ যেন সেই ঘরে আছে, এইরূপ আমাদের মনে হইল। সর্বনাশ! সহসা ঘরের দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। সে-ঘরে আর অপর দরজা কি জানালা ছিল না। প্রথম দুই জনে দরজা টানা-টানি করিয়া দেখিলাম। কিছুতেই খুলিতে পারিলাম না। আমার চাকর বলিল,—"অতি পাতলা তক্তা দিয়া কপাটজোড়াটি গঠিত। দুই লাথিতে ভাঙ্গিয়া ফেলিব। দেখি, ভূতে কি করিয়া রক্ষা করে! দুই লাথি নয়, হাজার লাথিতেও সে কপাট ভাঙ্গিল না। আমিও অনেক চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কিছুতেই সে ভঙ্গপ্রবণ কপাট ভাঙ্গিতে পারিলাম না। শ্রান্ত হইয়া আমরা নিবৃত্ত হইলাম। তখন খলখল করিয়া বিকট হাসির শব্দ হইল। দরজাটি আস্তে আস্তে আপনি খুলিয়া গেল। সে ভয়াবহ ঘর হইতে তাড়াতাড়ি আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম।

সে-ঘর হইতে বাহির হইয়া আমরা বারেণ্ডায় দাঁড়াইলাম। এক পার্শ্বে মিট মিট করিয়া কেমন একটা নীলবর্ণের অলৌকিক আলো জ্বলিতেছিল। কি আলো, কোথায় যাইতেছে, দেখিবার জন্য আমরা তাহার পশ্চাদগামী হইলাম। সিঁড়ি দিয়া আমাদের আগে আগে আলোটি তেতালায় উঠিতে লাগিল। তেতালার উপর উঠিয়া সামান্য একটি শয়নাগারে প্রবেশ করিল। যে-বৃদ্ধা এই বাড়িতে একাকী বাস করিত, এই ঘরটি তাহার ছিল, আমরা এইরূপ অনুমান করিলাম। ঘরের ভিতর একটি দেরাজ ছিল। খুলিয়া দেখিলাম, তাহার ভিতর একখানি রেশমের রুমাল রহিয়াছে। রুমালের একধারে দুইখানি চিঠি বাঁধা রহিয়াছে। চিঠি দুইখানি লইয়া সে-ঘর হইতে বাহির হইলাম।

দ্বিতলে আসিবার জন্য সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলাম। মনে হইল, আমার পাশে পাশে যেন আর কেহ নামিতেছে। কিন্তু তাহাকে আমি দেখিতে পাইতেছিলাম না। সহসা খপ্ করিয়া কে আমার হাত ধরিল। আমার হাত হইতে চিঠি দুইখানি কাড়িয়া লইবার জন্য কে যেন বার বার চেষ্টা করিল। দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আমি তাহার সে চেষ্টা বিফল করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঘোর বিভীষিকা

আমার নিজের শয়নাগারে উপস্থিত হইয়া প্রথমে ঘড়ি, পিস্তল ও ছোরা মেজের উপর রাখিলাম। কাছের ছোট একটি ঘরে চাকরকে শুইতে বলিলাম। মাঝের দরজা খোলা রহিল। কুকুর ঘোরতর ভয়ে ভীত হইয়া ঘরের কোণে গিয়া আশ্রয় লইল। মাঝে মাঝে ত্রাসজনিত বিকট কান্নার মতো শব্দ করিতে লাগিল। যে পত্র দুইখানি উপর হইতে আনিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা পড়িতে লাগিলাম। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে চিঠি দুইখানি কোনো একটি পুরুষ তাহার প্রিয়তমাকে লিখিয়াছিল, কিন্তু নাম-ধাম কাহারও ছিল না। ভালবাসার কথা ছাড়া, তাহাতে কোনো একটা বিভীষিকার আভাসও ছিল। যেন কে কাহাকে খুন করিয়াছে, এই ভাবের কথা। পত্র দুইখানি পাঠ করিয়া আমি চৌকির উপর রাখিলাম। ঘরে দুইটি বড় বড় বাতি জ্বলিতেছিল। শীতপ্রধান দেশ—আগুনের জায়গায় দাউ দাউ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছিল। ফলকথা, ঘরটি উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত ছিল। সহসা টেবিলের উপর হইতে আমার ঘড়িটি শূন্যপথে চলিয়া যাইতে লাগিল। এক হাতে ছোরা, অপর হাতে পিস্তল লইয়া তাড়াতাড়ি আমি ঘড়ি ধরিতে দৌড়িলাম। কিন্তু "সোঁৎ" করিয়া ঘড়ি যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল আমি আর তাহা দেখিতে পাইলাম না।

পুনরায় আমি চৌকিতে বসিয়া একখানি পুস্তক খুলিয়া পড়িতে লাগিলাম। ঘরের ভিতর এইবার বিকট শব্দ হইতে লাগিল। কুকুরটি ভয়ানক কাতর রবে ঘর পরিপূরিত করিল। আমি তাহাকে থামাইতে গেলাম। যে কুকুর আমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত, আজ সেই কুকুর আমাকে কামড়াইতে আসিল। দংশনভয়ে আমি তাহার গায়ে হাত দিতে সাহস করিলাম না।

চাকর এই সময় সহসা তাহার ঘর হইতে দৌড়িয়া আসিল। চক্ষু রক্তবর্ণ, যেন কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছে। তাহার সর্বশরীরে রোমাঞ্চ, মাথার চুলগুলি সব খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। মুখে নীল মাড়িয়া দিয়াছে। 'মহাশয় পলায়ন করুন, মহাশয় পলায়ন করুন! এখানে আর তিলার্ধকাল থাকিলে মারা পড়িবেন। বাপ রে, ধরিল রে, মা রে!"—এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে সে আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া তড়তড় করিয়া লাফে লাফে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। তাহাকে ফিরাইবার জন্য আমি পিছনে পিছনে দৌড়িলাম। কিন্তু ধরিতে-না-ধরিতে সে সদর দরজা খুলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। সেই ভয়াবহ শ্মশানসদৃশ অট্টালিকার ভিতর আমি তখন একা পড়িলাম।

তখন প্রাণে আমার অতিশয় ত্রাস হইল। একবার মনে ভাবিলাম, আমিও পলায়ন করি। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব সকলে যে হাসিবে ও বিদ্রূপ করিবে। যা থাকে কপালে, এই মনে করিয়া পুনরায় আমি উপরে উঠিলাম, পুনরায় আমি নিজের শয়নাগারে প্রবেশ করিলাম। পুনরায় আমি পড়িতে বসিলাম। আমার হাতে পুস্তক,—সম্মুখে বাতি। পুস্তক ও বাতির মধ্যবর্তী স্থানে, আমার কোলে, তালগাছ-প্রমাণ কৃষ্ণবর্ণ একটি মানুষের আকৃতি দাঁড়াইল। তাহার মস্তক ছাদে ঠেকিল। সেই মস্তকে চক্ষু দুইটি জ্বলিতে লাগিল। সর্বশরীর আমার শিহরিয়া উঠিল। পিস্তল লইবার জন্য আমি হাত বাড়াইলাম। হাত অসাড় ও অবশ! হাত উঠিল না। আমি দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলাম। পা অসাড় ও অবশ। পা উঠিল না। চীৎকার করিতে চেষ্টা করিলাম, মুখ দিয়া কথা বাহির

হইল না। জ্ঞান হারাইবার উপক্রম হইল।

কিন্তু তখনও একটা চিন্তাশক্তি আমার মনে ছিল। ভাবিলাম, যদি এখন ভয় করি, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি প্রাণ হারাইব। এইরূপ মনে করিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া ধৈর্য ধরিয়া রহিলাম, বাতি নিবিল না, আগুনের জায়গায় আগুন নিভিল না। তথাপি ঘর অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। আমি ভাবিলাম, যেমন করিয়া হউক, ঘরে আলো রাখিতে হইবে। অন্ধকারে থাকিলে মারা পড়িব।

পুনরায় উঠিতে চেষ্টা করিলাম। এবার উঠিতে পারিলাম। আস্তে আস্তে গিয়া একটি জানালা খুলিয়া দিলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল। অল্প অল্প চাঁদের আলো ঘরে প্রবেশ করিল। সেই আলোকে দেখিলাম যে, তালবৃক্ষপ্রমাণ কৃষ্ণবর্ণের বিকট মূর্তি তখন সম্পূর্ণভাবে ঘরে নাই, কেবল তাহার ছায়াটি একপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পুনরায় গিয়া চৌকিতে বসিলাম। পীত, হরিত, লোহিত—নানা বর্ণের গোলাকার আলোক এক্ষণে ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া ও গড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পর ভূমিকম্প হইলে যেরূপ হয়, ঘর সেইরূপ দুলিতে লাগিল। যে-চৌকির উপর চিঠি দুইখানি রাখিয়াছিলাম, তাহার নিচে হইতে ঠিক জীয়ন্ত মানুষের রক্ত-মাংসের হাতের মতো একখানি স্ত্রীলোকের হাত বাহির হইল। তাড়াতাড়ি আমি সেই হাতখানি ধরিতে গেলাম। খপ্ করিয়া চিঠি দুইখানি লইয়া নিমিষের মধ্যে হাতখানি অদৃশ্য হইয়া গেল।

ইহার পর, একখানি চৌকির উপর একটি যুবতী বসিয়া রহিয়াছে, এইরূপ দেখিলাম। তাহার পর একজন পুরুষ ঘরের ভিতর উপস্থিত হইল। বালকের মূর্তি, বৃদ্ধার মূর্তি, নানা প্রকার আকার ঘরের ভিতর আবির্ভূত হইতে লাগিল ও একে একে বিলীন হইতে লাগিল। তাহা ব্যতীত আরও যে কত ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হইল, সে-সকল আর বর্ণনা করিতে পারি না।

মাঝে মাঝে গলা টিপিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য কে যেন চেষ্টা করিতে লাগিল। আমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য মাঝে মাঝে

ঘাড়ে হাতও আসিতে লাগিল। সাহসে ভর করিয়া আমি বার বার সেই ভৌতিক হাত ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিলাম। সে রাত্রিতে আমি যে কী করিয়া প্রাণে বাঁচিলাম, সে এক আশ্চর্যের ব্যাপার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শেষকথা

উপরে যাহা বর্ণিত হইল, তাহা টম্ সাহেবের বিবরণ। প্রভাত হইলে এই সমুদয় উপদ্রব থামিল। টম্‌সাহেব তখন একপ্রকার নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, সে বাড়ি হইতে কী করিয়া পলাইবেন, এক্ষণে সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কোনোরূপে উঠিয়া কুকুরকে ডাকিলেন। কুকুর তাঁহার নিকটে আসিল না। কাছে গিয়া দেখিলেন যে, কুকুরটির গলদেশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। কুকুর মরিয়া গিয়াছে।

টম্‌সাহেবের চাকর সেইদিন অবধি বায়ুগ্রস্ত হইল। ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া সে অস্ট্রেলিয়া দ্বীপে পলায়ন করিল।

বাড়িওয়ালার নিকট গিয়া টম্‌সাহেব চাবি ফিরাইয়া দিলেন, আর বলিলেন,—"ভূত দেখিতে আর আমার ইচ্ছা নাই। যথেষ্ট হইয়াছে, সাধ বিলক্ষণ মিটিয়াছে।"

বাড়িওয়ালা সকল কথা শুনিয়া বলিলেন,—"মহাশয়! আপনার মত সাহসী পুরুষ পৃথিবীতে অতি বিরল। আপনার যে প্রাণরক্ষা হইয়াছে, তাহাই পরম লাভ।"

তাহার পর চিঠি দুইখানির কথা শুনিয়া তিনি আরও বলিলেন,— "এত দিন ঐ বাড়িতে যে বৃদ্ধা বাস করিতেছিল, পত্র দুইখানি বোধ হয় তাহার স্বামীর। আমার খুড়ামহাশয়ের জীবনকালে সে ব্যক্তি একবার ঐ বাড়ি ভাড়া লইয়াছিল। বৃদ্ধার স্বামী অতিশয় পাষণ্ড ছিল। বৃদ্ধার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে টাকার লোভে সে বধ করিয়াছে, দিনকত এইরূপ জনরব শুনিয়াছিলাম। যাহা হউক, ঐ বৃদ্ধা ব্যতীত সে-বাড়িতে এ

পর্যন্ত আর কেহ বাস করিতে পারে নাই। বৃদ্ধার মৃত্যু ও সে-দিন অকস্মাৎ ঘটিয়াছে। সে-সম্বন্ধে নানা লোক নানা কথা বলিয়া থাকে। সেই অবধি এমন একটি লোক পাই না যে, সাহস করিয়া বাড়ির ভিতর প্রবেশ করে। বাড়িটি দেখিতেছি, আগাগোড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।

টম্‌সাহেব উত্তর করিলেন,—"বাড়িটি আগাগোড়া না ভাঙ্গিয়া একটি কাজ করিলে হয়। যে ঘরে আমরা বদ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম, যে-ঘরে বিকট গন্ধ বাহির হইয়াছিল, কেবল সেই ঘরটি প্রথম ভাঙ্গিয়া দেখিলে হয়।"

বাড়িওয়ালা তাহাই করিলেন। সেই ঘরের মাটির নিচে হইতে নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস বাহির হইল। তাহা কি, সে-কথা বলিবার আর আবশ্যক নাই। বাড়িওয়ালা সেই সব জিনিস পোড়াইয়া ফেলিলেন। সেই দিন হইতে ভূতের উপদ্রব থামিয়া গেল!

গড়গড়ি মহাশয় বলিলেন,—

গল্পটি সমাপ্ত হইবার পূর্বে আমি মুণ্ডের দিকে তাকাইয়াছিলাম। কেমন ধীরে ধীরে তাহার নাসিকা, কর্ণ, মুখ প্রভৃতি বিলীন হইয়া গোলাকার ধারণ করিল! কেমন ধীরে ধীরে উহা রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইল! ফলকথা, এদিকে আমার গল্পটি সমাপ্ত হইল, আর ওদিকে মুণ্ডটিও রক্ত-মুক্তা হইয়া গেল।

এবার আর আমি আগেকার মতো অবাক হইলাম না। আর বেশি তর্ক-বিতর্ক না করিয়া, মালায় তাহার পাশের মুণ্ডটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, —"মহাশয়ের অভিপ্রায় কী? আস্তে আস্তে আমার সহিত যাইবেন, না আপনার কাছেও একটি গল্প করিতে হইবে?"

তৃতীয় মুণ্ড বলিল,—"ডাকিনীর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে যদি ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আর-একটি গল্প কর। নতুবা বাহিরে গিয়া নারিকেলমুখীকে বিবাহ কর।"

কাজেই আমাকে আর-একটি গল্প করিতে হইল।*

---

* গড়গড়ি মহাশয় একে একে মুণ্ডদিগের নিকট গল্প করিতে লাগিলেন। এক-একটি গল্প সমাপ্ত হয়, আর এক-একটি মুণ্ড রক্ত-মুক্তা হইয়া যায়, বার বার সে বিষয়ের উল্লেখ অনাবশ্যক।

ভয়ানক আংটি

প্রথম পরিচ্ছেদ

হারাধনের ধন

কলিকাতার নিকট হাওড়া। হাওড়ার নিকট রাজীবপুর! রাজীব-পুরে পরাণ বাঁড়ুজ্জের বাড়ি। পরাণ বাঁড়ুজ্জের একমাত্র পুত্র—তাহার নাম হারাধন, হারাধন কলেজে পড়েন, ছোকরা বয়স,—নিতান্ত ছোকরা নয়, উনিশ-কুড়ি বৎসরের যুবা।

রাত্রি হইয়াছে। শয্যায় শয়ন করিয়া হারাধন আরব্য উপন্যাস পাঠ করিতেছেন। কমর-উল-জমানের গল্প, যে গল্পে পরীতে এক দেশের রাজকন্যা আনিয়া অন্য দেশের রাজপুত্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিল। হারাধন একমনে একধ্যানে সেই গল্প পড়িতেছিলেন।

নিদ্রায় হারাধনের চক্ষু জুড়িয়া যাইতে লাগিল। সুদীর্ঘ একটি নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া হারাধন পুস্তকখানি বন্ধ করিলেন। পাশ ফিরিয়া হারাধন মনে মনে বলিলেন—'আমার ঐরূপ হয়! পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা যে পরমাসুন্দরী কন্যা, জিন কি পরীতে আনিয়া তাহার সহিত আমার বিবাহ দেয়।'

কন্যাটির কী প্রকার রূপ হইবে, তাহার মুখ, চক্ষু কী প্রকার হইবে, হারাধন সেই বিষয়ে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে একখানি চিত্র তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গেল। চিত্রই-বা কী করিয়া বলি? সৌদামিনীসদৃশ অপূর্ব প্রভাবরাশি সম্পন্ন অলৌকিক রূপলাবণ্যে মণ্ডিত, সহাস্যবদনা-দ্বাদশবর্ষীয়া এক কন্যাকে তিনি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন। সেই স্বর্গীয় রূপরাশি দর্শনে বিমোহিত হইয়া হারাধন অভিভূত নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

নিদ্রাতেও হারাধন অর্ধ-প্রস্ফুটিত-মনোহর-পুষ্পমুকুলসদৃশ সৌন্দর্য-ময়ীকে দর্শন করিলেন। হারাধন স্বপ্ন দেখিলেন যে,—সেই কন্যার বিবাহ দিবার উদ্দেশ্যে তাহার পিতা স্বয়ংবর সভা করিয়াছেন। নানা

দেশ হইতে রাজা মহারাজারা আসিয়া সভায় ঘটের মতো সারি সারি বসিয়া আছেন। মাল্য-চন্দনপূর্ণ পাত্র হাতে লইয়া কন্যা বাহির হইল। অর্জুনের সম্মোহন বাণে প্রপীড়িত কৌরব রথীদের মতো রাজারা কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। ঘোর চীৎকারে মালা প্রার্থনা করিয়া, তাঁহারা আপন আপন গলা বাড়াইয়া দিতে লাগিলেম। হারাধন সভার এক পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। কন্যা অন্য কাহারও প্রতি কটাক্ষপাত না করিয়া, হারাধনের নিকটে আসিয়া, তাঁহারই গলায় মাল্য প্রদান করিল। চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের মতো রাজারাও ক্ষেপিয়া উঠিলেন। কামান, বন্দুক, গোলাগুলি লইয়া তাঁহারা হারাধনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্যে অগ্রসর হইলেন। হারাধন যুদ্ধ করিলেন না, তিনি বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় কেহ কর্ণপাত করিলেন না। মুষল-মুখবিশিষ্ট কদাকার এক রাজা আসিয়া সবলে তাঁহার কান মলিয়া দিল। সেই কানমলার চোটে হারাধনের নিদ্রা-ভঙ্গ হইল।

সমুদয় অলীক স্বপ্নকথা! সমুদয় মিথ্যা। তা বটে! কিন্তু হারাধনের মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। পূর্ণচন্দ্রসদৃশ কন্যার মুখখানি তাঁহার মনে আরও গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া গেল। হারাধন পাগলের মতো হইয়া পড়িলেন। এরূপ কন্যা নিশ্চয় কোনো জায়গায় আছে, ও তাহার সহিত নিশ্চয় আমার পরিণয় হইবে; হারাধনের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া পড়িল। সেই বালিকা ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমি বিবাহ করিব না'—হারাধন মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন।

এই প্রতিজ্ঞায় হারাধন দিনযাপন করিতে লাগিলেন! ক্রমে তিনি এম-এ পাশ করিলেন। তাঁহার পিতা সঙ্গতিপন্ন লোক। চারিদিক হইতে তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। কিন্তু বিবাহ করিতে হারাধন কিছুতেই সম্মত হইলেন না। যে বালিকার কমলনয়ন দুইটি রাত্রিদিন তাঁহার হৃদয়ে জাগিতেছিল, একান্ত মনে তাহার ধ্যানেই তিনি নিমগ্ন রহিলেন।

এক বৎসর গত হইয়া গেল, দুই বৎসর গেল, তিন বৎসর গেল,

তথাপি সেই সোনার প্রতিমার সহিত হারাধনের সাক্ষাৎ হইল না। পথে-ঘাটে সকল স্থানেই, সকল সময়েই তিনি সেই বালিকার অনুসন্ধান করেন। এক জায়গায় কতকগুলি লোক দেখিলেই সতৃষ্ণ-নয়নে তিনি তাহাদের মুখপানে চাহিয়া থাকেন। মনে করেন—এইবার বুঝি আমি তাহার দর্শন পাইব। কিন্তু বৃথা আশা! স্বপ্নদৃষ্ট বালিকার সহিত এখনও তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। হারাধন কিন্তু নিরাশ হইলেন না। একদিন নিশ্চয় তাঁহাকে আমি পাইব—বরং এই আশা তাঁহার মনে দিন দিন বলবতী হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বপ্নদৃষ্ট বালিকা

সে-বৎসর প্লেগের ভয়ে যখন কলিকাতা হইতে লোক পলায়ন করিতেছিল, তখন একদিন জন কয়েক আত্মীয়কে গাড়িতে তুলিয়া দিতে হারাধন হাওড়া স্টেশনে গিয়াছিলেন। স্টেশন জনাকীর্ণ, বড় ভিড়। এক-এক গাড়িতে দ্বিগুণ তিনগুণ আরোহী। অতি কষ্টে আত্মীয়দিগকে গাড়িতে উঠাইয়া হারাধন দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গাড়ি ছাড়িয়া দিল। প্রথমে গাড়ি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল, তাহার পর বেগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। গাড়ি চলিতে চলিতে পশ্চাৎ দিকের একখানি তৃতীয় শ্রেণী হারাধনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। হারাধন দেখিলেন যে, সেই গাড়ির দরজা ধরিয়া এক চতুর্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষের বালিকা বাহিরে ঝুলিতেছে। তাহার অভিভাবকগণ সকলেই গাড়িতে উঠিয়াছেন, বালিকা একেলা কেবল উঠিতে পারিতেছে না। গাড়ির ভিতর হইতে একজন লোক, বোধ হয় পিতা, প্রাণপণে বালিকার হাত ধরিয়া টানিতেছেন। কিন্তু গাড়িতে তিল রাখিবার স্থান নাই, কিছুতেই তিনি তাহাকে গাড়ির ভিতর লইতে পারিতেছেন না।

ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া বালিকা গাড়ির দরজায় ঝুলিতে লাগিল।

আর-একটু এই অবস্থায় থাকিলেই সে রেলের নিচে পড়িয়া কাটা যাইবে। ঈশ্বরের কৃপায় সেই মুহূর্তে সেই কামরাটি হারাধনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহির হইতে বালিকাকে ধরিয়া হারাধন গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতে লাগিলেন। দরজা খোলা ছিল। একবার সুযোগ পাইয়া জোর করিয়া গাড়ির ভিতর তিনি বালিকাকে ঠেলিয়া দিলেন। বালিকার প্রাণ বাঁচিয়া গেল।

এতক্ষণ বালিকার পশ্চাৎ দিক হারাধনের দিকে ছিল, তিনি তাহার মুখ দেখিতে পান নাই। সেই আসন্ন বিপৎকালে কিছু দেখিবার কি ভাবিবার অবকাশও ছিল না। বালিকা যখন কামরার ভিতর প্রবেশ করিল, তখন হারাধন এক লহমার জন্য তাহার মুখখানি দেখিতে পাইলেন। সেই বিকশিত পঙ্কজমুখ, সেই মৃগনয়ন, সেই বিম্বাধর, সেই কৃষ্ণধনুসম ভ্রূযুগল—ফলকথা স্বপ্নদৃষ্ট সেই বালিকাকে আজ চকিতের জন্য দেখিয়া হারাধন স্তম্ভিত হইলেন। শরীর তাঁহার রোমাঞ্চিত ও অবশ হইয়া আসিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গাড়ি চলিয়া গেল।

বালিকা কে, কাহার কন্যা, বাড়ি কোথায়? তাহার তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। জানিবার আর উপায়ও নাই। তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া একবার যদি সেই হৃদয়নিধি তিনি হাতে পাইলেন, আর সেই মুহূর্তেই বিধি তাহা কাড়িয়া লইলেন। এরূপ বাদ-সাধা বিধাতার কি উচিত? মনের খেদে হারাধনের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তবে সেই নিমেষকালের মধ্যে হারাধন একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, বালিকার সিঁথিতে সিন্দুর ছিল না, সুতরাং তাহার বিবাহ হয় নাই। আর সেই ভিড়েও—সেই গোলযোগেও—"গেল রে, বামুনের মেয়েটা গেল রে!" এইরূপ একটা শব্দ শুনিয়াছিলেন। এই দুই বিষয় স্মরণ করিয়া হারাধনের মনে একটু যেন আশার সঞ্চার হইল। তিনি মনে করিলেন 'বিধাতা যখন আমার স্বপ্নটি এতদূর সত্য করিলেন, তখন তাহার শেষভাগটাও তিনি সত্য করিবেন। এই বালিকার সহিত নিশ্চয়

আমার আবার সাক্ষাৎ হইবে, নিশ্চয় ইহার সহিত আমার পরিণয় হইবে।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

খড়্গ-ধারী বীর

এতক্ষণ হারাধন একপ্রকার চেতনাশূন্য হইয়াছিলেন। যখন পুনরায় তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইল, তখন সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় তিনি চমকিয়া উঠিলেন। হাতের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। ডান হাতের চতুর্থ অঙ্গুলিতে এক অঙ্গুরী দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। বালিকা যখন রেলগাড়ির দরজা ধরিয়া কামরার বাহিরে ঝুলিতেছিল, তখন তাহার বাম হস্তের চতুর্থ অঙ্গুলিতে তিনি সেই অঙ্গুরী ক্ষণকালের জন্য দেখিয়াছিলেন। তাহার হাত হইতে আমার হাতে আংটি কী করিয়া আসিল? গোলেমালে তাহার বাম হাতের চতুর্থ অঙ্গুলি হইতে আসিয়া ঠিক আমার ডান হাতের চতুর্থ অঙ্গুলিতে আসিয়া পড়া সম্ভব নহে! তাহার পর, বালিকার অঙ্গুলি অপেক্ষা আমার অঙ্গুলি অনেক স্থূল। তাহার আংটি আমার হাতে কী করিয়া হইল? প্রথম তো অভাবনীয়, এক বালিকাকে নিদ্রাবস্থায় দর্শন করা,—সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। তাহার পর সেই স্বপ্নের বালিকাকে শরীরী-অবস্থায় দর্শন করা,—সে আরও এক আশ্চর্য কাণ্ড। অবশেষে তাহার হাতের আংটি আমার হাতে উড়িয়া আসা,—ইহা অপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় আর কী হইতে পারে? সত্য-সত্য কি এই ব্যাপার কোনো দেব, দানব, ভূত, প্রেত, অথবা জিন পরী দ্বারা সংঘটিত হইতেছে?

হারাধন এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার বুকের ভিতর গুর-গুর করিতে লাগিল। তাঁহার মনে আতঙ্ক হইল। আংটির প্রতি তিনি সাবধানে তাকাইলেন,—দেখিলেন, তাহা সোনার নহে, রূপার নহে, তামার নহে, পারদের নহে, অষ্টধাতুর নহে, কোনোপ্রকার জ্ঞাত-পরিচিত দ্রব্য দ্বারা সে আংটি গঠিত নহে। অপূর্ব অলৌকিক আংটি।

হারাধন আংটির প্রতি আরও সাবধানে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। আশ্চর্য! শুভ্রবর্ণের সামান্য সেই রেখা-প্রায় আংটির ভিতর একজন ভীষণ কৃষ্ণকায় বীর অবিরত তলোয়ার ঘুরাইতেছে, এইরূপ তিনি দেখিতে পাইলেন। ভয়বিহ্বল হইয়া হাত হইতে আংটি খুলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিলেন। অনেক টানাটানি করিয়াও কিছুতেই খুলিতে পারিলেন না। হারাধনের মন নিতান্ত উতলা হইয়া উঠিল। যত মনে করেন, এখন আর আমি আংটির দিকে চাহিয়া দেখিব না, ততই মন সেইদিকে ধাবিত হয়, ঘুরিয়া ফিরিয়া চোখের দৃষ্টি সেই আংটির উপরে গিয়া পড়ে। আংটির দিকে চোখ পড়িলেই তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। হারাধন পাগলের মতো হইলেন। 'হাত হইতে আংটি না খুলিলে হয় পাগল হইয়া যাইব, না হয় মরিয়া যাইব'—তাঁহার মনে এইরূপ ধারণা হইল।

গাড়ি করিয়া দ্রুতবেগে হারাধন গৃহে ফিরিয়া গেলেন। বাড়ি আসিয়া প্রথমে আঙুলে তেল দিয়া আংটি খুলিতে চেষ্টা করিলেন। আংটি কিছুতেই বাহির হইল না। তাহার পর সাবানের জল দিয়া চেষ্টা করিলেন। আংটি একটুও সরিল না, বরং টানাটানিতে আঙুল ফুলিয়া আংটি আরও গভীরভাবে বসিয়া গেল। সুতরাং মানসিক ভয় ব্যতীত এখন শারীরিক যন্ত্রণাও উপস্থিত হইল। 'সহসা একি বিপদে পড়িলাম! এমন বিপদে কেহ তো কখনো পড়ে না।'—হারাধন এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন।

রাত্রি হইল। বালিকার মধুর মুখখানি সর্বদাই তিনি মানসচক্ষে দর্শন করিতে লাগিলেন। অন্য চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পাইল না, সর্বদাই কেবল সেই বালিকার চিন্তা। সে চিন্তায় আনন্দ ছিল বটে, কিন্তু অন্যদিকে আংটির চিন্তায় তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন। আংটির দিকে যখনই চাহিয়া দেখেন, তখনই সেই খড়্গধারী বীরকে তাহার ভিতর দর্শন করেন। 'হায়, আমার একি হইল! যাহাকে তিন বৎসর একমনে ধ্যান করিতেছিলাম, আজ তাহার দর্শন পাইয়া কোথায় আনন্দ-সাগরে ভাসিব, না আমি ভূতুড়ে আংটির জ্বালায় অস্থির হইলাম।'

ভয়ে ও চিন্তায় সে-রাত্রিতে হারাধনের কিছুমাত্র নিদ্রা হইল না। বিছানায় পড়িয়া তিনি ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া তিনি প্রথমে স্যাঁকরার বাড়িতে গেলেন। স্যাঁকরা চিম্‌টা, হাতুড়ি ও নানারকম যন্ত্র দিয়া আংটি খুলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু, কিছুতেই কৃতকার্য হইল না। অবশেষে উকা দিয়া কাটিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু উকা-ঘর্ষণে আংটির গায়ে বিন্দু-মাত্র দাগও পড়িল না। 'এই আংটির তুলনায় হীরা বরং কোমল' স্যাঁকরার সেইরূপ বোধ হইল। আংটি খুলিয়া কি কাটিয়া ফেলিতে স্যাঁকরারাও বিধিমত নানা চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে হারাধন রাসায়নিক পণ্ডিতদের কাছে গেলেন। নানা প্রকার অম্ল বা অ্যাসিড প্রয়োগ করিয়া তাঁহারাও সেই আংটি গলাইতে পারিলেন না। আংটিটি যে কী ধাতু দিয়া গঠিত, তাহাও কোনো বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলিলেন,— 'অ্যালুমিনিয়াম্, প্লাটিনাম প্রভৃতি যত প্রকার নূতন ধাতু বাহির হইয়াছে, আমরা সে-সব দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ অদ্ভুত ধাতু আর কখনো দেখি নাই। সামান্য আংটির ভিতরে কৃষ্ণবর্ণের তলোয়ারধারী বীরও কখনো দেখি নাই।

ফলকথা, হারাধনের আঙুল হইতে কিছুতেই সেই আংটি বাহির হইল না। আংটির জ্বালায় হারাধন ঘোর বিপদে পড়িলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নূতন বীর

কিছুদিন পরে আংটির ভিতর হইতে খড়্গাধারী পুরুষ অন্তর্হিত হইল। মাঝে নানা মূর্তি আংটির ভিতর উদিত হইয়াছিল। এক-একটি মূর্তির ভাব দেখিলে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে ; সারা শরীর শিহরিত হয়। অবশেষে তাহার ভিতর আর একটি আশ্চর্য মূর্তির আবির্ভাব হইল। সেই মূর্তির কতকগুলি মুখ, কতকগুলি হাত, আর ছাগলের মতো ঠ্যাং। উহার নাম

আংটি-বীর ! বিকটাকার আংটি-বীর মনের আনন্দে আংটির ভিতর নৃত্য করিতেছিল। তাহার নৃত্য দেখিয়া হারাধনের মূর্ছা হইল। সেই সময় হইতে মৃগীরোগীর মতো দিনের মধ্যে চার-পাঁচ বার তিনি মূর্ছিত হইতে লাগিলেন। ফলকথা, মনের মতো পত্নীলাভের আশা এখন দূরে গেল, হারাধন সঙ্কটাপন্ন পীড়াগ্রস্ত হইলেন।

হারাধনের পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজন ঘোর উদ্বিগ্ন হইলেন। ডাক্তার বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসা করাইলেন। কিন্তু, কিছুতেই কিছু হইল না। রোজা আনিয়া ঝাড়ান-কাড়ান করাইলেন, ভূত নামাইলেন, দেবতাস্থানে হত্যা দিলেন, হাতে গলায় কোমরে কবচ ও মাদুলি পরাইলেন, গণৎকারের বাড়ি গেলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; হাত হইতে আংটি খসিল না। বহুমুণ্ডধারী ছাগ-পদযুক্ত আংটি-বীরও আংটির ভিতর হইতে অন্তর্হিত হইল না। হারাধনের মূর্ছা দিন দিন ঘনীভূত হইতে লাগিল। হারাধন কৃশ ও দুর্বল হইয়া পড়িলেন। তাহার প্রাণসংশয় হইল। তাঁহার প্রাণের আশা সকলে ছাড়িয়া দিল।

নিরুপায় হইয়া, অবশেষে সকলে হারাধনের আঙুলটি কাটিয়া ফেলিবার পরামর্শ দিলেন। অঙ্গুলিটির মূলচ্ছেদ ভিন্ন আংটি কিছুতেই বাহির হইবে না। আংটি বাহির না লইলে হারাধন বাঁচিবেন না। সুতরাং, ইংরেজ ডাক্তার আনিয়া আঙুল কাটানই স্থির হইল। অজ্ঞান করিয়া আঙুল কাটা হইবে, সেই ভয়ে হারাধন ঘোর ভীত হইলেন। সন্ধ্যার পর হারাধন শয়ন করিলেন। কিন্তু হায় ! আঙুল আর কাটিতে হইল না। সেই রাত্রিতে হারাধনের যে-মূর্ছা হইল, সেই মূর্ছা আর কিছুতেই ভাঙ্গিল না। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শ্বাসরোধ হইয়া গেল। হৃৎপিণ্ডের কার্য বন্ধ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার আনা হইল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন যে, হারাধন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

হারাধনের পিতামাতার ঘোর সর্বনাশ হইল। তাঁহাদের সংসার শ্মশানভূমি হইল। পিতা ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। মাতা বক্ষে করাঘাত করিয়া, মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ডাক্তার বলিলেন বটে যে,হারাধনের মৃত্যু হইয়াছে,

কিন্তু জীবিত শরীরের মতো তাঁহার দেহে তখনও উত্তাপ ছিল। ডাক্তার বলিলেন,—"কোনো কোনো মৃতদেহে এরূপ উত্তাপ থাকে।"—এই কথা বলিয়া ভিজিট লইয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
শ্মশান ভূমি

সেই রাত্রিতেই হারাধনের দেহ শ্মশানভূমিতে লইয়া যাওয়া হইল। চিতা সাজানো হইল, চিতায় আগুন দেওয়া হইল। কিন্তু আগুন কিছুতেই ধরিল না। তিনবার সকলে চেষ্টা করিলেন, তিনবার আগুন নিভিয়া গেল। হারাধনের দেহ শীতলও হইল না। তাঁহাকে লইয়া যাঁহারা শ্মশানে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কোনো কোনো লোকের মনে ঘোর আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

একজন বলিলেন,—"দেখ ভাই! ছোকরা রোগে মরিল না, কোথা হইতে এক আংটি আসিয়া ইহার প্রাণবধ করিল। তাহার পর চিতায় আগুন ধরিল না। মৃতদেহ যেরূপ শীতল হয়, সেরূপ শীতলও হইল না! আর একটি আশ্চর্য বিষয় দেখ, ছোকরার মুখশ্রী কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয় নাই, ঠিক যেন নিদ্রা যাইতেছে! এসব ভৌতিক ব্যাপার! চল ভাই! নিজেদের প্রাণ লইয়া এখন পলায়ন করি।"

এই বলিয়া কেহ কেহ পলাইবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু সেই দলে দুই-তিনজন সাহসী পুরুষ ছিলেন। কাহাকেও তাঁহারা পলাইতে দিলেন না। ভালরূপ উদ্যোগ করিয়া তাঁহারা চিতায় পুনরায় অগ্নিপ্রদান করিলেন। এইবার চিতা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। চিতার অধোদেশে হুহু শব্দে অগ্নিশিখা উত্থিত হইল। সকলেই বুঝিল যে, এইবার সেই সুকুমার যুবার কোমল দেহ অল্পক্ষণের মধ্যেই ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।

কিন্তু সেই সময় আর-একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটিল। সেই সময়, সেই রাত্রিকালে, সেই শ্মশানে, কোথা হইতে এক বালিকা আসিয়া সহসা

উপস্থিত হইল। যৌবন প্রস্ফুটিত প্রায়, পঞ্চদশবর্ষীয়া পরমা রূপবতী এক কন্যা। তাহার রূপের ছটায় সেই অন্ধকার নিশি যেন আলোকিত হইল। ব্যগ্রভাবে সেই বালিকা পাগলিনীর মতো হাত তুলিয়া কী যেন বলিল।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ কেহ-বা ঘোর ভয়ে ভীত হইলেন, কেহ-বা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। হাতজোড় করিয়া একজন বলিলেন,—"মা! তুমি কে তা বল? কী জন্য এই ঘোর রাত্রিকালে এইশ্মশান-ভূমিতে তোমার আগমন হইয়াছে?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিমলা

যে-কন্যাকে হারাধন স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, যাঁহার সহিত তাঁহার হাওড়া স্টেশনে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, যাঁহার হাত হইতে আংটি আসিয়া হারাধনের আঙ্গুলে লাগিয়া গিয়াছিল,—সেই কন্যার নাম বিমলা! তাঁহার পিতার নাম—রমানাথ চট্টোপাধ্যায়, নিবাস শ্রীরামপুরের নিকট এক গ্রামে। কন্যার বিবাহে ইহাঁদের অনেক টাকা খরচ হয়। কিন্তু রমানাথ দরিদ্র। কন্যাদায়ে তাই রমানাথকে বিপন্ন হইতে হয়। কেবল বিমলা নয়, তাঁহার আরও একটি ছোট কন্যা ছিল, তাহার নাম কমলা। অনেক কষ্টে রমানাথ এক জায়গায় বিমলার বিবাহের সম্বন্ধ করিলেন। কিন্তু কী কারণে যেন সেই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে বিমলা দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করিল; যৌবন অঙ্কুরিত হইল। পিতার ঘোর দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। কিছু দিন পরে আর এক জায়গায় সম্বন্ধ স্থির হইল। দৈবক্রমে তাহাও ভাঙ্গিয়া গেল। পুনরায় তৃতীয় স্থানে বিবাহ স্থির হইল। সব ঠিক ঠাক; বিবাহের দিন পর্যন্ত নির্দিষ্ট হইল, কিন্তু বিবাহের পূর্বদিন ভাবী জামাতা বিসূচিকা রোগে হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। বিমলা-বিষয়ে একটি দুর্নাম রটিল।—"ঐ যে অপূর্ব অলোকিক রূপ, উহা ভাল

লক্ষণ নহে, বিধবা হইবার লক্ষণ। গৃহস্থ ঘরে এত রূপ কেন?" ফল-কথা বিমলা বড় অপয়া মেয়ে—চারিদিকে এইরূপ জনরব উঠিল। সেই দিন হইতে পিতা আর কোনস্থানে তাহার বিবাহ স্থির করিতে পারিলেন না। সেই অপয়া কন্যার সহিত কেহই আপনার পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত হইল না।

এই সময়ে বিমলাদের বাড়িতে কোথা হইতে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া অতিথি হইয়াছিলেন। বিমলার পিতা দুঃখী হইলেও সাধুসঙ্গ ভালবাসিতেন, যথাসাধ্য সাধুসন্ন্যাসীর পরিচর্যা করিতেন। সপরিবার শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, তিনি সেই সন্ন্যাসীর সেবা করিলেন। অপরাহ্নে, বিমলার মাতা কন্যার হাত ধরিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ও বলিলেন,—"বাবা, আমার এই কন্যাটির কি কখনো বিবাহ হইবে না?"

বিমলার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন,—"তোমার এ কন্যাটির ভাল ঘরেই বিবাহ হইবে, তবে ফুল ফুটিতে এখনো বিলম্ব আছে। যে-ঘরে বিবাহ হইবে, সে ঘরে তোমাদের কন্যা সহজে পড়ে না। সর্বস্ব বেচিয়া দিলেও সে-সুপাত্র কিছুতেই তোমরা লাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু আমি এই আংটিটি তোমার কন্যাকে দিলাম। বাঁ হাতে সে ইহা ধারণ করিবে। ইহার ভিতর আংটিবীর আছেন। সেই আংটিবীরের প্রসাদে ও তাঁহার তাড়নায় তোমার কন্যা সেই সুপাত্র লাভ করিবেন!" আংটি প্রদান করিয়া সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলেন।

যেদিন বিমলা আংটি ধারণ করিল, সেইদিন হারাধনের মুখশ্রী চিন্তাপথে উদিত হইয়া, তাহার মানসপটে অঙ্কিত হইল। সেই রাত্রিতে সে হারাধনকে পুনরায় স্বপ্নে দেখিল। স্বপ্নে বিমলা দেখিল যে, তাহার বিবাহের জন্য পিতা স্বয়ংবরসভা আয়োজন করিয়াছেন। রাজা-মহারাজারা ঘটের মত সারি সারি বসিয়া আছেন। মাল্য-চন্দন লইয়া যখন সে বাহির হইল, তখন 'আমাকে দাও, আমাকে দাও, বলিয়া একটা চীৎকার পড়িয়া গেল। এক পার্শ্বে মলিনবদনে মানসকল্পিত সেই ব্রাহ্মণযুবক বসিয়াছিলেন। বিমলা তাঁহার গলায় মাল্য প্রদান করিল।

ঘোর কোলাহল উপস্থিত হইল। সেই কোলাহলে বিমলার নিদ্রাভঙ্গ হইল। বলা বাহুল্য যে, ঠিক সেই রাত্রিতে হারাধনও মানস-ক্ষেত্রে বিমলাকে প্রথম দর্শন করিয়াছিলেন ও ঠিক সেইরাত্রিতে তিনিও ঐরূপ স্বয়ংবরসভা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। আংটি-বীর এইরূপে ঘটকালি করিলেন।

বিমলা সেই বরের প্রতীক্ষায় দিন যাপন করিতে লাগিল। বাড়িতে কোনো অপরিচিত লোক আসিলেই সে একমনে তাঁহার কথাবার্তা শ্রবণ করিত। মনে করিত, যাঁহাকে আমি স্বপ্নে দর্শন করিয়াছি, এইবার বুঝি তিনি আসিয়াছেন। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কোন কথা বলিত না। দেখিতে দেখিতে, এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর কাটিয়া গেল। কন্যা বয়স্থা হইল বটে, কিন্তু সেজন্য পিতামাতা উদ্বিগ্ন হইলেন না। কুলীনের ঘরে এরূপ হয়, এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন। সন্ন্যাসীর আশীর্বাদে তাঁহাদের প্রগাঢ়ভক্তি ছিল। কন্যার বর যে আপনি আসিয়া জুটিবে, সে-বিষয়ে তাঁহাদের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কনিষ্ঠা কন্যা কমলার বিবাহের জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মনে করিলেন যে, বিমলার বর আসিলেই একসঙ্গে দুই কন্যার বিবাহ দিব।

গত বৎসর প্লেগের হিড়িক হইবার পূর্বে বিমলার পিতা সপরিবারে কোনো ক্রিয়া উপলক্ষে কলিকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়ি আসিয়াছিলেন। বাড়ি ফিরিবার সময় ষ্টেশনে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। হারাধন বিমলাকে গাড়ির ভিতর ঠেলিয়া দিলেন। গাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া বিমলা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। "কে আমার প্রাণরক্ষা করিল",—তাহা দেখিবার জন্য সেই মুহূর্তে একবার সে স্টেশনের দিকে তাকাইল। নিমেষকালের জন্য দুই জনের চারি চক্ষু এক হইল। কিন্তু গাড়ি তখন বেগে চলিতেছিল। নিমেষের মধ্যে গাড়ি দূরে গিয়া পড়িল। বিমলা আর হারাধনকে দেখিতে পাইল না! বাড়ি ফিরিয়া গিয়া সেই রাত্রিতে বিমলা প্রথমে মুখ ফুটিয়া ছোট ভগিনীকে বলিল,—"কমলা! সন্ন্যাসী যেদিন আংটি দিয়াছিলেন, সেই রাত্রিতে আমি এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম।

মাঝে মাঝে আরও কতবার তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। সন্ন্যাসী যাঁহার কথা বলিয়াছিলেন, সে তিনি। আজ তাঁহাকে আমি হাওড়া স্টেশনে দেখিয়াছিলাম। গাড়ির ভিতর ঠেলিয়া দিয়া তিনিই আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। আর দেখিতেছি, আমার হাতে সেই আংটি নাই। আংটি আমার আঙুলে এত কষা হইয়া গিয়াছিল যে, আপনা-আপনি খুলিয়া পড়া সম্ভব নহে। সন্ন্যাসীর বরে শীঘ্রই বোধ হয়, কোনো একটা ঘটনা ঘটিবে।

কমলা সেই কথা তাহার মাতাকে বলিল। সন্ন্যাসীর বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, এই মনে করিয়া পিতা-মাতা মনে মনে সবিশেষ আনন্দিত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আরশী

এদিকে হারাধন আংটির জ্বালায় অস্থির হইলেন, ওদিকে বিমলা ঘন ঘন তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিতে লাগিল। তাহার চিত্ত বিশেষ চঞ্চল হইল। শীঘ্রই কিছু একটা ঘটিবে, এই চিন্তা রাত্রি-দিন তাহার মনে জাগিতে লাগিল; এইরূপে কিছুদিন গত হইল। একদিন সন্ধ্যার পূর্বে আরশি সম্মুখে রাখিয়া বিমলা চুল বাঁধিতেছিল। সহসা আরশির ভিতর সে নিজের মুখ না দেখিয়া হারাধনের মুখ দেখিতে পাইল। চমকাইয়া পিছন দিকে ও আশেপাশে চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই! বিস্মিত হইয়া পুনরায় আরশির দিকে সে চাহিয়া দেখিল। তাহার ভিতর পুনরায় সে হারাধনের মুখ দেখিতে পাইল। পূর্বে যেরূপ স্বপ্নে দেখিয়াছিল, স্টেশনে শরীরী অবস্থায় তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছিল, এখন সেরূপ নয়। তাঁহার শরীর কৃশ হইয়া গিয়াছে, মুখ মলিন হইয়া গিয়াছে, ভয়ে ও চিন্তায় তাঁহার মুখখানি যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বিমলা আবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু সে ঘরে অন্য কাহাকেও দেখিতে পাইল না। পুনরায় সে আরশির দিকে চাহিয়া দেখিল। এবার

দখিল যে, ঘোর সর্বনাশ ঘটিয়াছে। হারাধনের দেহ বিছানার পড়িয়া রহিয়াছে, পিতা-মাতা মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছেন, পাড়া-প্রতিবাসী আসিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইতেছেন। ভয়ে বিহ্বল হইয়া বিমলা আরশি হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকিতে পারিল না, পুনরায় তাহার দৃষ্টি আর্‌শির উপর আপনাআপনি পড়িল। এবার আরও ভীষণ দৃশ্য তাহার নয়নগোচর হইল। এবার সে দেখিল যে, ঘোর অন্ধকার রজনী, নিকটে গঙ্গা কুল্ কুল্ শব্দে প্রবাহিতা হইতেছেন, চারিদিকে ছিন্ন বস্ত্র, শূন্য কলস, কৃষ্ণবর্ণের কয়লা, শুভ্র-বর্ণের নরমুণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। ভীষণ শ্মশান-ভূমি! হারাধনের দেহ শুভ্র-বর্ণের বস্ত্র দ্বারা আবৃত হইয়া পড়িয়া আছে। চিতা সজ্জিত হইতেছে। ভয়ে বিমলা চক্ষু মুদিত করিল। মন তাহার কাতর হইল। বুক টিপ-টিপ করিতে লাগিল। চক্ষু দিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়িতে লাগিল। "হে সন্ন্যাসী! হে বাবা! অবশেষে তুমি এ কী করিলে?"—এই বলিয়া চক্ষু বুজিয়া বিমলা কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু চক্ষু বুজিয়া অধিকক্ষণ সে থাকিতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে পুনর্বার আর্‌শির দিকে চাহিয়া দেখিল। অশ্রুজলে নয়ন দুইটি ভাসিয়া যাইতেছিল। প্রথম সে কিছুই দেখিতে পাইল না। অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া পুনরায় সে আর্‌শির দিকে দৃষ্টিপাত করিল। এবার তাহার ভিতর বহুমুণ্ডধারী, বহুহস্তসম্পন্ন, ছাগপদবিশিষ্ট, দানবাকৃতি এক মূর্তি সে দর্শন করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পুনর্জীবন

বাহিরে যে-বস্তু থাকে, আর্‌শিতে তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে। সম্মুখে বসিয়া বিমলা চুল বাঁধিতেছিল, আর্‌শিতে তাহারই ছায়া পড়িবার কথা। তাহা না হইয়া আর্‌শির ভিতর নূতন নূতন দৃশ্য আপনা-আপনি আবির্ভূত হইতে লাগিল। প্রথমে হারাধন, তাহার পর শ্মশান, তাহার পর আংটি-বীর; বিমলা যতবার আর্‌শির দিকে তাকাইল, ততবার

নূতন নূতন বিষয় সে দেখিতে পাইল।

বিমলা আর্‌শির ভিতর আংটি-বীরকে দেখিল। আংটি-বীর হাত তুলিয়া তাহাকে যেন বলিল,—'যাও, যাও! শীঘ্র যাও!'

এইরূপ আদেশ পাইয়া বিমলার আর কিছুমাত্র জ্ঞান-চৈতন্য রহিল না। তখন হইতে সে আর আত্মবশে রহিল না। তখন হইতে সে কী করিল, সে-কথা কিছুই সে জানে না। পরে অনেকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছিল। সে বলে,—"আর্‌শির ভিতর আমি আংটি-বীরকে দেখিলাম। দেখিয়া, আমি বড় ভয় পাইলাম। কিন্তু আংটি-বীর অতি ব্যস্তভাবে হাত তুলিয়া—'যাও, যাও, শীঘ্র যাও!'—আমাকে এইরূপ আদেশ করিলেন। তাঁহার কথার শব্দ আমি শুনি নাই, তবে তাঁহার মুখের ভাবে আমি বুঝিলাম যে, তিনি আমাকে এইরূপ আদেশ করিতেছেন। তাহার পর কী হইল, আমি কোথায় গেলাম, কী করিলাম, সে-বিষয় আমি কিছুমাত্র জানি না, আমার কিছুমাত্র মনে নাই।"

আংটি-বীরের আদেশ পাইয়া বিমলা এলোথেলো বেশে পাগলিনীর মতো হইয়া দাঁড়াইল। চুল বাঁধিবার সাজ-সজ্জা ও আর্‌শি সেইখানে পড়িয়া রহিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। রুদ্ধশ্বাসে দ্রুতবেগে সে বাড়ি হইতে বাহির হইল। ঘটনাচক্রে কাহারও সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল না, কেহ তাহাকে নিবারণ করিল না। নিশি-ভূতে মানুষকে রাত্রিকালে ঘর হইতে বাহির করিয়া অজ্ঞান অবস্থায় যেরূপ নানাস্থানে লইয়া যায়, বিমলাকে লইয়া আংটি-বীরও সেইরূপ করিল। অজ্ঞাত অপরিচিত পথে বিমলা দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। অজ্ঞান অবস্থায় পাঁচ-ছয় ক্রোশ পথ চলিয়া অবশেষে ঘোর রাত্রে সেই অপরিচিত শ্মশানভূমিতে আসিয়া সে উপস্থিত হইল। চিতায় যখন সবে মাত্র আগুন ধরিয়াছে, চিতার তলদেশ হইতে যখন অগ্নিশিখা উঠিতেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে বিমলা আসিয়া শ্মশানে উপস্থিত হইল। নিতান্ত উতলা হইয়া, হাত তুলিয়া, বিমলা বলিল,—"রও! অগ্নি শীঘ্র নির্বাণ কর!"

সেই ঘোর নিশীথে, সেই শ্মশানভূমিতে, সহসা চিতার পার্শ্বে এক

রূপবতী যুবতীকে দেখিয়া, সকলেই ভয়ে ভীত হইলেন। কিন্তু পলাইতে কাহারও সাহস হইল না। একজন হাতজোড় করিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, তুমি কে, তা বল।"

নিতান্ত উতলা হইয়া বিমলা বলিল,—"শীঘ্র অগ্নি নির্বাপন কর। চিতা হইতে শীঘ্র ইহাকে বাহির কর ইনি মরেন নাই, ইনি জীবিত আছেন।" এই কথা বলিয়া বিমলা নিজে চিতা হইতে জ্বলন্ত কাঠ লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন আর সকলেও তাড়াতাড়ি আগুন নিভাইয়া ফেলিলেন ও হারাধনের দেহ ভিতর হইতে বাহির করিয়া মাটিতে শায়িত করিলেন। ভাগ্যে অগ্নি তখনও চিতার উপরদিকে যায় নাই। নতুবা হারাধনের দেহ নিশ্চিত কিছু-না-কিছু পুড়িয়া যাইত। যাহা হউক, হারাধনের দেহে অগ্নি স্পর্শ পর্যন্ত করে নাই।

বিমলা ধীরে ধীরে হারাধনের নিকট গিয়া বসিল, ধীরে ধীরে তাঁহার আঙুল হইতে আংটি খুলিয়া লইল। যে আংটি স্বর্ণকার, কর্মকার প্রভৃতি কত লোক কত টানাটানি করিয়াও খুলিতে পারে নাই, আজ বিমলা একটু ছুঁইবামাত্র সেই আংটি খুস্ করিয়া খুলিয়া আসিল। কিন্তু সেই সময় হইতে আংটি যে কোথায় গেল, তাহার কিছু ঠিক নাই। তখন হইতে সে-আংটি আর কেহ দেখে নাই।

বিমলা যেই আংটি খুলিয়া লইল, আর সেই মুহূর্তে হারাধন একটি নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাঁহার হৃৎপিণ্ডের কার্য পুনরায় আরম্ভ হইল। একবার তিনি চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু পুনরায় তৎক্ষণাৎ চক্ষু মুদিত করিলেন। তাঁহার জ্ঞান কিন্তু তখনও হয় নাই। "হারাধন! হারাধন!"—বলিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন না। যাহা হউক, সকলে এখন বুঝিতে পারিলেন যে, হারাধন পুনরায় জীবনলাভ করিয়াছেন।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, যে মুহূর্তে বিমলা হারাধনের আঙুল হইতে আংটি খুলিয়া লইল, সেই মুহূর্তে আংটি তাহার হাত হইতে

অন্তর্হিত হইয়া গেল, আর সেই মুহূর্তে বিমলাও মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। মুখে হাতে জল দিয়া সকলে তাহার চেতনা করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বিমলার কিছুতেই জ্ঞান হইল না। হারাধন ও বিমলা দুই জনেই অচেতন হইয়া পাশাপাশি সেই শ্মশানভূমিতে পড়িয়া রহিলেন। এরূপ অদ্ভুত ঘটনা কেহ কখনো গল্পেও শোনে নাই, চোখে দেখা তো দূরের কথা! সকলেই ঘোরতর বিস্মিত হইলেন। কোথা হইতে সে-রাত্রিতে সেই পরমা সুন্দরী বালিকা আসিয়া এরূপ কাণ্ড করিল, কেহই তাহা জানিতে পারিলেন না। এক্ষণে কি কর্তব্য তাহাও কেহ বুঝিতে পারিলেন না।

অবশেষে দুইজনকেই তাঁহারা খাটিয়া করিয়া হারাধনের বাটি লইয়া গেলেন। তখন প্রাতঃকাল হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই ঘটনা লইয়া ঘোর কোলাহল পড়িয়া গেল। পুত্রকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া, হারাধনের পিতামাতা যারপর নাই আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু তখনও হারাধনের জ্ঞান হয় নাই, তখনও ভয়ের কারণ বিলক্ষণ ছিল। তাই পূর্ণমাত্রায় তাঁহারা আহ্লাদ প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

তৎক্ষণাৎ বড় বড় ডাক্তার আনাইয়া হারাধনের পিতা দুইজনের বিধিমত চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। তিনি সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন, হারাধন ও বিমলার প্রাণরক্ষার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। দুইজনেই নিদারুণ জ্বর-বিকার দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। অজ্ঞান অবস্থায় দুইজনেই প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। সেই প্রলাপের দুই-একটা কথা শুনিয়া, হারাধন ও বিমলার স্বপ্ন-দর্শন প্রভৃতি অদ্ভুত কাহিনীর কতকটা আভাস সকলে পাইলেন। তবে প্রকৃত ঘটনা যে, কী ঘটিয়াছিল, তাহা কেহ বুঝিতে পারিলেন না! বিমলা যে কে, তাহাও কেহ জানিতে পারিলেন না। তখন সে-সকল ভাবনা ভাবিবারও সময় ছিল না। দুইজনেরই পীড়া অতি ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছিল; অনেক সময় তাঁহাদের জীবনের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বয়সের বলে হউক, অথবা চিকিৎসার গুণেই হউক দুই জনেই সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। তবে একুশ দিন পর্যন্ত দুইজনেই

অচৈতন্যভাবে শয্যাগত হইয়া রহিলেন। বাইশ দিনের দিন দুইজনেরই এক সঙ্গে জ্ঞান হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

ফলশ্রুতি

বিমলার জ্ঞান হইলে, সকলে তাহার পরিচয় পাইলেন। হারাধনের পিতা তৎক্ষণাৎ তাহার পিতাকে পত্র লিখিলেন। বিমলার পিতাও কন্যার অনুসন্ধান করিতে আর বাকি রাখেন নাই। আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া রাত্রিদিন তাহাকে খুঁজিতে ছিলেন। মাতা ও ভগিনী কমলা, দিবারাত্র তাহার জন্য কাঁদিতেছিলেন। বিমলার সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তিন জনেই হারাধনের বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিমলার পিতার সহিত হারাধনের পিতার ও বিমলার মাতার সহিত হারাধনের মাতার সাতিশয় সদ্ভাব ও প্রণয় হইল।

বিমলা ও হারাধন ক্রমে সুস্থ ও সবল হইলেন। বিমলা ও হারাধনের গল্প আদ্যোপান্ত ক্রমে সকলেই শুনিলেন। আংটি-বীরের কথা লইয়া অনেক ক্ষেত্রে অনেকরূপ বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। কেহ বলিলেন, সে দেবতা, কেহ বলিলেন সে ভূত। কিন্তু হাঁদাই মোল্লা বলিলেন যে, সে দেবতাও নয়, সে ভূতও নয়, সে এক জাতীয় ইফ্রিট। মাখনতোষ, অর্থাৎ ম্যাকিন্টস নামে একজন ইংরেজের কানে এ-কথা উঠিলে, তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আংটি-বীর একপ্রকার জীব, পিরিনি পর্বতে একবার এইরূপ জীবের কঙ্কাল বাহির হইয়াছিল।

যাহা হউক, বিমলার রূপ, গুণ ও নম্র প্রকৃতি দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। হারাধনের তো কথাই নাই! যে-রত্ন লাভ করিবার জন্য তিনি এত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, যাহার জন্য তাঁহার প্রাণ পর্যন্ত যাইতে বসিয়াছিল, আজ তাহাকে পাইয়া তিনি যে অপার সুখসাগরে নিমগ্ন হইবেন, সে আর বিচিত্র কী? বিমলার মনের ভাবও সেইরূপ। স্বপ্নে সে স্ব-ইচ্ছায় হারাধনকে বরণ করিয়াছিল। এক্ষণে প্রকৃত অবস্থায়

তাঁহাকে দর্শন করিয়া সে আপনার জীবন সার্থক জ্ঞান করিল। এই সময় হারাধনের এক ধনবান বন্ধু কমলার রূপে মুগ্ধ হইলেন। দুই ভগিনীর একদিনে বিবাহ হইবে, তাহার আয়োজন হইতে লাগিল। মনের সুখে, স্নেহের ভরে, যখন দুই ভগিনী গলা-জড়াজড়ি করিয়া কথাবার্তা কহিত, তখন এই পাপময় সংসারে এক অপূর্ব শোভার আবির্ভাব হইত।

শুভদিনে, শুভক্ষণে, শুভকার্য সুসম্পন্ন হইল। বিমলার পিতার অধিক খরচ হইল না, অথচ এক দিনে তিনি দুইটি কন্যার দায় হইতে মুক্ত হইলেন। মনের মতো দুইটি জামাতা পাইয়া বিমলা ও কমলার মা পরম সুখে তাঁহাদিগকে বরণ করিলেন। বিমলা ও কমলার শরীরে যেখানে যাহা ধরিল, বহুমূল্য অলঙ্কারে সমুদয় শরীর বিভূষিত হইল। তাহাদের ঐশ্বর্যের সীমা রহিল না। পরম সুখে তাহারা দিনযাপন করিতে লাগিল।

মুণ্ড মহাশয়! আমি শুনিয়াছি যে, এই গল্পটির বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। কারণ, ইহা সন্ন্যাসী-প্রদত্ত ভৌতিক গল্প। ইহা পাঠ করিলে কি শ্রবণ করিলে, কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণ কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন, অবিবাহিত যুবকগণ রূপবতী ও গুণবতী পত্নীলাভ করেন; অবিবাহিতা কন্যাগণ মনের মতো পতি পাইয়া, নানা ভূষণে ভূষিত হইয়া কাজ করা সাটিনের জ্যাকেট পরিয়া, গরবে গরবিণী হইয়া, ঠুটোর মতো বসিয়া নাটক-নভেল পড়িয়া কালযাপন করিতে থাকেন।

মুণ্ড মহাশয়! ইহা হইতে আর-একটি উপদেশ লাভ করিতে পারা যায়। লোকের মৃত্যু হইলে তৎক্ষণাৎ দাহ করা উচিত নহে। শ্বাসরোধ ও হৃৎপিণ্ডের কার্য বন্ধ হইলেই যে, লোকের মৃত্যু হইয়াছে, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। হারাধনের মতো কখনো কখনো লোক মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া থাকে। পরে তাহাদের পুনরায় চেতন হয়। দেহের কাঠিন্য ও পচনচিহ্নের আরম্ভ, এই দুইটি মৃত্যুর নিশ্চিত লক্ষণ। আমাদের দেশে দেহ ভস্মীভূত হইয়া যায়। হারাধনের মতো ঘটনা ঘটিলে তাহা আর ধরিবার উপায় থাকে না। ভ্রমক্রমে কখনো কখনো

মৃতবৎ জীবন্ত মানুষকে যে ভূমিসাৎ করা হয়, বিলাতের লোক তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়াছেন। সেখানে তবু একদিন দুইদিন পরে কবর দিবার রীতি প্রচলিত আছে। আমাদের এ উষ্ণপ্রধান দেশ, এখানে তত বিলম্ব করিতে পারা যায় না। কিন্তু দ্বাদশ দণ্ড অপেক্ষা করিয়া সংকার করিলে বোধ হয় কোনো ক্ষতি হয় না।

কেন এত নিদয় হইলে

প্রথম অধ্যায়

নটবর দাস

নটবর দাস জাতিতে কায়স্থ, নিবাস কলিকাতা, শৌখীন যুবক, বয়স বাইশ বৎসর। প্রায় এক বৎসর হইল নটবরের পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। পুনরায় বিবাহ করিবেন, দুই-তিন জায়গায় কন্যা দেখিতে গিয়াছিলেন, এখনও মনের মতো স্ত্রীরত্ন লাভ হয় নাই।

নটবর ভাবিলেন যে, পুনরায় সংসার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার পূর্বে একটু আমোদ করিয়া বেড়াই। ফিটফাট পোষাক পরিয়া তাই তিনি খড়দহে ফুলদোল দেখিতে গেলেন। রাত্রি দুইটার সময় নিদ্রার ঘোরে তাঁহার চক্ষু দুইটি আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। সেই সঙ্গে ফুলদোলে তাঁহার অরুচি জন্মিল। কলিকাতায় ফিরিবার জন্য তিনি স্টেশনে আসিলেন। গাড়িতে তিল রাখিবার স্থান নাই, নটবর উঠিতে পারিলেন না।

নটবর মনে করিলেন,—"পাঁচ ক্রোশ পথ বই তো নয়। এমন পূর্ণিমার রাত্রি, এমন দক্ষিণ বায়ু। হাঁটিয়া যাই।"

এইরূপ স্থির করিয়া তিনি বড় রাস্তা ধরিলেন। কিন্তু পথ-চলা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। রাত্রি প্রায় চারিটার সময় বামদিকে একটি প্রশস্ত পথ দেখিয়া তিনি মনে করিলেন যে, সেই রাস্তা দমদম স্টেশনে গিয়াছে। বাকি পথটুকু রেলগাড়িতে

যাইবেন, এইরূপ মনে করিয়া সেই বাঁদিকের পথ ধরিলেন।

কিন্তু অনেকক্ষণ চলিয়াও নটবর দমদমের স্টেশন পাইলেন না। পথ ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। কেবল বন ও বাগান। জনমানবের সহিত সাক্ষাৎ নাই। নটবর বড় বিপদে পড়িলেন। আর পা উঠে না। নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া এক গাছতলায় তিনি বসিয়া পড়িলেন।

গাছতলায় বসিয়া আছেন, এমন সময় দূর হইতে ভাসিয়া আসা সুমধুর নারীকণ্ঠস্বর তাঁহার কানে গেল। কে যেন অতি মধুরস্বরে গান গাহিতেছে। গানে কথাগুলি এইরূপ—

কেন এত নিদয় হইলে ?
অবসান নিশি, অস্ত গেল শশী,
দাসীরে ভুলিয়া নাথ কোথায় রহিলে।

এই পর্যন্ত নটবর শুনিতে পাইলেন। পরক্ষণেই ভয়ানক এক হৃদয়ভেদী চীৎকার হইল। অমানুষিক চীৎকার। সেই নির্জন স্থানে নটবর একাকী। প্রাণে তাঁহার ঘোর আতঙ্ক উপস্থিত হইল দ্রুতবেগে সেখান হইতে তিনি পলায়ন করিলেন। পুনরায় অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া স্টেশন পাইলেন। প্রাতঃকালে কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কলিকাতা আসিলেন বটে; কিন্তু নটবরের মনে মনে সেই গীত, সেই অমানুষিক শব্দ, সর্বদাই জাগিতে লাগিল। "কেন এত নিদয় হইলে,"—এই কথাগুলি যেন তাঁহার জপমন্ত্র হইল। কত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মন হইতে সে কথাগুলি কিছুতেই তিনি দূর করিতে পারিলেন না। নটবরকে যেন পাগল করিয়া তুলিল।

নটবর ভাবিলেন যে,—"কাহার সেই গীত, কাহার চীৎকার, তদন্ত করিয়া মীমাংসা করিতে হইবে। তাহা না করিলে আমি পাগল হইয়া যাইব।"

এইরূপ মনে করিয়া, নটবর তাহার পরদিন শিয়ালদহে গাড়িতে উঠিয়া দমদম গেলেন। দমদম স্টেশনে নামিয়া সেই জায়গার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিছুতেই খুঁজিয়া পাইলেন না, কিন্তু হতাশ হইলেন না। মাঝে মাঝে সর্বদাই তিনি সেই জায়গায় যাইতে

লাগিলেন। সেই নারীকণ্ঠস্বর পুনরায় শুনিবার প্রতীক্ষায় দিবাকালে ও রাত্রিকালে সর্বদাই তিনি সেই অঞ্চলে পথে পথে ঘুরিতে লাগিলেন।

পুনরায় পূর্ণিমা আসিল। সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত নটবর সেই স্থানে ঘুরিতে লাগিলেন। রাত্রি দুই প্রহর হইল। নটবর ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। নিকটে দুইটি বাগান-বাড়ি দেখিতে পাইলেন। একটিতে বড় একখানি দোতালা বাড়ি, অপরটিতে ছোট একখানি একতলা অট্টালিকা আছে। দুই বাগানের মাঝখানে একটি মতিঝিল আছে, ঝিলের উপর এক জায়গায় একটি পুল বা সাঁকো আছে। এ-বাড়ি হইতে ও বাড়ি যাইবার পথ ঐ পুলের উপর দিয়া গিয়াছে। দুইটি বাড়িই খালি পড়িয়া আছে বলিয়া বোধ হইল। একটু বিশ্রাম করিবার জন্য নটবর ছোট বাগানটিতে প্রবেশ করিলেন। চাদরখানি মাথায় দিয়া তাহার বারান্দায় শুইয়া পড়িলেন।

বারান্দা হইতে কিছু দূরে বাগানের সীমায় ইষ্টক-নির্মিত একটি নিচু প্রাচীর ছিল। নটবর দেখিলেন যে, বাহির হইতে প্রাচীরের উপর মুখ বাড়াইয়া কে একজন উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। বাগানের বাহিরে সেই সময় গাড়ির গড় গড় শব্দ হইল। গাড়িখানি বাগান হইতে কিছু দূরে থামিল। অল্পক্ষণ পরেই নটবর দেখিলেন যে, বাগানের ফটক পার হইয়া ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ বৎসরের এক বালিকা দ্রুতবেগে চলিয়া আসিতেছে।

ঘোরতর বিস্ময়াপন্ন হইয়া নটবর বারান্দায় চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলেন। বালিকা হন্ হন্ শব্দে আসিয়া একটি অশোকবৃক্ষের নিকট দাঁড়াইল। তাহার পর বাতাসাপূর্ণ একখানি সরা সেই বৃক্ষতলে রাখিয়া হাতজোড় করিয়া মনে মনে কী বলিতে লাগিল। যে-লোকটা বাহির হইতে উঁকি মারিতেছিল, সেই সময় সে একলম্ফে প্রাচীর পার হইয়া বালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। উজ্জ্বল শাণিত একখানি ছোরা বাহির করিয়া বালিকাকে সে বলিল,—"যদি চীৎকার কর, কি একটি কথা কও, তাহা হইলে এখনি তোমাকে কাটিয়া ফেলিব। শীঘ্র হাতের বালা দুইগাছি খুলিয়া দাও।"

বালিকা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। শাণিত ছোরা দেখাইয়া লোকটা আরও ভয় দেখাইতে লাগিল। নটবর আর থাকিতে পারিলেন না। দৌড়িয়া সেই খানে উপস্থিত হইলেন ও নিজের ছড়ির দিয়া লোকটার হাতে নিদারুণ প্রহার করিলেন। তাহার হাত হইতে ছোরা দূরে গিয়া পড়িল। সহসা সেই খানে অন্য একজন পুরুষ দেখিয়া লোকটা নিমিষের জন্য চমকিত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তাহার পর ছোরাখানি কুড়াইয়া একলম্ফে প্রাচীর পার হইয়া পলায়ন করিল।

ভয়ে বালিকা কাঁপিতেছিল। হাত ধরিয়া নটবর তাহাকে বারান্দার ধারে আনিয়া বসাইলেন। আশ্বাস প্রদান করিয়া নটবর তাহাকে বলিলেন,—"তোমার আর কোনো ভয় নাই। আমি চোর নই, আমি ভদ্রলোক। কী জন্য তুমি এই গভীর রাত্রিতে এই নির্জন স্থানে একাকী আসিয়াছিলে?"

বালিকা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, কোনো কথা কহিল না। কতক সাধ্য সাধনা করিয়া, কতক ভয় প্রদর্শন করিয়া, আস্তে আস্তে নিম্নলিখিত বিবরণটি নটবর সেই বালিকার মুখ হইতে বাহির করিলেন।—

"বালিকার বাড়ি কলিকাতা, পিতার নাম পীতাম্বর বসু। পিতা ব্রহ্মদেশে কাজ করেন। কাজ ছাড়িয়া পিতা দেশে আসিতে পারেন নাই, সেজন্যও বটে, টাকার অভাবের জন্যও বটে, বালিকার আজ পর্যন্ত তিনি বিবাহ দিতে পারেন নাই। সম্প্রতি তিনি দেশে আসিয়াছেন। বালিকার মাতা জীবিত নাই। এক ভগিনী ছিলেন। বালিকা ভগিনীপতির বাড়িতে সেই ভগিনীর নিকট থাকিতেন। আজ দেড় বৎসর সেই ভগিনীও মারা গিয়াছেন। বালিকা বলিল যে, সেই ভগিনীপতি অতি মন্দ লোক। কিন্তু পিতা তাহার সহিত বিবাহ স্থির করিয়াছেন। বালিকা এখন পিসীর নিকট থাকে। যাহাতে এই ভগিনীপতির সহিত বিবাহ না হয়, পিসী সেই চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু, পিতা সে-কথা শুনিতেছেন না। মাঝের-গাঁ নামক এক জায়গা হইতে সম্প্রতি তাঁহাদের বাড়িতে একটি স্ত্রীলোক আসিয়াছিল। তাহার মাথায় একটি ভূত অধিষ্ঠান হয়। পিসীর চেষ্টায় সেই স্ত্রীলোক তাহার

ভূতকে আহ্বান করে। ভূত আসিয়া বলিল যে, রাত্রি দুই প্রহরের সময় একাকী আসিয়া বালিকা যদি এই জায়গায় সিন্নি দেয়, তাহা হইলে ভগিনীপতির হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে, ভাল বর আপনি আসিয়া যাইবে। সেইজন্য সে আজ সিন্নি দিতে আসিয়াছিল। চাকর ও পিসী সঙ্গে আছেন। কিছু দূরে গাড়ী থামাইয়া তাঁহারা সেই গাড়িতে বসিয়া আছেন।

বালিকার রূপ দেখিয়া ও সুমিষ্ট কথা শুনিয়া নটবর খুশী হইয়াছিলেন। মনে মনে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি ইহাকে পাই, তাহা হইলে এ প্রাণ রাখিব, না পাইলে এ প্রাণ বিসর্জন দিব।

আরও সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এমন সময় ফটকের ধারে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া বলিল,—"স্বর্ণ, স্বর্ণ! এখনও হয় নাই ?'

"পিসীমা ডাকিতেছেন,"—এই কথা বলিয়া বালিকা দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। কী করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া, নটবর কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে বলিয়া উঠিলেন,—"ঐ যা! বালিকার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি।"

নটবর দৌড়িয়া বাগান হইতে বাহির হইলেন। গাড়ি তখন ছাড়িয়া দিয়াছে। দ্রুতবেগে গাড়ির পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। কিন্তু অবিলম্বেই শ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেম। গাড়ি চলিয়া গেল।

বালিকার পিতার নাম নটবরের মনে ছিল—পীতাম্বর বসু। কিছুদিন ধরিয়া কলিকাতায় অনেক সন্ধান করিলেন। কিন্তু, তাঁহার সকল অনুসন্ধান বিফল হইল। পীতাম্বর বসুকে তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নর-মুণ্ড

বিশেষরূপে তদন্ত করিবার জন্য আর একদিন নটবর সেই বাগানে গেলেন। এক জন মালীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মালী বাগান খুঁড়িতেছিল। নটবর তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা

কোদালি হাতে করিয়া মালী চুপ করিয়া দাঁড়াইল। একান্ত মনে কান পাতিয়া কী যেন সে শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আপনার মনে সে বিড় বিড় করিয়া বলিল :—

"কেন এত নিদয় হইলে?
অবসান নিশি, অস্ত গেল শশী,
দাসীরে ভুলিয়া নাথ কোথায় রহিলে!"

ঘোরতর বিস্মিত হইয়া নটবর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ও কী বলিতেছ?"

চমকিত ও রাগত হইয়া মালী উত্তর করিল,—"আমি যা বলি না কেন, তোমার সে-কথায় কাজ কি?"

মালীর নিকট হইতেও নটবর সে-বালিকারও কোনো সন্ধান পাইলেন না। নটবর ভাবিলেন,—"এই মালীর মুখে সেই গীত আজ আমি পুনরায় শুনিলাম। ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব আমাকে বাহির করিতে হইবে। কিছুদিনের জন্য এই বাড়িভাড়া লইয়া আমি এখানে বাস করিব। দেখি, কী হয়!"

এইরূপ স্থির করিয়া নটবর মালীকে বাগান-বাড়ির মালিকের নাম ও ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলেন। জানিতে পারিলেন যে, এই দুই খানি বাগান গোকুলবাবুর। গোকুলবাবুর বাড়িতে গিয়া নটবর ছোট বাড়িখানি ভাড়া লইতে চাহিলেন। গোকুলবাবু বলিলেন যে, ও-বাড়ির অখ্যাতি আছে, সকলে বলে যে, ও বাড়িতে ভূত আছে। আমার পুত্রবধূ সম্প্রতি ঐ বাড়িতে মারা পড়িয়াছেন।

নটবর সে-কথায় ভয় পাইলেন না। পুনরায় অতিশয় আগ্রহ সহকারে বাড়িটি প্রার্থনা করিলেন। অবশেষে বিনা ভাড়ায় সে-বাড়িতে বাস করিতে গোকুলবাবু তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন।

সন্ধ্যার সময় নটবর বিছানাপত্র লইয়া ও একজন চাকর সঙ্গে করিয়া সেই বাড়িতে আসিয়া হাজির হইলেন। বাড়িখানিতে চারিটি ঘর ছিল। একটি ঘরে তালা বন্ধ ছিল। তাহাতে গৃহ-স্বামীর টেবিল, চৌকি, খাট প্রভৃতি দ্রব্যাদি ছিল।

আ-একটি প্রশস্ত ঘরের মেজেতে নটবর আপনার বিছানা করিলেন। চাকরকেও এক পাশে তাহার বিছানা করিতে বলিলেন। নিদ্রা হইল না। রাত্রি তুই প্রহর কাটিল। ঘরে খুব গরম বোধ করিয়া নটবর বাহিরে বারান্দায় আসিয়া শয়ন করিলেন। পদতলে বসিয়া চাকর তাঁহার পা টিপিতে লাগিল।

সহসা চাকর বলিয়া উঠিল,—"ও কাহারা? মহাশয়! দেখুন, দেখুন, ও কি।"

তাড়াতাড়ি নটবর উঠিয়া বসিলেন। অশোক বৃক্ষের উত্তরদিকে আস্তাবল অথবা মালীর ঘরের মতো একটু স্থান ছিল। নটবর দেখিলেন যে, তাহার কাছে কালো কাপড়ে ঢাকা তুটি মানুষ একসঙ্গে বেড়াইতেছে, আর আস্তাবলের ভিতর হইতে একটি স্ত্রীলোক উঁকি মারিতেছে। বৃক্ষের ছায়ায় সে-স্থানটি অন্ধকারে আবৃত ছিল, নটবর ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু কৃষ্ণকায় সেই তুইটি মনুষ্যের চক্ষু হইতে গন্ধকের অগ্নির মতো নীলবর্ণের অল্প অল্প অগ্নি-শিখা বাহির হইতেছিল। সেই আলোকে নটবর মানুষ তিনটিকে দেখিতে পাইলেন। আস্তাবল হইতে যে-স্ত্রীলোকটি উঁকি মারিতেছিল, সে ঠিক যেন সেই বালিকার মতো, যে-বালিকার সহিত সেদিন তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অন্তত নটবরের মনে প্রথম তাহাই বোধ হইয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার সেবিশ্বাস দূর হইল। কৃষ্ণকায় তুই ব্যক্তির মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, জীবিত মানুষের মতো তাঁহাদের মুখ নয়। মুখে মাংস কি চর্ম কিছুমাত্র নাই, কেবল অস্থি, শ্মশানঘাটে যেরূপ নরমুণ্ড পড়িয়া থাকে, অনেকটা সেইরূপ কিন্তু অতি ভয়ানক। তাহার পর তাহাদিগের চক্ষুকোটর হইতে যে নীলবর্ণের অগ্নিশিখা বাহির হইতেছিল, তাহাও অতি ভয়ানক।

চাকর ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ভয়ে বাক্‌শক্তিহীন হইয়াছিল, চীৎকার করিতে পারিল না। নটবর নিজেও ঘোরতর ভীত হইলেন বটে, কিন্তু অনেকটা ধৈর্য ধরিয়া রহিলেন। হাত ধরিয়া চাকরকে ঘরের ভিতর আনিয়া তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। নটবর বলিলেন,

—"নিকটে লোকের বাড়ি নাই যে, সেখানে পলাইব। মালী রাত্রিকালে এ বাড়িতে শয়ন করে না যে, তাহার কাছে যাইব। বাতি জ্বালিয়া দুই জনে আয়, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া থাকি; তাহার পর সকাল বেলা পলাইব। ভূতে মানুষ খায় না, ভয় কি? রাম রাম বল্।"

চাকর কাঁদিতে লাগিল। মাঝে মাঝে পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু নটবর তাহার হাত ধরিয়া রহিলেন।

রাত্রি যতই বেশি হইতে লাগিল, উপদ্রবও ততই বাড়িতে লাগিল। প্রথম দরজা-জানালা সব আপনা-আপনি খুলিয়া যাইতে লাগিল, আবার আপনা-আপনি বন্ধ হইতে লাগিল। তাহার পর যে-ঘরে দুই জনে বসিয়া আছেন, সেই ঘরের মেজেতে নরমুণ্ড সব গড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহা দেখিয়াও নটবর ধৈর্য ধরিয়া রহিলেন। তাহার পর যেঘরে তালা বন্ধ ছিল, সেই ঘর হইতে পূর্বের সেই নারীকণ্ঠ-বিনির্গত গীত অতি ধীরে ধীরে বাহির হইতে লাগিল,—

"কেন এত নিদয় হইলে?
অবসান নিশি, অস্ত গেল শশী,
দাসীরে ভুলিয়া নাথ কোথায় রহিলে।"

মধুর বটে, কিন্তু অতি অমানুষিক স্বর। গীতের শেষকথাটি নটবর যেই শুনিতে পাইলেন, আর তাঁহার ঘরের বাতিটি নিবিয়া গেল। সেই মুহূর্তে অতি হৃদয়বিদারক অতি কাতরতাসূচক চীৎকার হইল। নটবর আর ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না। চাকরের হাত ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইলেন, তাহার পর প্রাণপণে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। কলিকাতায় নিজ বাড়িতে আসিয়া তবে তাঁহাদের প্রাণ সুস্থ হইল।

সে-রাত্রি নটবরের নিদ্রা হইল না। সমস্ত রাত্রি সেই অদ্ভুত ঘটনার কথা ভাবিতে লাগিলেন। আস্তাবলের ভিতর ঠিক যেন সেদিনের বালিকাকে আমি আজ রাত্রিতে দেখিয়াছি। তবে সেদিনের সে-বালিকা কি ভূত? সে-চোরও কি ভূত? সে পিসীও কি ভূত? সে-গাড়িও কি ভূত? তবে কি একটা ভূতিনীর উপর আমি আমার প্রাণ

সঁপিয়াছি? না, তাহা কখন হইতে পারে না। সে মানুষী, তাহাকে নিশ্চয় আমি একদিন পাইব।'

পরদিন প্রভাতে সূর্যালোকে নটবরের পুনরায় সাহস বৃদ্ধি হইল। নটবর ভাবিলেন যে, এ বিষয়ের বিশেষ রূপে তদন্ত না করিয়া আমি ক্ষান্ত হইতে পারি না। পুনরায় তিনি সেই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গত রাত্রিতে যে-সব ঘটনা ঘটিয়াছিল, মালীর নিকট তাহা বর্ণন করিলেন।

মালী ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"আমি যখন শুনিলাম যে, আপনি এই বাড়ি ভাড়া লইয়াছিলেন, তখন আপনাকে পাগল মনে করিয়াছিলাম। পূর্বে এইখানে আমি শয়ন করিতাম। যাহা দেখিয়াছি, যাহা শুনিয়াছি, সে-সব কথা আপনাকে আর কী বলিব! সেই কারণে আমি একরূপ পাগল হইয়া গিয়াছি।—'কেন এত নিদয় হইলে,'—সর্বদাই আমার মনে এই কথাগুলি জাগিতেছে। আর কেহ শুনিতে পায় না, অনেক সময়ে দিনের বেলাতেও কাজ করিতে করিতে আমি তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাই, কখনো কখনো সম্মুখে তাঁহাকে দেখিতে পাই, দুই-একটি কথাও তিনি আমাকে বলেন। এখন সেই বেটার গলায় আমি ছুরি দিতে পারি, তবে আমার মনের খেদ যায়।"

নটবর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাহার কণ্ঠস্বর? কে ঐ গীতের আধখানি গাহিয়া নিস্তব্ধ হয়? বেটাই বা কে?"

মালী বলিল,—"আপনি জানেন না? এ-বাড়িতে যে-সব ঘটনা ঘটিয়াছিল, সে-কথা আপনি শুনেন নাই?"

নটবর উত্তর করিলেন,—"সকল কথা দূরে থাকুক, কিছুই আমি শুনি নাই।"

মালী বলিল,—"তবে শুনুন। আমি এখানে আজ প্রায় দশ বৎসর কাজ করিতেছি। যখন প্রথম আমি কাজে নিযুক্ত হই, তখন এই বাড়িতে একজন বাবু সপরিবারে বাস করিতেন। তাঁহার নিকট একজন হিন্দুস্থানী চাকর ছিল ও তাহার স্ত্রী চাকরানী ছিল। বাবুর পাঁচ বৎসর বয়স্ক ছেলের গায়ে অনেকগুলি গহনা ছিল। চাকর ও চাকরানীতে

পরামর্শ করিয়া ছেলেটিকে মারিয়া সেই গহনা চুরি করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারে নাই, দৈবে ছেলেটির প্রাণ বাঁচিয়া গিয়াছিল। তাহার পর পুলিসের তদন্ত হয়। ভয়ে চাকর ও চাকরানী স্ত্রী-পুরুষে, একসঙ্গে আস্তাবলে গলায় দড়ি দিয়া মরে। সেই পর্যন্ত তাহারা ভূত হইয়া আছে। গত রাত্রে আপনি যে কৃষ্ণকায় দুইটি মূর্তি দেখিয়াছিলেন, সে সেই দুই জনের ভূত। আমিও ঐ দুই ভূতকে কতবার দেখিয়াছি। এই দুই ভূতের উপদ্রবে সেই বাবুকেও বাড়ি ছাড়িয়া পলাইতে হইল। তাহার পর এ-বাড়ীতে আর কেহ বাস করিতে পারে না। অবশেষে আমার মনিব, গোকুলবাবু, বাড়িটি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র নবীনবাবু ভাঙ্গিতে দিলেন না। তিনি যেমন সাহসী ও ডান্‌পিটে, তেমনি মন্দ লোক। কিরূপ মন্দলোক, সে-কথা আর আপনাকে কী বলিব। তিনি বলিলেন, —'দেখি কেমন ভূত! আমি নিজে এই বাড়িতে বাস করিব।' বাপ অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু তিনি শুনিলেন না। সপরিবারে তিনি এই বাড়িতে আসিলেন। তাঁহার স্ত্রী, একটি ছোট শালী, একজন চাকর ও একজন ঝি। স্ত্রী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, যেমন রূপ, তেমনি গুণ। আমি তাঁহাকে মা-লক্ষ্মী বলিয়া ডাকিতাম। আমাকে কত যে তিনি স্নেহ করিতেন, সে-কথা মহাশয়কে আর কী বলিব। স্বামী মন্দ, তথাপি তাঁহার প্রতি মা-লক্ষ্মীর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। উপদেবতার নানারূপ উপদ্রব দেখিয়া দুই-চারি দিন পরেই চাকর-চাকরানী পলাইয়া গেল। এই বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় কলিকাতা যাইতে মা-লক্ষ্মী নবীন-বাবুর নিকট কত মিনতি করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনিলেন না। বাবুর আর ভয় কি? কলিকাতায় কোনোখানে তিনি রাত্রিযাপন করিতেন, কোনোদিন এই বাড়িতে আসিতেন, কোনোদিন আসিতেন না। যেদিন আসিতেন, সেদিন রাত্রি প্রায় অবসান করিয়া আসিতেন। বাড়ি আসিয়া নেশার ঘোরে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। সে অবস্থায় ভূতে আর তাঁহার কী করিতে পারে? চাকর-চাকরানী পলাইয়া গেল। মা-লক্ষ্মী ও তাঁহার ভগিনী ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন।

এ-বাড়িতে কী করিয়া রাত্রিকালে একেলা থাকিবেন? আমি বলিলাম, —'মা! তোমাদের কোনো ভয় নাই। আমি তোমাদিগকে কিছুতেই ছাড়িব না। রাত্রিতে তোমাদিগকে চৌকি দিয়া থাকিব। প্রতিদিন আমি বারান্দায় শুইতে লাগিলাম। ভূতের উপদ্রবের বিরাম নাই। কিন্তু মা-লক্ষ্মী, তাঁহার ভগিনী ও আমি তিনজনে একসঙ্গে বসিয়া কোনোরূপে রাত্রি কাটাইতাম। যেদিন বাবু আসিতেন, সেদিন অনেকটা ভরসা হইত। দুই-চারি দিন পরে পূর্ণিমার রাত্রি আসিল। আমি বারান্দায় শুইয়া আছি। স্বামীর প্রতীক্ষায় মা-লক্ষ্মী বসিয়া রহিলেন। সেই ঘরের একপাশে তাঁহার ভগিনী শয়ন করিল। ঘরে ছোট একটি ইংরেজী বাজনা ছিল, আস্তে আস্তে সেই বাজনা টিপিয়া মা-লক্ষ্মী গুন্ গুন্ শব্দে এই গীতটি গাহিতে লাগিলেন—

'কেন এত নিদয় হইলে?
অবসান নিশি, অস্ত গেল শশী,
দাসীরে ভুলিয়া নাথ কোথায় রহিলে।'

এইটুকু গাহিয়াই মা-লক্ষ্মী ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। যেরূপ চীৎকার কাল রাত্রিতে আপনি শুনিয়াছিলেন। সেই মুহূর্তে ঘরের ভিতর হইতে একটি পুরুষমানুষ তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। সে-লোক কখন ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা আমি দেখি নাই। কিন্তু যখন সে বাহির হইয়া যায়, জ্যোৎস্নার আলোকে তাহাকে আমি তখন চিনিতে পারিলাম। চীৎকার শুনিয়া তাড়াতাড়ি আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। গিয়া দেখিলাম যে, মা বিছানায় পড়িয়া আছেন, তাঁহার গলার আধখানি কে কাটিয়া দিয়াছে, ঘর রক্তগঙ্গা হইয়াছে। মা তখনও জীবিত আছেন। ভগিনীকে ও আমাকে লক্ষ্য করিয়া মা বলিলেন,—"আমার কপালে যাহা ছিল, তাহা ঘটিল। তোমরা দুই জনে আমার নিকট সত্য কর যে, আমাকে কে মারিয়াছে, সে-কথা তোমরা প্রকাশ করিবে না।" এত কাকুতি-মিনতি করিয়া মা আমাদিগকে বলিলেন যে, আমরা থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার পায়ে হাত দিয়া দুই জনেই আমরা সত্য করিলাম। এখনও মা মাঝে

মাঝে আমার সম্মুখে আসিয়া সেই সত্য পালন করিতে আদেশ করেন। তাই! তাহা না হইলে, কোন্ কালে বেটাকে মারিয়া আমি ফাঁসি যাইতাম।”

নটবর জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তাহার পর?”

মালী বলিল,—“তাহার পর আর বড় কিছু নয়। গোকুলবাবুর অনেক টাকা খরচ হইয়া গেল। মা-লক্ষ্মী আপনার গলায় আপনি ছুরি দিয়াছেন, এইরূপ প্রমাণ হইল। কিন্তু তিনি আত্মহত্যা করেন নাই। আপনার যদি সাহস হয়, তাহা হইলে পূর্ণিমার রাত্রিতে পুনরায় আসিবেন। সেদিন আরও কিছু দেখিতে পাইবেন। কোনো ভয় নাই, মা-লক্ষ্মীকে আবার ভয় কি? ঐ দুইটা পাষণ্ড ভূতকেই যা ভয়।”

তৃতীয় অধ্যায়
মতি ঝিল

পূর্ণিমার রাত্রিতে পুনরায় আসিতে নটবর প্রতিশ্রুত হইলেন। পূর্ণিমা আসিল। সন্ধ্যাবেলা নটবর সেই বাগানে আসিয়া দেখিলেন যে, মালী তখন সেখানে নাই। অন্য একটি বাগানে আর কয়েক জন মালীর সহিত তাহার বাসা। তাহার অনুসন্ধানে নটবর সেইখানে গেলেন। মালীকে দেখিয়া নটবর বলিলেন,—“ভূতের বাড়ির কাছে যে বড় বাড়িটি আছে, তাহাতে দেখিলাম আলো জ্বলিতেছে। সে-বাড়িতে কেহ আসিয়াছে?”

মালী বলিল,—“হাঁ। গোকুলবাবুর বেহাই, সেই মা-লক্ষ্মীর পিতা, দুই-চারি দিনের জন্য সপরিবারে ঐ বাড়িতে আসিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী নাই, কেবল এক কন্যা; আমার মা-লক্ষ্মীর সেই ভগিনী। আর কে কে আসিয়াছে, তাহা জানি না। গোকুলবাবুর পুত্র, সেই হতভাগা নবীনকেও আজ ঐ বাড়িতে দেখিয়াছি।”

রাত্রি যখন দুই প্রহর হইল, তখন নটবর ও মালী আস্তে আস্তে সেই ভূতের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে-ঘরে তালা বন্ধ

ছিল. নিঃশব্দে দুইজনে তাহার পাশে বারান্দায় দাঁড়াইলেন। ঘরের একটি জানালা খোলা ছিল। কিন্তু ঘরটি তখন অন্ধকারে পূর্ণ ছিল। দুইজনে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সহসা সেই ঘরের ভিতর নীলবর্ণের আলোক জ্বলিয়া উঠিল। মালী ইঙ্গিত করিয়া দেখাইল। নটবর দেখিলেন যে, ঘরের ভিতর টেবিলের পাশে পরমা সুন্দরী এক যুবতী একখানি চৌকিতে বসিয়া আছেন। তাঁহার পশ্চাতে সেই চাকর-চাকরানীর কৃষ্ণকায় ভূত দুইটি দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের চক্ষু-কোটর হইতে নীলবর্ণের অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে। টেবিলের উপর বাক্সর মতো ছোট একটি ইংরেজী বাদ্যযন্ত্র রহিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে যুবতী সেই বাদ্যযন্ত্রটির স্থানে স্থানে টিপিতে লাগিলেন। তাহা হইতে সুমধুর শব্দ নির্গত হইল। সেই সুরে যুবতী সেই গীতটি আরম্ভ করিলেন—

'কেন এত নিদয় হইলে?
অবসান নিশি, অস্ত গেল শশী,
দাসীরে ভুলিয়া নাথ কোথায় রহিলে।'

এই কয়টি কথা ধীরে ধীরে সুমধুর স্বরে গাহিয়াই যুবতী ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ঘরের ভিতর সেই নীলবর্ণের আলো নিভিয়া গেল। সেই হৃদয়বিদারক কাতর শব্দ শুনিয়া নটবর ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। পা দুইটি তাঁহার থর থর কাঁপিতে লাগিল। সেই সময় আর একটি যুবাপুরুষের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। বারান্দার নিচে গাছে ঠেস দিয়া লোকটি দাঁড়াইয়া আছে। সেও ভয়ে কাঁপিতেছে। সেই মুহূর্তে মালীর দৃষ্টিও তাহার উপর পড়িল।

"নরাধম পাপিষ্ঠ পশু! স্বামী হইয়া এরূপ পতিব্রতা স্ত্রীর গলায় তুই ছুরি মারিয়াছিস! মায়ের কাছে সত্য করিয়াছিলাম বলিয়া, তুই সে-সময় ফাঁসী হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিস। কিন্তু আজ তোকে যমে টানিয়া এখানে আনিয়াছে। আজ তোকে মারিয়া আমি ফাঁসী যাইব।" এইরূপ বলিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া মালী সেই লোকটির প্রতি ধাবিত হইল। বড় বাড়ির দিকে লোকটি দ্রুতবেগে পলাইতে লাগিল। মালীও

তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল। দুই বাড়ির মধ্যস্থিত সেই মতিঝিলের উপর যে-পুল ছিল, লোকটি তাহার উপর উপস্থিত হইয়া সবলে পড়িয়া গেল। পুলের মাঝখানে পড়িল না, পাশে কাঠের তৈয়ারি রেলের গায়ে পড়িল। তাহার ভারে রেল ভাঙ্গিয়া গেল। রেল ভাঙ্গিয়া লোকটি ঝিলের জলে পড়িল। ঝিলটি অপ্রশস্ত বটে, কিন্তু উহাতে জল বিলক্ষণ গভীর ছিল। লোকটি ডুবিয়া গেল। মুহূর্তের মধ্যে তাহার মাথাটি একবার ভাসিয়া উঠিল। মাথা তুলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে লোকটি মালীকে বলিল,—"জগু! আমি সাঁতার জানি না। আমার প্রাণ রক্ষা কর। তোকে অনেক টাকা দিব।"

এই কথা বলিতে-না-বলিতে লোকটি পুনরায় ডুবিয়া গেল। তাহার প্রাণরক্ষা করিতে জগু জলে ঝাঁপ দিল না। দুই হাত আপনার বুকে রাখিয়া জলের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া পুলের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। নটবরও দৌড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তিনি সাঁতার জানেন না। তিনি জলে ঝাঁপ দিতে পারিলেন না। জগুকে তিনি অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন, জগু কিছুতেই জলে পড়িল না।

হাবুডুবু খাইয়া লোকটির মাথা আর-একবার উপরে উঠিল। আর-একবার অতি কাতরস্বরে জগুর নিকট সে প্রাণভিক্ষা চাহিল। জগু আগের মতোই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। লোকটি পুনরায় ডুবিয়া গেল। এমন সময় জগুর ঠিক সম্মুখে জ্যোৎস্না কিঞ্চিৎ গাঢ় হইয়া যেন জ্যোৎস্না-নির্মিত কিরূপ একটি মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। জগু একদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল, আর একান্তমনে যেন সে কী শুনিতে লাগিল। নটবর জ্যোৎস্না-নির্মিত সেই মূর্তিটি দেখিতে পাইলেন বটে, কিন্তু কোনো কথা শুনিতে পাইলেন না। একান্তমনে মালী কী যেন শুনিয়া উত্তর করিল,—"আচ্ছা, মা! তুমি যখন বলিতেছ, তখন তোমার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য। তোমার পতি হইবার উপযুক্ত ও পাপিষ্ঠ নহে। যাহা হউক, তোমার আজ্ঞায় নরাধমের আমি প্রাণরক্ষা করিতেছি।"

এই বলিয়া মালী তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিল। সেই সময় তৃতীয় বার লোকটির মাথা জলের উপর উঠিয়াছিল। জগু তাহার চুল ধরিয়া

ফেলিল।, কিন্তু লোকটি দুই হাত দিয়া মালীকে জড়াইয়া ধরিল। মালী বলিল,—"পাপিষ্ঠ! যদি আমাকে এরূপ জড়াইয়া ধরিবি, তবে কী করিয়া আমি তোর প্রাণরক্ষা করিব?"

নটবরের কানে মালীর কেবল এ-কয়টি কথা প্রবেশ করিল। তাহার পর তিনি দেখিলেন যে, মালী ও সেই লোকটি জড়াজড়ি করিয়া দুইজনেই ডুবিয়া গেল। চীৎকার করিতে করিতে নটবর পুল হইতে নামিয়া ঝিলের কিনারায় গিয়া দাঁড়াইলেন। সাঁতাব জনেন না, সেজন্য নটবর জলে ঝাঁপ দিতে সাহস করিলেন না। মনে করিলেন যে, যদি কোনো প্রকারে কিনারার গোড়ায় আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে ধরিয়া তুলিবেন। কিন্তু নিকটে কেহই আসিল না। দুইজনেই জলমগ্ন হইয়া গেল। একবাবও তাহারা আর উপরে উঠিল না।

চতুর্থ অধ্যায়

মিলন

নটবব ক্রমাগত চীৎকাব কবিতে লাগিলেন। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া বড় বাড়ির মেয়ে-পুরুষ চাকরবাকব সকলেই দৌড়িয়া আসিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই জলে নামিতে সাহস করিল না। ক্রমে দূব হইতে অপর লোকও আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা জলে নামিয়া দুইজনকেই সেই রাত্রিতে তুলিল। কিন্তু দুইটিই মৃতদেহ; অনেকক্ষণ পূর্বে দুইজনেরই প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, যাহাকে মালী তাড়া করিয়াছিল ও যাহাকে বাঁচাইতে সে জলে ঝাঁপ দিয়াছিল, সে লোকটি আব কেহ নয়, বাগানবাড়ির মালিক গোকুলবাবুর পুত্র নবীন,—মা-লক্ষ্মীর স্বামী। কলিকাতায় থাকিতে কী হইয়াছিল, সেইজন্য সে গলায় ছুরি মারিয়া স্ত্রীকে বধ করিয়াছিল, আর সেই কু-অভিপ্রায় সাধনের জন্য সে স্ত্রীকে এই নির্জন বাগানবাড়ীতে আনিয়াছিল।

এই বিপত্তির সময় নটবর ভিড়ের মধ্যে এক ব্যক্তিকে দেখিয়া যেন

স্বর্ণ হাতে পাইলেন। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া বড় বাড়ি হইতে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই দৌড়িয়া আসিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে তাঁহার হৃদয়ধন সেই বালিকাকে তিনি দেখিতে পাইলেন,—সেই স্বর্ণ, চোরের হাত হইতে যাহাকে তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। স্বর্ণ আর কেহ নহেন, মা-লক্ষ্মীর ভগিনী। পূর্ব কথা স্মরণ করিয়া, নেশায় উন্মত্ত হইয়া, নবীন যখন তাহার ভাগনীর গলায় ছুরি মারে, স্বর্ণ তখন সেই ঘরে ছিল, স্বর্ণ তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিল। ব্রহ্মদেশ হইতে পিতা আসিয়া নবীনের সহিত তাহার বিবাহ স্থির করিলেন। সে-নরাধমকে কি করিয়া স্বর্ণ বিবাহ করে? মৃত্যুকালে ভগিনীর পায়ে হাত দিয়া স্বর্ণ দিব্য করিয়াছিল; সেজন্য পিতার কাছে সকল কথা সে খুলিয়া বলিতে পারে নাই। মাঝের-গাঁর সেই মেয়ে-মানুষটি ভিতরের সকল সন্ধান লইয়া তাহাদের বাড়িতে আসিয়াছিল। "তোমার ভগিনী উপদেবতা হইয়া বাগান-বাড়িতে আছেন। সিন্নি দিয়া হাতজোড় করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, তাহা হইলে তুমি নবীনের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে।"—মাঝের-গাঁর মেয়েমানুষটি এই কথা বলিয়াছিল। তাহার পর সে চোর পাঠাইয়া দিয়াছিল। প্রাণের দায়ে অসীম সাহসে ভর করিয়া স্বর্ণ সেই রাত্রিতে ভূতের বাড়িতে পূজা দিতে আসিয়াছিল।

আর অধিক বলিবার কিছু নাই। কিছুদিন পরে পীতাম্বর বসু পরম আনন্দে নটবরের হাতে স্বর্ণকে সমর্পণ করিলেন। পরম আনন্দে নটবরের মাতা নববধূকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। স্বর্ণ হেন স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়া নটবর সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। নটবর বলেন —"ভূতের কৃপায় আমি মনের মতো পত্নী লাভ করিয়াছি। ইংরেজী খাঁ-বাবুদিগের সুমতি হউক; ভূতের প্রতি তাঁহাদিগের ভক্তি হউক, এই আমার প্রার্থনা।"

বেতাল ষড়বিংশতি

প্রথম অধ্যায়

স্কুলের মাষ্টার।

নূতন-পাড়া নামক একখানি গ্রাম আছে। সেই গ্রামে একটি স্কুল আছে। গৌরীশঙ্কর নামক এক ব্রাহ্মণ যুবক সেই স্কুলে মাষ্টারি করেন। তাঁহার বেতন কুড়ি টাকা। কুড়ি টাকা বেতনে কেহ বড় মানুষ হইতে পারে না; কিন্তু বড় মানুষ হইতে গৌরীশঙ্করের বড় সাধ। কাহার বা সাধ নয়? কি করিয়া রাতারাতি অর্থবান্ হইতে পারা যায়, গৌরীশঙ্কর সর্বদাই সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাতারাতি বড়-মানুষ হইবার উপায় পৃথিবীতে বড় অধিক নাই,—একেবারে নাই বলিলেও চলে। কিন্তু গৌরীশঙ্কর সুবুদ্ধি লোক, সহজেই সে উপায় তিনি বাহির করিলেন।

গৌরীশঙ্কর শুনিলেন যে, শ্মশানে গিয়া শব-সাধন করিতে পারিলে দেবীর বরে যাহা ইচ্ছা তাহাই লাভ করিতে পারা যায়। "একটা মড়ার উপর বসিয়া, কিছুক্ষণ জপ করা বই তো নয়। কেনই বা তা না পারিব?"

গৌরীশঙ্কর সাহসী পুরুষ ছিলেন, এ কার্য্যে তিনি ব্রতী হইলেন। কি করিয়া এ কাজ করিতে হয়, সেই দিন হইতে তিনি সে তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। গুরুগিরিতে তাঁহার বড় বিশ্বাস ছিল না। তিনি দীক্ষিত হন নাই। কিন্তু মাথায় একটি টিকি রাখিয়াছিলেন।

যাহা হউক, গৌরীশঙ্কর শব-সাধনের চেষ্টায় রহিলেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে শব-সাধনের নিমিত্ত তিনি একটি মন্ত্র পাইলেন। আর এক জনের নিকট তিনি ইহার প্রকরণও কিছু কিছু জানিয়া লইলেন। গুরু তাঁহার ছিল না, এ কার্য্যে উত্তর-সাধক হয়, এমন এক জন লোকও তিনি পাইলেন না। উত্তর-সাধকের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টাও করেন

নাই। কারণ, রাতারাতি বড় মানুষ হইতে হইলে, সে কাজটা গোপনে হইলেই ভাল হয় ; ভাগিদার করা উচিত নয়।

মন্ত্রের যোগাড় হইল, প্রকরণ ঠিক হইল। এখন চাই মড়া। মড়া না হইলে শব-সাধন হয় না। যেমন তেমন মড়ায় এ কাজ হয় না। গৌরীশঙ্কর অনেক দিন ধরিয়া, উপযুক্ত শবের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে কিছুদিন পরে তাঁহাদের গ্রামে সর্পাঘাতে এক জন চণ্ডালের মৃত্যু হইল।

গৌরীশঙ্কর সেই চণ্ডালের আত্মীয়গণকে বলিলেন,—"সর্পদংশনে লোকের প্রকৃত মৃত্যু হয় না। একপ্রকার অজ্ঞান হইয়া থাকে। ভাল রোজার হাতে পড়িলে পুনরায় জীবিত হইতে পারে। গঙ্গার ধারে হইলে, মৃতদেহ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করাই উচিত। এ স্থানে গঙ্গা নাই। শ্মশানে লইয়া বাঁশের একটি উচ্চ মাচা নির্মাণ করিয়া, তাহার উপর ইহাকে সাত দিন রাখিয়া দাও। ইহার যদি আয়ু থাকে, তাহা হইলে এই সাত দিনের মধ্যে কোন না কোন স্থান হইতে রোজা আসিয়া ইহার প্রাণদান করিবে। কত স্থানে এরূপ কত ঘটনা হইয়া গিয়াছে।"

বিন্দু মাত্র আশা থাকিতে কে আর প্রিয়জনকে পরিত্যাগ করে? চণ্ডালেরা তাঁহার কথায় সম্মত হইল। নূতনপাড়ার বাহিরে মাঠের মাঝখানে যে একটি পুরাতন পুষ্করিণী আছে, সেই পুষ্করিণীর ধারে এ স্থানের লোকে শব দাহ করে। বাঁশের মাচা না করিয়া, চণ্ডালেরা সেই পুষ্করিণীর ধারে একটি বটগাছের উপর আত্মীয়ের মৃতদেহ বাঁধিয়া রাখিল।

গৌরীশঙ্কর বাবুর আনন্দের আর সীমা রহিল না। কারণ, একে চণ্ডালের মড়া, তাহার উপর আবার সর্পাঘাতে মৃত্যু,—শব-সাধনের পক্ষে দুর্লভ সামগ্রী। শাস্ত্রের বচনটা বোধ হয় তিনি শুনিয়াছিলেন, যথা ;—

যষ্টিবিদ্ধং শূলবিদ্ধং খড়্গবিদ্ধং পয়োমৃতং।
রজ্জুবদ্ধং সর্পদষ্টং চাণ্ডালং বাতিভূতিকং॥
তরুণং সুন্দরং শূদ্রং রণে নষ্টং সমুজ্জ্বলং।

পলায়নবিশূন্যঞ্চ সংমুখে রণবর্ত্তিনং ॥

গৌরীশঙ্কর বাবুর কপালে আর একটি সুবিধা হইল। চণ্ডালের মৃত্যুর তিন দিন পরেই শনিবার অমাবস্যা পড়িল। নানারূপ শুভ লক্ষণ দেখিয়া তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"বিপুল ধনসম্পত্তির অধিস্বামী এইবার নিশ্চয় হইব।" ধনবান হইয়া কোথায় কাহার কন্যাকে বিবাহ করিবেন, কোন্ স্থানে রাজভবনসদৃশ অট্টালিকা নির্মাণ করিবেন, কিরূপ জমীদারী ক্রয় করিবেন, কি উপায় অবলম্বনে মহারাজা উপাধি লাভ করিবেন, এখন এই সমুদয় কথা তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিশ হইয়াছিল; কিন্তু নিম্নশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া, টাকা অভাবে এখনও তাঁহার বিবাহ হয় নাই। সংসারে বৃদ্ধা মাতা ব্যতীত আর কেহ ছিল না। মুখে প্রকাশ না করুন, কিন্তু মনে মনে বিবাহের জন্য গৌরীশঙ্কর বিশেষ লালায়িত ছিলেন। পুত্রবধূ লইয়া ঘর করিতে তাঁহার মা তারও যে একান্ত বাসনা ছিল, সে কথা আর বলা বাহুল্য। এক্ষণে সেই সমুদয় বাসনা পূর্ণ হইবে। চণ্ডালের মড়া পাইয়া, সম্মুখে শনিবার অমাবস্যা পাইয়া, গৌরীশঙ্কর বাবু আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

শুভদিন আসিয়া উপস্থিত হইল। মদ্য, মৎস্য, মাংস, গুড়, পিষ্টক, পরমান্ন, তিল, কুশ, সর্ষপ, দীপ, এলাচি, কর্পূর, খয়ের, পান, আদা, পাটের দড়ি, প্রভৃতি নানারূপ কুলাচার-দ্রব্য তিনি আহরণ করিলেন। রাত্রি এক প্রহরের সময় পূজার উপকরণ লইয়া, গৌরীশঙ্কর একাকী শ্মশান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গ্রাম হইতে প্রায় আধ ক্রোশ, মাঠের মাঝখানে, জনশূন্য সেই শ্মশানক্ষেত্র। সে কালে এই পুষ্করিণীর ধারে দুষ্ট দস্যুগণ পথিকগণকে মারিয়া ফেলিত। এখনও দিনের বেলা এ স্থানে যাইতে ভয় হয়। ঘোর তিমিরাবৃত অমাবস্যা নিশার তো কথাই নাই! কিন্তু গৌরীশঙ্করের মনে বিন্দুমাত্র ভয়ের উদয় হইল না। নির্ভয় চিত্তে একাকী তিনি গমন করিতে লাগিলেন। যদি লোভবশতঃ অজ্ঞানতা-সহকারে এ কার্য্য তিনি না করিতেন, তাহা হইলে বলিতাম, —"ধন্য গৌরীশঙ্কর! তোমার সাহসকে ধন্য: তুমি বীরপুরুষ বটে!

বীর সাধনে মন্ত্রসিদ্ধ হইবার নিমিত্ত তুমি উপযুক্ত পাত্র বটে। কিন্তু তোমার অজ্ঞানতার জন্য দুঃখ হয়। তুমি মনুষ্যের নিকট উপদেশ না গ্রহণ কর, সহৃদয় চরাচর জগতের শিক্ষাদাতা সদাশিবকে একান্ত মনে গুরুপদে বরণ কর নাই কেন?"

একাকী নির্ভয় হৃদয়ে গৌরীশঙ্কর যাইতে লাগিলেন। ঘোর অন্ধকার! ভয়াবহ নির্জন শ্মশানভূমি! রাত্রি এক প্রহরের সময় তিনি সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্মশানে উপস্থিত হইয়া, প্রথম তিনি অঘোর-অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা চারিদিক রক্ষা করিলেন। তাহার পর পুষ্করিণীর জলে স্নান করিয়া, নূতন অধৌত এক চিতার উপর পূজার স্থান চিহ্নিত করিলেন। তাহার পার্শ্বে দীপ রাখিবার নিমিত্ত সামান্য এক গর্ত্ত খুঁড়িলেন। অবশেষে তিনি ধীরে ধীরে সেই বটবৃক্ষে উঠিলেন। পকেট হইতে দীপ-শলাকা জ্বালাইয়া মাতুরাবৃত মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন। শবের সমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। মড়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আর একটি মন্ত্র বলিয়া শবকে নমস্কার করিলেন। তাহার পর শবকে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, তিনি কয়েকটি মন্ত্র পাঠ করিলেন। অবশেষে যে রজ্জু দ্বারা শব গাছে আবদ্ধ ছিল, আস্তে আস্তে তাহা কাটিয়া ফেলিলেন। এইরূপে যথাসাধ্য ধীরে ধীরে মড়াকে গাছ হইতে নামাইলেন। তাহার পর মড়ার কোমর ধরিয়া পূজার স্থানে তাহাকে টানিয়া লইয়া গেলেন। পুষ্করিণী হইতে কলসী কলসী জল আনিয়া তাহাকে উত্তমরূপে স্নান করাইলেন ও চন্দনাদি সুগন্ধ তাহার শরীরে লেপন করিলেন। গৌরীশঙ্কর যখন এইরূপ করিতেছেন, তখন মড়া একবার হুহুঙ্কার শব্দ করিয়া দাঁত কিড়মিড় করিল। তাহার মুখদেশ তখন ভয়ানক মূর্তি ধারণ করিল। কিন্তু গৌরীশঙ্কর তাহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। মড়ার শরীরে তিনি বার বার থু থু দিতে লাগিলেন। মড়া পুনরায় স্থির হইল। তখন তাহাকে পুনরায় প্রক্ষালন করিয়া, পুনরায় তাহার শরীরে চন্দনাদি লেপন করিলেন। তাহার পর সেই অধৌত চিতার উপর তিনি কুশ ছড়াইলেন। মড়ার কোমর ধরিয়া, সেই কুশের উপর লইয়া পূর্বশির করিয়া তাহাকে শয়ন করাইলেন। তাহার

পর এলাচি কর্পূর প্রভৃতি মসলা সংযুক্ত পান তাহার মুখে দিয়া মড়াকে অধোমুখ অর্থাৎ উপুড় করিলেন। এইরূপ করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে চন্দন দ্বারা, এক চারি-কোণা ঘর অঙ্কিত করিলেন। সেই চারি-কোণা ঘরের ভিতর একটি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিলেন। মড়া যাহাতে উঠিতে না পারে, সেই জন্য তাহার পদদ্বয় পট্টসূত্র দ্বারা বন্ধন করিলেন। অবশেষে মড়ার পৃষ্ঠে একখানি কম্বল বিছাইয়া, অশ্বারোহণের ন্যায় তাহার পৃষ্ঠে চড়িয়া বসিলেন। মড়ার দুই হাত দুই পার্শ্বে বিস্তৃত করিয়া কুশ রাখিয়া, গৌরীশঙ্কর নিজের দুই পা মড়ার দুই হাতের উপর রাখিলেন। মড়ার দীর্ঘ কেশ ছিল, সেই চুলগুলি খুলিয়া গৌরীশঙ্কর ঝুটি বাঁধিয়া দিলেন। অস্ত্র মন্ত্র পাঠ করিয়া, চারিদিকে সরিষা ছড়াইয়া দিলেন। তাহার পর আর কয়েকটি মন্ত্র পাঠ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নানা বিভীষিকা

এইরূপ নানা প্রকার আয়োজন ও মন্ত্র পাঠ করিয়া গৌরীশঙ্কর পূজা আরম্ভ করিলেন। গুরু নাই যে গুরুর পূজা করিবেন, কাজেই প্রথম তিনি দশদিকপালের পূজা করিলেন। তাহার পর ইন্দ্রকে বলি প্রদান করিলেন। নানা মন্ত্রে ও নানা উপকরণে দেবতাদিগের পূজা করিয়া, গৌরীশঙ্কর জপ আরম্ভ করিলেম। অমাবস্যা রাত্রি তো ছিলই, তাহার উপর ক্রমে ক্রমে আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইল। এরূপ নিবিড় অন্ধকার দ্বারা পৃথিবী আচ্ছন্ন হইল যে, প্রলয়কালে সেরূপ হয় কি না সন্দেহ। তাহার পর তুমুল ঝঞ্ঝাবাতে দশ দিক পূর্ণ হইল। প্রবল বায়ুবেগে গৌরীশঙ্করকে শবের পৃষ্ঠ হইতে উত্তোলন করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাঁহাকে উঠাইতে পারিল না। দৃঢ় বীরাসনে তিনি শবের পৃষ্ঠে বসিয়া রহিলেন। দন্ত কিড়মিড় করিয়া, হুহুঙ্কার শব্দ করিয়া মড়া উঠিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার পদদ্বয় পাটের দড়ি দ্বারা বাঁধা ছিল। নিজের দুই পা দিয়া গৌরীশঙ্কর তাহার হাত দুইটা মাটিতে চাপিয়া রাখিলেন।

শব উঠিতে পারিল না। এই সময় আকাশে মাঝে মাঝে উল্কাপাত হইতে লাগিল; মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল; ঘোর বজ্র-শব্দে কর্ণে তালি লাগিতে লাগিল। এই সমস্ত উপদ্রবে গৌরীশঙ্কর কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। শবের উপর বসিয়া একান্ত মনে তিনি জপ করিতে লাগিলেন। বায়ুবেগে মেঘ ক্রমে দূরীভূত হইল, আকাশ পরিষ্কার হইল; পৃথিবী ক্ষণকালের নিমিত্ত স্থির হইল। এমন সময় সহসা এক দিক হইতে বন্য শূকরের পাল আসিয়া দন্ত দ্বারা গৌরীশঙ্করকে বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল। সহসা এই বিপদ দেখিয়া, ক্ষণকালের নিমিত্ত তিনি চমকিত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই চক্ষু মুদিত করিয়া, তিনি জপে প্রবৃত্ত হইলেন। বন্য শূকর অদৃশ্য হইয়া পড়িল। পৃথিবী আর একবার নিস্তব্ধ হইল। তাহার পর, সহসা অতি নিকটে ব্যাঘ্রের ভীষণ গর্জন শ্রবণ করিয়া গৌরীশঙ্কর একবার চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র তাহার করাল বদন ব্যাদান করিয়া, তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। গ্রাস করে আর কি! সহসা ভীত হইয়া, গৌরীশঙ্কর পলায়নের উপক্রম করিলেন। কিন্তু সে চিন্তা নিমেষের নিমিত্ত তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল। মনকে দৃঢ় করিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া, পুনরায় তিনি জপে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্যাঘ্র চলিয়া গেল। তাহার পর গৌরীশঙ্করের চারিদিকে অসংখ্য কাল-সর্প আসিয়া ফোঁশ ফোঁশ করিতে লাগিল। কিন্তু এবারও তিনি চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন না, সে নিমিত্ত ভয়ও পাইলেন না। কিছুক্ষণ পরে সাপের গর্জন থামিয়া গেল। তাহার পর গৌরীশঙ্করের ঠিক কানের নিকট বিকট হাসির শব্দ হইল। সেরূপ বিকট হাসি কেহ কখনও শ্রবণ করে নাই। সেই শব্দ শুনিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি মনকে স্থির করিলেন। তাহার পরক্ষণেই পালে পালে পিশাচ, ভূত, প্রেত, দানা, দৈত্য, ডাকিনী, শাকিনী, হাকিনী, ভৈরব, বটুক প্রভৃতি আসিয়া তাঁহার চারিদিকে নৃত্য করিতে লাগিল। নৃত্য করিতে করিতে মাঝে মাঝে এরূপ বিকট শব্দ করিতে লাগিল যে, সে শব্দ শুনিলে কোন মনুষ্যই চেতন অবস্থায় থাকিতে পারে না। পুনরায়

আর একবার পলায়ন করিবার নিমিত্ত গৌরীশঙ্করের মন হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি মনকে দৃঢ় করিতে সমর্থ হইলেন। চক্ষু মুদিত করিয়া তিনি একান্ত মনে জপ করিতে লাগিলেন। গৌরীশঙ্কর ভাবিলেন যে, —"ভূত প্রেত কখন দেখি নাই, একবার চাহিয়া দেখি, ভূত-প্রেত কিরূপ হয়।" এই বলিয়া তিনি নিমেষের নিমিত্ত একবার চাহিয়া দেখিলেন। কিন্তু সেই ভীষণ দৃশ্য দর্শনে পরক্ষণেই পুনরায় তাঁহাকে চক্ষু বুজিতে হইল। সে বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া, কেহ স্থির থাকিতে পারে না। সে অন্ধকারে তিনি তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেন না; কিন্তু মাঝে মাঝে তাহাদের মুখবিবর হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। সেই আলোকে তাহাদের রূপ তাঁহার নয়নগোচর হইল। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ সর্বাঙ্গে সহস্র সহস্র কৃমি তুলিতেছে। পাতালের ন্যায় মুখবিবর। মুখের ভিতর হইতে অনবরত রক্ত নির্গত হইতেছে। গজদন্তের ন্যায় বড়, কিন্তু বক্রাকার, ভীষণ দন্ত। ললাট দেশে কেবল একটি গোলাকার চক্ষু; সেই চক্ষু হইতেও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও সর্প বাহির হইতেছিল। চকিতের নিমিত্ত তিনি চাহিয়া দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই সময়ে কেবল একটি ভূতের উপর তাঁহার চক্ষু পড়িয়াছিল। সেই এক জনের যৎসামান্য রূপের পরিচয় তিনি পাইয়াছিলেন। অন্যান্য ভূতের কিরূপ আকার ছিল, তাহা তিনি দর্শন করেন নাই। ঐ ভূত ব্যতীত ক্ষণ-কালের নিমিত্ত আর এক জন উপদেবতা তাঁহার নয়নগোচর হইয়াছিল। উপরিউক্ত ভূতকে দেখিয়া তিনি চক্ষু বুজিলেন। কিছুক্ষণ পরে উষ্ণ বায়ুস্রোত তাঁহার মুখের উপর পড়িতে লাগিল। তিনি আর একবার চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, ঠিক তাঁহার সম্মুখে এক বৃদ্ধা ডাকিনী হাঁ করিয়া, দীর্ঘ ও ঘোর রক্তবর্ণ জিহ্বা বার বার লেহন করিতেছে। বৃদ্ধা ডাকিনীর একটিও দন্ত নাই। সর্বশরীর তাহার শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। অতি ভয়ানক আকৃতি? ডাকিনীর জিহ্বা তাঁহার নাসিকা স্পর্শ করে আর কি! ডাকিনীকে দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ চক্ষু মুদিত করিলেন।

গৌরীশঙ্কর পুনরায় জপ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে ভূত-প্রেতগণ

নৃত্য করিতে লাগিল। এই সময় বার বার ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। গৌরীশঙ্কর মনে করিলেন যে,—ভূমিকম্পে পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মড়ার সহিত যেন তিনি পাতাল-পুরীতে নামিয়া যাইতেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই হুশ্ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আর একবার মনে হইল যে, মড়ার সহিত তিনি যেন শূন্যে উঠিতেছেন; কিন্তু পরক্ষণেই হুশ্ করিয়া নামিয়া পড়িলেন। সেই সময় তাঁহার বুক টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। যাহা হউক, অনেক কষ্টে মনকে স্থির করিয়া পুনরায় তিনি জপে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ভূত প্রেতের উপর্দ্রব নিবৃত্ত হইল। পৃথিবী আর একবার স্থির হইল। এই সময় অতি সুমধুর বামা স্বরে নিকটে কে আসিয়া গৌরী-শঙ্করকে বলিল,—"নাথ! অনেক কষ্ট করিয়াছ। এক্ষণে উঠ! আমি আসিয়াছি। বিবাহের নিমিত্ত তুমি লালায়িত হইয়াছিলে, এখন চাহিয়া দেখ, দেবী তোমার নিমিত্ত কিরূপ পত্নী প্রেরণ করিয়াছেন। নাথ! চিরকাল তোমাকে আমি প্রেমে আবদ্ধ রাখিব। যে স্বর্গীয় সুখ শচী ইন্দ্রকে প্রদান করিতে পারে না, সেইরূপ নানা সুখে পরিতোষ করিব। হে প্রাণনাথ! গাত্রোত্থান কর! ঐ বীভৎস আসনের উপর আর বসিয়া থাকিবার আবশ্যক নাই।" কামিনীয় সুমধুর স্বরে গৌরীশঙ্করের হৃদয়ে যেন সুধাসিঞ্চন করিল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন,—"সম্মুখে যৌবন-প্রাপ্তপ্রায় চতুর্দশ বর্ষ বয়স্কা এক কামিনী। তাহার রূপে সেই অমাবস্যা রাত্রিও আলোকিত হইয়াছিল।

কামিনীর মধুর বচনে গৌরীশঙ্করের হৃদয় শীতল হইল; তাহার স্থির-বিদ্যুৎসম রূপ মাধুরী দর্শনে তাঁহার মন মোহিত হইল। তিনি মনে করিলেন,—"কাজ কি আর ধনে? দেবী যখন কৃপা করিয়া এরূপ জগন্মোহিনী যুবতীকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তখন ইহাকেই লইয়া পরম সুখে আমি জীবন অতিবাহিত করি। আমার যতই ধন ঐশ্বর্য হউক না কেন, সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়া আমি এরূপ নারী পাইব না। আর জপে প্রয়োজন নাই, উঠিয়া ইহাকে হৃদয়ে ধারণ করি।" এইরূপ চিন্তা করিয়া গৌরীশঙ্কর শবের উপর হইতে উঠিবার নিমিত্ত

উপক্রম করিলেন ; কিন্তু সেই সময় কে যেন তাঁহার পিঠে চাপড় মারিয়া বলিল,—"কর কি? এ যে সব মায়া! জপ পরিত্যাগ করিলে মুহূর্তমধ্যে হয় তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, আর না হয় পাগল হইয়া যাইবে।" গৌরীশঙ্করের তখন যেন চমক হইল। তিনি মনে করিলেন, —"সত্য বটে, এ সমুদয় মায়া। কিন্তু এ কামিনীর রূপ দেখিয়া কেহই স্থির থাকিতে পারেন না। প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তথাপি তাহার নিকট ধাবিত হইতে ইচ্ছা হয়। দূর হউক, আর ইহার দিকে চাহিয়া দেখিব না!" এই বলিয়া গৌরীশঙ্কর চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কামিনী অতি সুমধর স্বরে নানারূপ সাধ্য-সাধনা করিল ; কিন্তু গৌরীশঙ্কর চক্ষু উন্মীলন করিলেন না। নিরাশ হইয়া মায়াময়ী অন্তর্হিত হইল। গৌরীশঙ্কর চাহিয়া দেখিলেন যে, এখন আর সে-স্থানে বন্য পশু অথবা ভূত-প্রেত প্রভৃতি কিছুই নাই। এখন চারিদিকে কেবল নিবিড় অন্ধকার।

তৃতীয় অধ্যায়

বীরের বাক্যবাণ

গৌরীশঙ্কর পুনরায় একান্ত মনে জপে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে সহসা মাতার কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সেই অমাবস্যা রাত্রি,—সেই ভয়াবহ শ্মশান-ভূমি!—সে স্থানে মাতা কেন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এই চিন্তা করিয়া তাঁহার মন বড়ই কাতর হইল। তিনি চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন,—সত্য সত্যই তাঁহার বৃদ্ধ মাতা বটে! যষ্টি হস্তে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মা বলিলেন,—

"উত্তিষ্ঠ বৎস তে কার্যং সর্বং যাতু ন সংশয়ঃ।
প্রভাতসময়োজাতস্ত্বৎপিতা ক্রোশতে গৃহম্॥
প্রায়ো বিমৎসরা লোকা রাজানো দণ্ডধারিনঃ।
কদাচিৎ কেন বা দৃষ্টিস্তদা কিঞ্চিদ্ ভবিষ্যতি॥"

মাতার মুখে এরূপ সংস্কৃত বচন শুনিয়া গৌরীশঙ্কর বিস্মিত হইলেন।

"আমার পিতা নাই, দেশে রাজপুরুষ আছে বটে; কিন্তু রাজা নাই। ইনি কি আমার মাতা নহেন, ইনি কি মায়া?" গৌরীশঙ্কর ভাল রূপে পুনরায় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। হু-বহু তাঁহার মাতা, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। মস্তকে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মাতা বলিলেন,—"বাছা, তুই আমার একমাত্র সন্তান। কেন তুই এমন অসীম সাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিস? যদি তোর কোনরূপ বিপদ ঘটে, তাহা হইলে কাহাকে লইয়া আমি আর এ সংসারে থাকিব? কাজ কি বাছা ধনে? ব্রাহ্মণের ছেলে,—খুই ভিক্ষা করিয়া খাইবি, চল, বাছা ঘরে চল, আর জপে প্রয়োজন নাই।"

মাতা এইরূপে খেদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু গৌরীশঙ্কর তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি মনে করিলেন যে, যদি প্রকৃত আমার মাতা হন, তাহা হইলে ইনি আমার হাত ধরিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু মাতা তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন না। অনেক খেদ করিরা, অবশেষে তিনি প্রস্থান করিলেন। ইহার পর আরও অনেক আত্মীয় বন্ধুবান্ধব আসিরা গৌরীশঙ্করকে তুলিতে চেষ্টা করিল। বহুকাল পূর্বে মৃত পিতা ও জ্ঞাতিগণও আসিয়া, তাঁহাকে শবের উপর হইতে উঠিতে অনুরোধ করিলেন! কিন্তু গৌরীশঙ্কর উঠিলেন না। নানারূপ বিভীষিকা দর্শনে তাঁহার হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না।

রাত্রি প্রায় তিনটা হইল। এমন সময় একজন থিয়েটারী বীর সেই শ্মশান-ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৌরীশঙ্কর একবার থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন। সে-স্থানে একজন অভিমন্যু সাজিয়া আসিয়াছিল। থিয়েটারে যাহারা বীর সাজেন, তাহারা মনে করেন যে, খুব চীৎকার করিতে পারিলেই বীরত্ব প্রদর্শন করা হয়। থিয়েটারের রীতি অনুসারে সেই অভিমন্যুও ভয়ানক চীৎকার করিয়াছিল। তাহার চীৎকারে অনেক লোকের কান হইতে পোকা বাহির হইয়া গিয়াছিল; অনেক লোকের কর্ণে তালি লাগিয়াছিল; তাহা ভিন্ন চারি পাঁচ জনের কর্ণতন্ত্ব ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল; চারি পাঁচ জনের কর্ণপটহে ছিদ্র হইয়া গিয়াছিল। সেই হতভাগারা জন্মের মতে বধির হইয়া গিয়াছে।

গৌরীশঙ্কর চীৎকারে অস্থির হইয়া তৎক্ষণাৎ থিয়েটার হইতে প্রস্থান করেন। সেই অবধি থিয়েটারী বীরকে তিনি বড় ভয় করেন। এখন সেই থিয়েটারী বীর শ্মশানক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। থিয়েটারী বীর অতি কর্কশ স্বরে ঘোর চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—"রে রে রে, কে রে তুই? যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি! জানিস্ আমি থিয়েটারী বীর! এ জগতে এমন কে আছে যে, আমার চীৎকার সহ্য করিতে পারে? আমার চীৎকার বচনে কাহার না কান ঝালা-পালা হয়? আমি যখন থিয়েটারের তক্তার উপর দাঁড়াইয়া ঘোর রবে চীৎকার করিতে থাকি, তখন কোন দর্শক, কোন্ শ্রোতা না কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করে? কেনা আমাকে শত শত গালি দিয়া থাকে? কে না বলে যে, যবনিকা-পতন হইলে বাঁচি? যুদ্ধং দেহি। যুদ্ধং দেহি।"

গৌরীশঙ্কর অনেকক্ষণ পর্যন্ত থিয়েটারী বীরের বক্তৃতা প্রাণপণে সহ্য করিলেন, কিন্তু শেষকালে তিনি আর পারিলেন না! হায়! হায়! এত কষ্ট করিয়া শেষকালে সব বিফল হইল! তিনি মনে করিলেন,— বরাহ-ব্যাঘ্রের উপদ্রব সহ্য করিলাম, ভূত-প্রেতের দৌরাত্ম্যেও মনকে স্থির রাখিলাম, অপ্সরার মোহিনী শক্তি আমাকে মোহিত করিতে পারে নাই, মাতার সকরুণ ক্রন্দনেও আমি বিচলিত হই নাই, কিন্তু এই থিয়েটারী বীরের বাক্যবাণে আমার কর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, আমার হৃদয় বিদ্ধ হইয়া জর্জরীভূত হইল। ইহার জ্যেঠামি আমি আর সহ্য করিতে পারি না।"

এইরূপ মনে করিয়া, গৌরীশঙ্কর আসন ত্যাগ করিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু এবারও কে যেন তাঁহার পিঠে চাপড় মারিয়া বলিল, —"কর কি? এ প্রকৃত থিয়েটারী বীর নহে, এ মায়াপ্রসূত ভূত। একটু ধৈর্য ধরিয়া থাক। এখনি এ চলিয়া যাইবে।"

গৌরীশঙ্কর মন দৃঢ় করিয়া জপে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু থিয়েটারী বীর দ্বিগুণভাবে চীৎকার আরম্ভ করিল, তাহার চীৎকারে গগন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। গৌরীশঙ্কর আর ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না। থিয়েটারী বীরের বাক্যবাণে তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন।

কানে অঙ্গুলি দিয়া ধড়্‌মড় করিয়া তিনি শবের পৃষ্ঠ হইতে উঠিয়া পড়িলেন। শ্মশানক্ষেত্র হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় চারিদিকে ঘোর কলরব উপস্থিত হইল। সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ ভল্লক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু, ভূত প্রেত পিশাচ দানা দৈত্য ডাকিনী শাকিনী বেতাল বটুক চেটক প্রভৃতি উপদেবতা, ও শত শত থিয়েটারী বীর এক সঙ্গে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিল। কেহ লম্ফপ্রদান করিতে লাগিল। কেহ নৃত্য করিতে লাগিল। অবশেষে ভয়ঙ্কর এক বেতাল আসিয়া গৌরীশঙ্করের টিকি ধরিল। তাঁহার টিকিটি ধরিয়া দূরে পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিল। ভাগ্যে পুষ্করিণীর মাঝখানে গিয়া তিনি পড়েন নাই, তাই রক্ষা। পুষ্করিণীর যে স্থানে কেবল কর্দম ছিল, সেই স্থানে গিয়া তিনি পড়িয়াছিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে, সেই স্থানে তিনি পড়িয়া রহিয়াছেন; সে সময় তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা ছিল না। অজ্ঞান অভিভূত হইয়া তিনি পড়িয়া ছিলেন। কেবল অল্প অল্প নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছিল, কেবল অল্প অল্প গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছিলেন, কেবল অল্প অল্প রক্ত মিশ্রিত ফেন তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইতেছিল। জীবনের এই সামান্য মাত্র চিহ্ন কেবল অবশিষ্ট ছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

থি-বী, যু-দ্ধে

প্রাতঃকালে একজন রাখাল-বালক গৌরীশঙ্কর বাবুকে এই অবস্থায় প্রথম দেখিতে পাইল। তাহার চীৎকারে চারিদিক্ হইতে লোক আসিয়া পড়িল। নিকটে সেই চণ্ডালের শব ও পূজার আয়োজন দেখিয়া সকলে বুঝিতে পারিল যে, কি কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। গৌরীশঙ্কর বাবুকে ধরাধরি করিয়া সকলে গৃহে লইয়া গেল। প্রথম ডাক্তার-বৈদ্য আসিয়া তাঁহার চেতনা-সম্পাদনের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কেহ তাঁহাকে চেতন করিতে পারিল না।

যদি-বা যৎসামান্যভাবে তাঁহার দেহে একটু জীবনের সঞ্চার হয়, যদি-বা তাঁহার মনে একটু জ্ঞানের উদয় হয়, কিন্তু প্রতিদিন রাত্রি তিনটার সময় গৌরীশঙ্করের পৃষ্ঠদেশে গুপ্‌গাপ শব্দ হয়। কিরূপে তাঁহার পৃষ্ঠে এরূপ শব্দ হয়, তাহা কেহ দেখিতে পায় না ; কিন্তু কে যেন সবলে তাঁহার পৃষ্ঠে কিল মারিতেছে, এইরূপ বোধ হয়। সেইসময় প্রহারের চোটে যন্ত্রণায় গৌরীশঙ্করের মুখ বিবর্ণ হইয়া পড়ে। দিনের বেলা শরীরে যাহা একটু বলের সঞ্চার ও মনে যাহা একটু জ্ঞানের উদয় হয়, সেই প্রহারের চোটে তাহা লোপ পাইয়া যায়। তাহার পর গৌরীশঙ্কর পুনরায় জড়ের মত পড়িয়া থাকেন। ফল কথা, ডাক্তার ও বৈদ্য দ্বারা কোনরূপ উপকার হইল না।

এক মাত্র পুত্রের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, গৌরীশঙ্করের মাতার দুঃখের আর সীমা রহিল না। তিনি রাত্রি দিন কাঁদিতে লাগিলেন। আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, পুত্রের সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। রোজার কথা শুনিলেই, দৌড়িয়া তিনি তাহার নিকট গমন করেন ; নানারূপ মিনতি করিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনেন। প্রতি রাত্রিতে রোজগণ নানারূপ ঝাড়ান করিতে লাগিল। দিনের বেলা একটু উপশম হয়। এক আধ বার চক্ষু উন্মীলিত করিয়া, গৌরীশঙ্কর বিস্ময়াপন্ন মুখে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করেন। কিন্তু দিনের বেলা যাহা একটু উপকার হয়, রাত্রি তিনটার সময় ভূতের কিলের চোটে সে উপকার লোপ প্রাপ্ত হয়। রাত্রি তিনটার সময় প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া ভূতে তাঁহার পিঠে গুপ্‌ গাপ্‌, গুপ্‌-গাপ্‌ কিল মারে। আধ ঘণ্টা পরে কিলের শব্দ থামিয়া যায়। গৌরীশঙ্কর তাহার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত গোঁ-গোঁ শব্দ করিতে থাকেন ও সেই সময় তাঁহার মুখ হইতে রক্তমিশ্রিত ফেনা নির্গত হইতে থাকে। তাঁহার পিঠে কোন স্থানে কৃষ্ণবর্ণ—কোন স্থানে রক্তবর্ণ,—কিলের দাগও সকলে দেখিতে পায় ; কিন্তু কে যে আসিয়া কিল মারিয়া যায়, কেহ তাহা দেখিতে পায় না।

এইরূপে এগার দিন কাটিয়া গেল। এখনও গৌরীশঙ্করের চেতনা হইল না। এখনও প্রতি রাত্রিতে [illegible]

হইল না। শব-সাধনের একাদশ দিন পরে গৌরীশঙ্করের মাতা শুনিলেন যে, যে চণ্ডালের শব লইয়া গৌরীশঙ্কর সাধনা করিতেছিলেন, তাহার পিতৃব্য ভূতের মন্ত্র অবগত আছে। গৌরীশঙ্করের মাতা তাহার নিকট গমন করিলেন। প্রথমে সে কিছুতেই আসিতে স্বীকার পাইল না। কারণ, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের দেহ লইয়া গৌরীশঙ্কর সেই বিড়ম্বনা করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেক মিনতির পর, সে আসিয়া ঝাড়ান কাড়ান করিতে লাগিল। তাহার মন্ত্রের বলে সামান্য একটু উপকার হইল। গৌরীশঙ্কর এবার চাহিয়া দেখিলেন। "থি-বী, যু-দে" এই শব্দ দুইটি কয়বার তিনি উচ্চারণ করিলেন।

চণ্ডালের মন্ত্রে আর অধিক উপকার হইল না। গৌরীশঙ্করের জ্ঞান হইল না, রাত্রিকালে ভূতের প্রহার নিবারিত হইল না। আরও অনেক রোজা আসিয়া চিকিৎসা করিল; কিন্তু তাহাদের মন্ত্রেও বিশেষ কোনরূপ উপকার হইল না।

এইরূপে প্রায় এক মাস কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে গৌরীশঙ্করের মাতা এক ব্রাহ্মণের কথা শুনিলেন। তাঁহার নিবাস প্রায় দশ ক্রোশ দূরে। তিনি ভূত প্রেত সম্বন্ধে জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। গৌরীশঙ্করের মাতা বৃদ্ধা ছিলেন, তথাপি লাঠি হাতে করিয়া আস্তে আস্তে সেই ব্রাহ্মণের গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের পদতলে তিনি শয়ন করিয়া পড়িলেন। বৃদ্ধার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণের দয়া হইল। তিনি গৌরীশঙ্করের নিকট আগমন করিয়া নানারূপ ঔষধ প্রদান করিলেন ও নানারূপ মন্ত্র পাঠ করিলেন। দুই দিন কোনরূপ ফল হইল না। তৃতীয় রাত্রিতে, "অ ক্ষঃ ক্ষাং-ক্ষৌ কাজসি নৌ," ব্রাহ্মণ যেই এই কয়টি শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন, আর গৌরীশঙ্কর বিপরীত ভাবে হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে তিনি উঠিয়া বসিলেন। এত দিন পরে এই প্রথম তিনি উঠিয়া বসিতে সমর্থ হইলেন। গৌরীশঙ্করের এইরূপ ভাব দেখিয়া, ব্রাহ্মণ পুনরায় এই শব্দগুলি উচ্চারণ করিলেন, "ম্না ম্রি মাঁ মাঁ। জাঁ। জাঁ। হুঁ হঃ সং সঃ ধং ধঃ ভং ভঃ ধং সং স্ফুং হ্রীং হুং হুং

হুং ক্ষীং ক্ষীং সং সঃ ছং ছঃ ধং সঃ স্তং স্তঃ হ্রীং হুং হুং হূ ক্ষীং ক্ষীং ক্ষোং সং ফং ফঃ হুং ফট্ স্বাহা; কাহার আজ্ঞা—না, শ্রীশ্রীউড্‌ডামরেশ্বরের আজ্ঞা।" এ শব্দগুলির অর্থ কি, যাঁহাদের এ সম্বন্ধে বোধ আছে, তাঁহারা অনায়াসেই অবগত হইতে পারিবেন।

নানারূপ মন্ত্রবলে ব্রাহ্মণ গৌরীশঙ্করকে জড়ভাব হইতে মুক্ত করিলেন; কিন্তু তিনি ঘোর উন্মাদ অবস্থায় রহিলেন। তাঁহার জ্ঞান কিছু-মাত্র হইল না। রাত্রিতে প্রহারও বন্ধ হইল না। গৌরীশঙ্কর যথারীতি আহারাদি করিতে লাগিলেন, উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের চিকিৎসায় এই পর্যন্ত হইল। কিন্তু তিনি কথা কহিতেন না। কখনও কখনও আপনা-আপনি, অথবা লোকের কথার প্রত্যুত্তরে কেবল "থি-বী, যু-দে" এই শব্দ উচ্চারণ করিতেন। এই দুইটি শব্দ ভিন্ন অন্য কথা তিনি মুখে আনিতেন না। আর এই দুইটি শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র তাঁহার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিত ও সেই সময় আতঙ্কে তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া উঠিত। প্রতি রাত্রিতে ভূতের প্রহারে গৌরীশঙ্করের দেহ দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল। অবশেষে গৌরীশঙ্করের মাতাকে ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আপনার পুত্রকে সামান্য ভূতে পায় নাই। সামান্য ভূত হইলে আমি তাহার প্রতিকার করিতে পারিতাম। ইহার শরীরে বেতাল আশ্রয় করিয়াছে। বেতালকে দূর করি, আমার সেরূপ ক্ষমতা নাই।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলেন।

পুত্রের উন্মত্ততা দূর করিবার নিমিত্ত ও ভূতের প্রহার হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, মাতা যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না। সেই একমাত্র পুত্র। তাঁহার যখন এ দশা হইল, তখন সংসার ধর্ম আর কাহাকে লইয়া? গৃহে থাকিয়া আর লাভ কি? মাতা ভাবিলেন,—"পুত্রকে লইয়া যেদিকে দুই চক্ষু যায়, সেই দিকে আমি চলিয়া যাইব। নানা তীর্থস্থানে আমি ঘুরিয়া বেড়াইব। যদি কোন স্থানে কোন মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে তাঁহার কৃপায় আমার পুত্র আরোগ্য লাভ করিবে। আর তা না হয়, তাহা হইলে পথে পথে বেড়াইয়া, আমি অবশিষ্ট জীবন

অতিবাহিত করিব। আমার অবর্তমানে এই উন্মাদের কপালে যাহা আছে, তাহাই হইবে।"

এইরূপ ভাবিয়া, তিনি পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গৌরীশঙ্কর! বাবা! আমরা যদি কাশী বৃন্দাবনে যাই, তাহা হইলে তুমি কি ভাল হইবে?"

গৌরীশঙ্কর উত্তর করিলেন,—"থি-বী, যু-দে।"

মাতা জানিতেন যে, ঐ দুইটি শব্দ ভিন্ন গৌরীশঙ্কর অন্য কোন কথা মুখে আনিবেন না। তথাপি মায়ের প্রাণ! তিনি কেবল ঐ দুইটি শব্দই শুনিবার নিমিত্ত গৌরীশঙ্করকে সম্বোধন করিয়া নানা কথা কহিতেন, নানা পরিচয় তাহাকে প্রদান করিতেন, চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে, আঁচলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে, পুত্রের সহিত নানা গল্প করিতেন। পুত্র কেবল বলিত,—'থি-রী, যু-দে।'

পঞ্চম অধ্যায়

দেখিতে সামান্য লোক

পুত্রকে লইয়া গৌরীশঙ্করের মাতা বাটী হইতে বাহির হইলেন। প্রথম অর্থাভাব, দ্বিতীয় পাঁচ জনের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা,—এই দুই কারণে তাঁহারা পদব্রজে পথ চলিতে লাগিলেন। মাতা বৃদ্ধা ছিলেন, অধিক পথ চলিবার তাঁহার শক্তি ছিল না; এক দিনের পথ তিনি চারি দিনে অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাতে অতি সামান্য টাকা ছিল। পাছে সেগুলি শীঘ্র শেষ হইয়া যায়, সেই ভয়ে যথাসাধ্য ভিক্ষা দ্বারা তিনি পথে দিনপাত করিতে লাগিলেন। ক্ষিপ্ত পুত্র সহিত বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীকে দেখিয়া, সকলের দয়া হইত। সে নিমিত্ত পথে আহারাভাবে তাঁহাদিগকে ক্লেশ পাইতে হয় নাই। পুত্র কিরূপে ক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা শুনিয়া অনেকে বৃদ্ধার দুঃখে দুঃখী হইত। তাঁহার দুঃখে কাতর হইয়া, কোন কোন স্থানে ধনবান্ লোকের গৃহিণীগণ তাঁহাকে নগদ অর্থও প্রদান করিতেন। পুত্রের চিকিৎসার নিমিত্ত কোন

দিন কি আবশ্যক হয়, এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণী যথাসাধ্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিতেন। এইরূপে দুইজনে গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি নানা তীর্থস্থানে ভ্রমণ করিলেন। সাধু-সন্ন্যাসী দেখিলে সকলকেই মাতা অতি বিনীত ভাবে পুত্রের বিবরণ প্রদান করিতেন। কিন্তু কোনও স্থানে কাহারও দ্বারা তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইলনা; গৌরীশঙ্করকে কেহই সে বিপদ হইতে মুক্ত করিতে পারিল না। তবে বায়ুপরিবর্তনে, নানা দেশ পর্যটনে ও নানা দৃশ্যদর্শনে এই মাত্র উপকার হইল যে, গৌরীশঙ্করের বিমর্ষভাব অনেকটা দূর হইল; পূর্বাপেক্ষা তাঁহার চিত্ত যেন কিছু প্রফুল্লভাব ধারণ করিল। কিন্তু যে স্থানেই গমন করেন, যে স্থানেই দুই জনে রাত্রি যাপনের নিমিত্ত শয়ন করেন, সেই স্থানেই রাত্রি তিন প্রহরের সময় গৌরীশঙ্করের পৃষ্ঠ ভূতের প্রহারে প্রপীড়িত হয়। তবে প্রহারে প্রহারে পিঠে কড়া পড়িয়া গেল। পিঠ কঠিন হইয়া পূর্বাপেক্ষা যাতনার কিছু লাঘব হইল। যাহা হউক, গৌরীশঙ্করের উন্মত্ততা ঘুচিল না, ভূতও তাঁহাকে ছাড়িল না।

এইরূপে তিন বৎসর পথে পথে কাটিয়া গেল। মাতার বার্ধক্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল। বয়সের গুণে, পথক্লেশে, ভাবনা চিন্তায়, দিন দিন তিনি দুর্বল হইতে লাগিলেন। চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টিশক্তি ক্রমে হীন হইতে লাগিল। রোগগ্রস্ত হইয়া, যদি কিছু দিন তাঁহাকে পড়িয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে দুই জনের কি দশা হইবে, আর সহসা যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে পুত্রের কি দুর্দশা হইবে, এই সব ভাবিয়া প্রাণ তাঁহার বড়ই আকুল হইল। যাহা হউক, তিন বৎসর পরে শীতকালের প্রারম্ভে তাঁহারা উত্তরাখণ্ড হইতে নামিয়া, পুনরায় হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদ্বারের নিকট জ্বালাপুর নামক একখানি গ্রাম আছে। সেই গ্রামের প্রান্তদেশে বৃহৎ একটি আমবাগান আছে। এক দিন অপরাহ্নে গৌরীশঙ্কর ও তাঁহার মাতা সেই বাগানের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পথশ্রমে কাতর হইয়া দুই জনে এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। সেই বৃক্ষতলে আর একটি পুরুষ বসিয়াছিলেন। লোকটি দেখিতে বাঙালীর মতো, পরিধান বাঙালীর মতো, তবে

চাদরখানি তিনি মাথায় বাঁধিয়াছিলেন। সাধু-সন্ন্যাসীর মতো তাঁহার বেশভূষা ছিল না। ভদ্র বাঙালী সন্তানের যেরূপ হয়, তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ও ভাব-ভঙ্গি সেইরূপ ছিল। তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসরের কিছু অধিক হইবে। সাধু-সন্ন্যাসী দেখিলেই, গৌরীশঙ্করের মাতা পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করেন। ইনি সাধু নহেন; সুতরাং বৃদ্ধা তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

সেই লোকটি এক বৃক্ষমূলে ঠেস দিয়া, অর্ধশায়িত ভাবে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। মাতা ও পুত্র সেই স্থানে আসিয়া তঁহার নিকট হইতে কিছুদূরে উপবেশন করিলেন। বাঙালী তাঁহাদের প্রতি একবার কটাক্ষপাত করিবামাত্র তিনি চমকিত হইলেন। তাহার পর, কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত তিনি স্থিরদৃষ্টিতে গৌরীশঙ্করকে নিরীক্ষণ করিলেন। গৌরীশঙ্করকে ভাল করিয়া দেখিয়া, চক্ষু মুদিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে চক্ষু চাহিয়া তিনি বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মা! আমি বাঙালী, তোমরা আমার দেশস্থ লোক। কত দিন ধরিয়া তোমার পুত্রের এ দশা হইয়াছে?"

সামান্য এই কয়টি কথা শুনিবামাত্র বৃদ্ধার মনে কিরূপ এক অনির্বচনীয় আশার সঞ্চার হইল। সকল লোকেই প্রথম জিজ্ঞাসা করে, —"তোমার পুত্রের কি হইয়াছে?" ইনি সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। গৌরীশঙ্করের যাহা হইয়াছে, তাহা যেন তিনি সম্পূর্ণ ভাবে অবগত আছেন, কথার ভাবে সেইরূপ প্রকাশ হইল। তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্য-ভাবে, তাঁহার সুমধুর কথায়, বৃদ্ধার তাপিত-হৃদয় যেন শীতল হইল। ফল কথা, বৃদ্ধাকে কে যেন বলিয়া দিল যে,—ইনি সামান্য পুরুষ নহেন। ভাগ্যবলে আজ তুমি ইহার দর্শন পাইলে; এইবার তোমার দুঃখের অবসান হইল। তাঁহার প্রশ্নের কোনও রূপ উত্তর না দিয়া, বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি তাঁহার পা দুইটি ধরিতে যাইলেন।

বৃদ্ধাকে নিবারণ করিয়া তিনি বলিলেন,—"ছি! মা! অমন কাজ করিবেন না। আপনি বৃদ্ধা, আমার মাতৃস্থানীয়া।"

গৌরীশঙ্করের মাতা বলিলেন,—"বাছা! ভগবান্ আমাকে যেন

বলিয়া দিতেছেন যে, তোমা হইতে আমার পুত্র আরোগ্য-লাভ করিবে। বাছা! এই দুঃখিনীকে তুমি এ দায় হইতে উদ্ধার কর। অধিক আর তোমাকে কি বলিব, এই পুত্রটি ভিন্ন জগতে আমার আর কেহ নাই। ইহার এই দশায় আমি মৃতপ্রায় হইয়া আছি, পাগলের ন্যায় আমি দেশে দেশে ঘুরিতেছি। তুমি আমার প্রতি কৃপা কর।"

বাঙালী উত্তর করিলেন,—"আমি কিছু করিতে পারিব কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। তবে মা, আপনার পুত্রকে সুস্থ করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। নিকটে এই গ্রামখানির নাম জ্বালাপুর, এ স্থানে পাণ্ডাদের বাস। আমি আজ দুই দিন এ স্থানে আসিয়াছি। এক জন পাণ্ডার বাটীতে বাসা লইয়া আমি অবস্থিতি করিতেছি। আমার সঙ্গে বাসায় চলুন। আজ রাত্রিতে আপনার পুত্রের নিমিত্ত আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

বলা বাহুল্য যে, গৌরাশঙ্করের মাতা অতি আগ্রহে এ কথায় সম্মত হইলেন। তিন জনে ধীরে ধীরে জ্বালাপুর অভিমুখে চলিলেন। অল্পক্ষণ পরে তিন জনে সেই পাণ্ডার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাঙালী আহারাদির আয়োজন করিয়া দিলেন। সন্ধ্যার পর সকলে আহারাদি করিয়া নিশ্চিন্ত হইল, বাঙ্গালী গৌরীশঙ্করকে এক স্বতন্ত্র ঘরে একাকী শয়ন করিতে দিলেন। তাঁহার মাতাকে অন্য এক ঘরে বিশ্রাম করিতে বলিলেন। গৌরীশঙ্কর শয়ন করিলে সেই ঘরে বাঙালী গিয়া নানারূপ ক্রিয়া করিলেন। কি কি কাজ করিলেন, তাহার বিবরণ প্রদান করিবার আবশ্যক নাই। বাঙালী নানারূপ ক্রিয়া করিয়া, ঘরের বাহিরে আসিয়া বসিলেন। দ্বারের নিকট বসিয়া বাতির আলোকে একখানি পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন। ঘরের ভিতর গৌরীশঙ্কর নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

রাত্রির প্রথম ভাগে কোনও রূপ ঘটনা হইল না। তিনটার সময় যথারীতি গুপ্-গাপ্ শব্দ আরম্ভ হইল। সেই শব্দ শুনিয়া বাঙালী আলোক লইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন যে, গৌরী-শঙ্করের পিঠের উপর সেই শব্দ হইতেছে, তিনি গোঁ গোঁ করিতেছেন,

মুখ দিয়া তাঁহার ফেনা বাহির হইতেছে, মাঝে মাঝে তিনি চিৎ হইতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যতবার তিনি চিৎ হইতে চেষ্টা করিতেছেন, ততবার কে যেন তাঁহাকে বলপূর্ব্বক উপুড় করিয়া ফেলিতেছে। উপুড় করিয়া কে যেন তাঁহার পিঠে কিল মারিতেছে। আলোটি ঘরের মাঝখানে রাখিয়া, বাঙালী গৌরীশঙ্করের শিয়রদেশে গিয়া উপবেশন করিলেন। সে স্থানে বসিয়া তিনি তাহার মাথায় জপ করিতে লাগিলেন। জপ আরম্ভ করিবামাত্র কিলের শব্দ থামিয়া গেল। গৌরীশঙ্কর সুস্থির হইলেন। কিন্তু তাঁহার নিশ্বাস ঘন ঘন বহিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে গৌরীশঙ্কর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"থি-বী যু-দে।"

বাঙালী বলিলেন,—"পরিষ্কার করিয়া সকল কথা বল!"

গৌরীশঙ্কর কোন উত্তর করিলেন না। বাঙালী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, ক্রমাগত জপ করিতে লাগিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা এই ভাবে কাটিয়া গেল। জপ ব্যাতীত তিনি আরও নানারূপ ক্রিয়া করিলেন। অবশেষে গৌরীশঙ্কর আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"থি-বী, যু দে।"

বাঙালী বলিলেন,—"ভাল করিয়া বল!"

গৌরীশঙ্কর বলিলেন,—"থিয়েটারী বীর যুদ্ধং দেহি।"

বাঙালী বলিলেন,—"হে থিয়েটারী বীর! আজ হইতে আর তুমি ইহাকে বিরক্ত করিতে পারিবে না। কেমন! আমার আজ্ঞা তুমি পালন করিবে তো?"

গৌরীশঙ্কর এইবার প্রকৃতপক্ষে বক্তার হইলেন। আজ তিন বৎসর ধরিয়া "থি-বী যু-দে" ভিন্ন অন্য কথা মুখে আনেন নাই, আজ তিনি নানারূপ কথা বলিতে লাগিলেন।

কিন্তু এখন তিনি যে সমুদর কথা বলিতে লাগিলেন, তাহা তাঁহার নিজের নহে। যে ভূত তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল, এ সমুদয় তাহার কথা।

গৌরীশঙ্করের মুখ দিয়া সেই ভূত বলিল,—"মহাশয়! আপনি

আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, আমি সেইরূপ করিব। এ ব্যক্তি অতি অন্যায় কাজ করিয়াছে। ধনলোভে বিনা শিক্ষায় এ অসীম সাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। 'দেখি, মন্ত্র সফল হয় কি না? দেখি, আরাধনা করিলে ঈশ্বর সত্য সত্য মনুষ্যের প্রতি কৃপা করেন কি না,'—এইরূপ মনে করিয়া মন্ত্র ও মহাশক্তির পরীক্ষা করিতে এই ব্যক্তি গিয়াছিল। সেরূপ কার্যের পরিণাম এইরূপ হয়।"

বাঙালী বলিলেন,—"যাই হউক, ইহার যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে। আর কেন? ইহাকে এক্ষণে নিষ্কৃতি প্রদান কর।"

ভূত বলিল,—"আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব। আপনি মহাত্মা লোক। মানুষে আপনাকে জানে না, কিন্তু আমি আপনাকে জানি। বিষ্ণুপ্রয়াগ অঞ্চলে তুষারাবৃত হিমালয়শিখরে যেরূপে তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয়, যেরূপে আপনি প্রভুর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া, নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহা আমি জানি। যোগিগণ কেবল সমাধিযোগে যাঁহার দর্শন লাভ করেন, তিনি সর্বদাই আপনার হৃদয়-মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। অতি সূক্ষ্ম পরমাণু হইতে জড়জগতের অপর পারে সেই মহান্ জ্যোতির্মণ্ডল পর্যন্ত সকল বিষয় আপনি অবগত আছেন। কেবল লোক-শিক্ষার নিমিত্ত অজ্ঞের ন্যায় সাজিয়া আপনি সংসারে বিচরণ করেন। মোহে মুগ্ধ, ক্ষুধায় ক্ষীণ, রোগে রুগ্ন, শোকে আকুল, ভারতের কোটি কোটি লোকের দুঃখ-নিবারণের নিমিত্ত কত ক্লেশ, কত অপমান, আপনি না ভোগ করেন! জগতের হিতের নিমিত্ত দীনবেশে সামান্য লোকের ন্যায় আপনি অর্থ উপার্জন করিয়া অকাতরে তাহা বিতরণ করেন। হে মহাত্মন্! আমি"—

বাঙালী বলিলেন,—"চুপ!"

এই বলিয়া তিনি গৌরীশঙ্করের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। অগ্নি-শিখার ন্যায় সেই দৃষ্টি যেন রোগীর উপর পড়িতে লাগিল। তাঁহার সমুদয় মনের ভাব যেন রোগীর মনকে বিদ্ধ করিয়া, তাহার ভিতর ওতপ্রোতভাবে প্রবেশ করিতে লাগিল।

সে দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া, গৌরীশঙ্কর অর্থাৎ ভূত, মস্তক অবনত করিয়া বলিল,—"বেশ। আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক! অজ্ঞ সাজিয়া সংসারে আপনি থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই হউক। পাগল বলিয়া, লোকের নিকট পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাই হউক। এক্ষণে আপনার কি আজ্ঞা বলুন।"

বাঙালী বলিলেন,—"এ ব্রহ্মাণকে আর তুমি ক্লেশ দিতে পারিবে না।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া ভূত গৌরীশঙ্করের দেহ হইতে প্রস্থান করিল। গৌরীশঙ্কর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলেন। মাতার সহিত তিনি দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। বাঙালীর কৃপায় তাঁহার ভাল কর্ম হইল। যথাসময়ে তিনি বিবাহ করিলেন। গৌরীশঙ্করের মাতা, পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া পরম সুখে ঘর-কন্না করিতে লাগিলেন।

[illegible] মহাশয় বলিলেন,—"এই গল্পটি শেষ করিয়া আমি দেখিলাম যে, এখন কেবল একটি মুণ্ড বাকী আছে। মুণ্ড-মালার আর সমুদয় মুণ্ডগুলি রক্ত মুক্তার আকার ধারণ করিয়াছে।"

এই শেষ মুণ্ড আমাকে বলিল,—"তুমি এই মাত্র যে গল্পটি বলিলে, সেটি অতি চমৎকার গল্প। সে গল্পটি আমাদের সম্বন্ধে। গৌরীশঙ্করকে যে বেতাল পাইয়াছিল, সে আমার ভগিনীপতির আঁবুই খুড়ো। এখন আমার নিকট সেইরূপ আর একটি ভাল গল্প কর।"

ভগিনীপতির আঁবুই খুড়ো কাহাকে বলে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমি শেষ মুণ্ডকে বলিলাম,—"আপনা-দিগের নিকট আমি অনেক গল্প করিলাম। কিন্তু ডাকিনীর হাত হইতে কেহই আমাকে পরিত্রাণ করিলেন না। আমাকে ফাঁকি দিয়া সকলেই লাল-মুক্তা হইয়া বসিলেন। আপনিও কি তাহাই করিবেন?"

মুণ্ড উত্তর করিল,—"ডাকিনীর জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি ভাল একটি গল্প বল।"

আমি ভাবিলাম যে,—"পূর্বেই আমি স্থির করিয়াছি যে, ইহার শেষ

পর্যন্ত দেখিব। একান্তই যদি ডাকিনীর হাত হইতে নিষ্কৃতি না পাই, তাহা হইলে মায়ের এই খড়্গ দ্বারা আমার মুণ্ড কাটিয়া মায়ের চরণে অর্পণ করিব।"

এইরূপ ভাবিয়া মুণ্ডকে আমি বলিলাম,—"আপনার নিকট এবার আমি চমৎকার একটি গল্প বলিব। ইহা মদন ঘোষের গল্প। মদন ঘোষ নিজে এই গল্পটি বলিতেছেন।"

মুণ্ড বলিল,—"তবে শীঘ্র আরম্ভ করিয়া দাও।"

আমি মদন ঘোষের গল্প বলিতে আরম্ভ করিলাম।

মদন ঘোষের বদনে হাসি

প্রথম অধ্যায়

ভট্টাচার্য মহাশয়

আমি মদন ঘোষ। আমার বদনে আপনারা হাসি দেখিতেছেন। নূতন আমার বিবাহ হইয়াছে। সেই জন্য আমার মুখে এত হাসি। কিন্তু তা' বলিয়া আমি বে-পাগলা নই। তবে মনের মত পত্নীলাভ হইলে চিত্ত একটু প্রফুল্ল হয়। আমারও তাই হইয়াছে। তাই হাসিমুখে সকলকে আমি সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছি—"গুড্ মর্নিং!"

সরস্বতী দেবীকে পূজা করিয়া লোকে বিদ্যালাভ করে। সে বস্তু আমি কতটুকু লাভ করিয়াছি, তাহা এই গল্পটি পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। তাহা ব্যতীত আমি আর একটি বহুমূল্য রত্ন লাভ করিয়াছি। দেবীর কৃপায় আমি রাধারানীকে পাইয়াছি। রাধারানী আমার গৃহের একাধারে লক্ষ্মী-সরস্বতী।

কলিকাতায় যখন আমি স্কুলে পড়িতাম, তখন প্রতি বৎসর শ্রীপঞ্চমীর সময় আমি বাড়ি যাইতাম। বাড়ি আমাদের বর্ধমান জেলা,—সামান্য একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে। বাড়ি গিয়া ভক্তিভাবে দেবীকে

অঞ্জলি প্রদান করিতাম। বৈকাল বেলা মাঠে গিয়া দাঁড়াগুলি খেলিতাম।

যে বৎসর আমার প্রথম চাকরি হইল, সে-বৎসর শ্রীপঞ্চমীর সময় আমি দেশে যাইতে পারিলাম না। কলিকাতাতেই সে-বৎসর মায়ের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলাম। সেই সূত্রে আমি রাধারানীকে লাভ করিলাম।

সে বৎসর প্রাতঃকালে উঠিয়া, আমি আমার দোয়াতটিকে ভাল করিয়া ধুইলাম। পুরাতন নিবগুলি ফেলিয়া, কলমে নূতন নিব পরাইলাম। চারি পয়সা দিয়া সরস্বতী ঠাকুর কিনিয়া আনিলাম। ছোট একখানি চৌকির মাঝখানে ঠাকুরটিকে বসাইয়া, তাঁহার সম্মুখে ও দুই পার্শ্বে দোয়াত কলম ও পুস্তক সাজাইলাম। শুভ্রবর্ণের ফুল ও পূজার অন্যান্য উপকরণও আহরণ করিলাম।

এ সব আয়োজন করিলাম বটে, কিন্তু পুরোহিতের কি হইবে? কলিকাতায় আমি কখনও ক্রিয়াকর্ম করি নাই। সে নিমিত্ত পুরোহিতের প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু আজ—উপায়?

ভাবিতে ভাবিতে আমার বাসার দ্বারে গলিতে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমাদের বাসায় আর যত লোক আছেন, পূজা-পাঠের তাঁহারা ধার ধারেন না। নন্দী ভৃঙ্গীর সন্ধান বরং তাঁহারা জানেন; কিন্তু পুরোহিতের সন্ধান তাঁহারা কিছুই জানেন না। তাই মনে করিলাম যে, পথে যদি সাত্ত্বিক গোচের মানুষ দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাঁহাকে পুরোহিতের কথা জিজ্ঞাসা করিব।

ভাগ্যে আমার বাসার নিকট দুই তিনখানি খোলার বাড়ি ছিল, তাই আমাকে অধিকক্ষণ আর পথে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইল না। খোলাঘরের লক্ষ্মীগণের সরস্বতীর প্রতি বিদ্বেষ নাই। কার্তিক ঠাকুরের প্রতি তাঁহাদের যেরূপ ভক্তি, সরস্বতী ঠাকুরানীর প্রতিও তাঁহাদের সেইরূপ ভক্তি। মহাসমারোহের সহিত আজ তাঁহারা একখানি প্রতিমা খাড়া করিয়াছেন। প্রতিমার সম্মুখে বড় একখানি থালা রাখিয়াছেন, সেই থালে ঝমা-ঝম প্রণামী পড়িতেছে।

কলিকাতায় পূজা-করা ব্যবসাটি নিতান্ত মন্দ নহে। বড় পূজার সময় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অনেকে প্রণামী-স্বরূপ এত টাকা আদায় করেন যে, বারো মাস সুখে স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের সংসার চলিয়া যায়।

আমি গলির পথে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে নিকটের একখানি খোলার বাড়ি হইতে একজন ব্রাহ্মণ বাহির হইলেন। বর্ণ তাঁহার কালো নহে; শ্যামবর্ণ বলিলে যাহা বুঝায়, তাঁহার বর্ণ সেইরূপ ছিল। তাঁহার মুখে বসন্তের দাগ ছিল। কপালে তাঁহার সুদীর্ঘ একটি ফোঁটা ছিল; গায়ে একখানি নামাবলি ছিল। তিনি যে পুরোহিত, তাঁহাকে আর জিজ্ঞাসা করিতে হয় না।

ভক্তিভাবে আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। হাত তুলিয়া জয়-অস্তু বলিয়া তিনি আমাকে আশীর্বাদ করিলেন। আমার ঘরে গিয়া মায়ের পূজা করিতে তাঁহাকে আমি অনুরোধ করিলাম। আমার কথায় তিনি সম্মত হইলেন। তাঁহার পূজা ও আমার অঞ্জলি প্রদানের পর, আমি তাঁহাকে দক্ষিণা প্রদান করিলাম। আজ আমার মুখে হাসি দেখিয়া আপনারা কত কি মনে করিতেছেন, কিন্তু সে দিন তাঁহার প্রফুল্ল ডায়মনকাটা মুখখানি যদি দেখিতেন, তাহা হইলে বলিতেন যে, হাঁ! হাসি বটে! তাহার কারণ এই যে, দক্ষিণাটি কিছু আশাতিরিক্ত হইয়াছিল।

সেই প্রফুল্ল বদনে ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে বলিলেন,—"দেখ, বাপু! আজকালের ছোকরাদের মতি-গতি নিতান্ত মন্দ হইয়াছে। সব সাহেবি ধরন—সাহেবি মত। কিন্তু তুমি ছোকরা দেখিতেছি ভাল। ধর্মকর্মে তোমার মতি আছে। তোমার নাম কি বাপু?"

আমি উত্তর করিলাম,—"আমার নাম মদনমোহন ঘোষ। আমরা সদ্গোপ।"

ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন,—"বাঃ! চমৎকার নামটি। মদনমোহন! অতি সুন্দর নাম।"

আমার নামটি যে ভাল, জ্ঞান হইয়া পর্যন্ত তাহা আমি জানিতাম।

মনে মনে কত আমি আমার নামের গৌরব করিতাম। ভট্টাচার্য মহাশয়ও আজ সেই নামের প্রশংসা করিলেন। তাঁহার প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি হইল।

আমার নিবাস কোথায়, আমার পিতা-মাতা বর্তমান আছেন কি না, এইরূপ নানা প্রকার পরিচয় গ্রহণ করিয়া, ভট্টাচার্য মহাশয় সে দিন বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাহার পর মাঝে মাঝে তিনি আমার বাসায় পদধূলি প্রদান করিতেন। প্রণামী স্বরূপ টাকা-টা সিকি-টা দিয়া আমি তাঁহার সম্মান করিতাম। ক্রমে আমি জানিতে পারিলাম যে, পুরোহিতগিরি ব্যতীত তিনি ঘটকালী ব্যবসায়ও করিয়া থাকেন। সে নিমিত্ত আমার যে তখনও বিবাহ হয় নাই, কথায়-বার্তায় তাঁহাকে আমি জানাইলাম।

ভট্টাচার্য মহাশয় কিছু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন,—"এমন সুপাত্র! বিদ্বান্! চাকুরে! এখনও বিবাহ হয় নাই!"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। উত্তর আর কি করিব! প্রতিদিন আমি সাবান মাখিয়া স্নান করি। এখন আর আমার পাড়াগেঁয়ে চেহারা নাই। নানারূপ সুগন্ধযুক্ত তৈলে সিক্ত করিয়া, চুলগুলি ফিরাইতে প্রতিদিন আমি আধ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করি। আরসিতে যখন আমি আমার মুখ দেখি, তখন ভট্টাচার্য মহাশয় যাহা বলিলেন, আমিও তাহাই মনে মনে ভাবি। নিজের সুখ্যাতি নিজে করিতে নাই। কিন্তু আপনারা বরং আমার বন্ধু-বান্ধবকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন, সকলেই বলিবে যে, মদন একজন সুন্দর পুরুষ বটে। ফল কথা, আমার নাম মদন, আমি কাজেও মদন।

কিছু দিন পরে ভট্টাচার্য মহাশয় পুনরায় আমার বাসায় আগমন করিলেন। সে দিন আসিয়া বলিলেন,—"দেখ, আমি ব্রাহ্মণ কায়স্থের ঘটকালী করি; তোমাদের জাতির ঘটকালী কখন করি নাই। কিন্তু যে স্থানে আমার বাসা, তাহার ভিতর-বাটী—এক প্রবীণ ভদ্র লোক ভাড়া লইয়াছেন। তিনি তোমাদের জাতি; উপাধি পাল। পাল মহাশয়কে সঙ্গতিপন্ন লোক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার নিবাস

শুনিয়াছি, হুগলী জেলায় কোন স্থানে। তাঁহার এক বয়স্কা কন্যা আছে। কন্যাটির বয়ঃক্রম বারো কি তেরো হইবে। তোমাদের জাতিতে এত বড় কন্যা থাকে না। কিন্তু তাহার কারণ আমি কতকটা পাইয়াছি। আমি যে বাড়িতে থাকি, সেই বাড়ির নীচের তলায় একটি ঘরে তোমাদের জাতীয় আর এক ব্যক্তি বাস করেন। তাঁহারও নিবাস হুগলী জেলায়। সকলে তাঁহাকে নিয়োগী মহাশয় বলিয়া ডাকে। তাঁহার পুত্র পীড়িত হইয়াছে। চিকিৎসার নিমিত্ত তাহাকে তিনি কলিকাতায় আনিয়াছেন। আমি শুনিয়াছি যে, এই পুত্রের সহিত পাল মহাশয়ের কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। তাহার পীড়াবশতঃ এখনও বিবাহ হয় নাই। আমার বোধ হয়,এ বিবাহ কখন হইবেও না ; কারণ, নিয়োগী মহাশয়ের পুত্র কাসরোগে আক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও সকলে তাহার আরোগ্য-লাভের আশা করিতেছে। সে জন্য পাল মহাশয়ের নিকট এখন আমি তোমার কথা উত্থাপন করিতে পারি না। কিন্তু তুমি এক কাজ কর। তুমি গিয়া পাল মহাশয়ের সহিত আলাপ-পরিচয় কর। তাহা করিতে পারিলে, যথা সময়ে এ কাজের অনেক সুবিধা হইবে।”

দ্বিতীয় অধ্যায়

গোঁফ ছাটা বিভীষণ

বিবাহের কথা শুনিয়া প্রাণ আমার উল্লাসে পরিপূর্ণ হইল। কারণ, আমার নাম মদন। প্রাণের কথা আমি খুলিয়া বলিতেছি, সে জন্য আমাকে আপনারা পাগল মনে করিবেন না। বিবাহের সময় আপনাদের বোধ হয়, এইরূপ আনন্দ হইয়া থাকিবে। তবে আপনারা প্রকাশ করেন না, এই যা।

আমি ভট্টাচার্য মহাশয়কে বলিলাম,—“পাল মহাশয় প্রবীণ, সঙ্গতিপন্ন, আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাঁহার সহিত আমি কিরূপে আলাপ-পরিচয় করিব ?”

ভট্টাচার্য মহাশয় উত্তর করিলেন,—তুমি এক কাজ কর। আমাদের

বাড়িতে তুমি একটি ঘর ভাড়া করিয়া সেই স্থানে বাস কর। দোতালার অন্দর মহলের দিকে, ঠিক পাল মহাশয়ের ঘরের পার্শ্বে, একটি ঘর খালি আছে। তুমি সেই ঘরটি ভাড়া লও। এক বাড়িতে বাস করিতে করিতে ক্রমে পাল মহাশয়ের সহিত আলাপ-পরিচয় হইবে।"

প্রাতঃকালে ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহিত আমার এইরূপ কথাবার্তা হইল। আফিস হইতে আসিয়া সেই দিন সন্ধ্যাবেলা আমি তাঁহার বাসায় গমন করিলাম। যে বাড়িতে তিনি থাকেন, সেই বাড়িটি আমি দেখিলাম। ইহা দক্ষিণ-দ্বারী চক্-মিলান দোতালা বাড়ি। সম্মুখেই [illegible] দালান, তাহাতে এক জন স্বর্ণকার কাজ করে। বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া, একতালার দক্ষিণদিকে যে ঘরটি, তাহাতে ভট্টাচার্য মহাশয় বাস করেন। বামদিকের ঘরটিতে এক জন উৎকলবাসীর মুড়িমুড়কির ও তেলে-ভাজা কচুরির দোকান। পূর্বদিকে একখানি ঘরে পীড়িত পুত্র লইয়া নিয়োগী মহাশয় আছেন। একতালায় পশ্চিম দিকে একখানি ঘরে এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ থাকেন। তাঁহার কি মোকর্দমা আছে। সেই মোকর্দমার কথা একবার জিজ্ঞাসা করিলে আর রক্ষা নাই। দুই ঘণ্টা ধরিয়া তোমাকে তিনি সেই পরিচয় প্রদান করিবেন। তুমি তখন মনে করিবে যে, এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কি কুকর্ম করিয়াছি। বাহির-বাটীর উপরের ঘরগুলিতে অফিসের বাবুদের বাসা। কোনও ঘরে এক-জন, কোনও ঘরে দুই জন, কোনও ঘরে বা তিন চারি জন বাবু বাস করেন। নীচের তালার অবশিষ্ট ঘরগুলিতে তাঁহাদের রন্ধন হয়। উপরের একটি ঘরে এক জন সামান্য গোছের দালাল থাকেন। কেশব সেন জীবিত থাকিতে তিনি ঘোরতর ব্রাহ্ম ছিলেন। মাঘোৎসবের সময় তিনি পথে নিশান ধরিয়া যাইতেন। এখন পুনরায় তিনি হিন্দু হইয়াছেন। এখন আর তিনি মুরগী ভক্ষণ করেন না। ভিতর-বাড়িতে দোতালার পশ্চিম দিকে সারি সারি যে তিনটি ঘর আছে, তাহা ব্যতীত অন্দর মহলে এখন আর অন্য বাসে াপযোগী ঘর নাই। বাড়িটি পুরাতন ও ভগ্ন। ভিতর-বাটীর বাকি সমুদয় ঘর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পশ্চিমদিকে বাসোপযোগী সেই তিনটি

ঘরে পাল মহাশয় একেলা সপরিবারে বাস করেন। তাঁহার পরিবার অধিক নহে, কেবল স্ত্রী ও সেই কন্যা। ভিতর বাড়ির দোতালায় যে ঘরে পাল মহাশয় নিজে থাকেন, ঠিক তাহার পার্শ্বে বাহির-বাটীতে একটি ঘর খালি আছে। সেই ঘ টি ভাড়া লইবার জন্য ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমার ঘরের সম্মুখে বারেণ্ডা আছে। সেই বাবেণ্ডা বরাবর পাল মহাশয়ের ঘরের সম্মুখ দিয়া ভিতর-বাটীতে চলিয়া গিয়াছে। ভিতর-বাটি ও বাহির-বাটীর মাঝে এই বারেণ্ডায় একটি দ্বার আছে। এই দ্বার দিয়া বাহির-বাটী হইতে ভিতর-বাটীতে যাইতে পারা যায়। কিন্তু এখন ইহা সর্বদা ভিতরে খিল ও বাহিরে শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ থাকে। বাড়ির দক্ষিণে প্রশস্ত রাজপথ, পশ্চিমে একটি গলি। গৃহস্বামীর অবস্থা এক্ষণে মন্দ। সে জন্য বাড়ি ভাড়া দিয়া কাশীতে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। বাড়ীটি ভট্টাচার্য মহাশয়ের জিম্মায় আছে। ভাড়া আদায় করিয়া প্রতি মাসে তিনি তাহা গৃহস্বামীর নিকট প্রেরণ করেন। সে জন্য ভট্টাচার্য মহাশয় যে ঘরে থাকেন, তাহার ভাড়া তাঁহাকে দিতে হয় না। বাড়ীর অবস্থা ভালরূপ অবগত হওয়া আবশ্যক। সে নিমিত্ত আমি এই বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিলাম।

ভট্টাচার্য মহাশয়ের পরামর্শ অনুসারে আমি উপরের সেই ঘরটি ভাড়া লইয়া, তাহাতে বাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল, পাল মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ-পরিচয় হইল না; তাঁহার কন্যাকেও আমি দেখিতে পাইলাম না। আমার ঘরটি ভিতর-বাটীর ঠিক নিকটেই ছিল, সে জন্য কখন কখন তাহার কণ্ঠস্বর ও মলের শব্দ শুনিতে পাইতাম। পাল মহাশয় বাড়ীর ভিতর হইতে বড় বাহির হইতেন না; অন্ততঃ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় আমি যখন বাড়িতে থাকিতাম, তখন তাঁহাকে বড় বাহিরে আসিতে দেখিতাম না। দুই দিন কেবল ক্ষণকালের নিমিত্ত আমি তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। একখানি পুস্তক হাতে লইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া তিনি কোথায় গমন করিতেছিলেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের অধিক হইবে। তাঁহার মুখ

দেখিলে তাঁহার প্রতি ভক্তি হয়; কিন্তু মুখখানি অতিশয় বিষণ্ণ। তিনি যেন ঘোর দুঃখে সর্বদাই নিমগ্ন আছেন। হাতে পুস্তক দেখিয়া বুঝিলাম যে, তিনি লেখা-পড়া জানেন। সেই বিষণ্ণবদনে লক্ষ্মীশ্রী দেখিয়া আমি ভাবিলাম যে, যদি কপালে থাকে, তাহা হইলে এ লোকের আমি জামাতা হইব।

কিন্তু আর এক জনের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া আছে। সে কিরূপ, তাহা আমাকে দেখিতে হইবে। কিন্তু তাহার পিতা অর্থাৎ নিয়োগী মহাশয়ের ভাব দেখিয়া আমার ভয় হইতে লাগিল। নিয়োগী মহাশয়ের মুখখানি অনেকটা বিভীষণের মত। মুখের দুই পাশে দুই গাল যেন দম্ভ করিয়া আগে বাড়িতেছে। তাহার মাঝখানে আধ-পাকা আধ-কাঁচা ছাঁটা গোঁফগুলি সব খোঁচা খোঁচা হইয়া আছে। তাঁহাকে দেখিয়া আমি মনে করিলাম যে, লোকে যে গোঁফ-ছাঁটা বদমায়েশের কথা বলে, ইনি একজন তাই। সে যাহা হউক, আমি অনেক কৌশল করিয়া তাঁহার পুত্রের সহিত আলাপ করিলাম। তাঁহার পুত্রের মুখমণ্ডলে সুলক্ষণ আমি কিছু দেখিলাম না। পিতার বদমায়েশি ভাব যেন পুত্রের মুখেও প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু রোগে এখন তাহার শরীর জীর্ণ হইয়াছে, মুখ তাহার শুষ্ক ও মলিন হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় তাহার জন্য আমার মনে দুঃখ হওয়া উচিত; কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, তাহা আমার হয় নাই। তাহার প্রতি বরং আমার হিংসা হইল। আমি এমন সুন্দর পুরুষ,—যাহাকে মনে মনে পত্নীরূপে বরণ করিয়াছি, সে এই মর্কটের হাতে পড়িলেও পড়িতে পারে, সে চিন্তা আমার অসহ্য হইয়া উঠিল। সত্য বটে, সেই সুন্দরীকে আমি এখনও চক্ষেও দেখি নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়! তাহার পায়ের চারি-গাছি মলের রুণু রুণু শব্দ সর্বদাই যে আমার কানে লাগিয়া আছে। অফিসে চাবি খোলার শব্দ হয়, আর আমার প্রাণটা ধড়াশ করিয়া উঠে; আমি ভাবি, এ বুঝি আমার হৃদয়-আসীনা আমার প্রাণদেবীর পদনিঃসৃত সেই কিঙ্কিণী শব্দ। তাহাকে আমি দেখি নাই সত্য; কিন্তু

ভট্টাচার্য মহাশয়ের বিবরণ অবলম্বন করিয়া আমার মানসক্ষেত্রে তাহার চিত্র আঁকিয়া লইয়াছিলাম।

নিয়োগী-পুত্রের পীড়া সঙ্কট; সর্বদাই সে ঘরের ভিতর শুইয়া থাকে; উঠিয়া বেড়াইবার শক্তি বড় নাই; তথাপি সে মাঝে মাঝে বাটীর ভিতর গিয়া পাল মহাশয়ের পরিবারবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করে। পাল মহাশয়ের সহিত নিয়োগী মহাশয়ের বহুদিন ধরিয়া আলাপ-পরিচয় আছে। শুনিলাম যে, দেশে ভূমিসম্পত্তি লইয়া একবার পাল মহাশয়ের কি মকর্দমা হইয়াছিল। তাহাতে জাল করিয়া ও মিথ্যা সাক্ষীর যোগাড় করিয়া নিয়োগী মহাশয় তাঁহার অনেক উপকার করিয়াছিলেন। সেই অবধি দুই পরিবারে বিলক্ষণ সদ্ভাব জন্মিয়াছিল। এই সব কথা শুনিয়া মাঝে মাঝে আমি নিরাশ হইয়া ভাবিতাম যে, কে হে তুমি মদন ঘোষ। যে পাল মহাশয়ের কন্যার প্রতি কটাক্ষ কর? তবে আশা এই যে, নিয়োগী মহাশয়ের পুত্র বোধ হয়, এ যাত্রা রক্ষা পাইবে না। সে যাহা হউক, আমি সেই পীড়িত যুবকের নিকট মাঝে মাঝে বসিয়া তাহার সহিত গল্প করিতাম। গল্পচ্ছলে পাল মহাশয়ের কথা, তাঁহার পরিবারের কথা, তাঁহার কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। নিয়োগী-পুত্র ভাল করিয়া আমাকে পরিচয় প্রদান করিত না। কথার ছলে আমার সন্দেহ হইল যে, পাল মহাশয়ের সংসারে কোনরূপ একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। সে কথা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার নহে। ইতিপূর্বে বন্ধু-বান্ধব ও কুটুম্বদিগের দ্বারা আমি পাল মহাশয়ের বংশ-পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই সময় কে এক জন আমাকে বলিয়াছিল যে, পাল মহাশয়ের এক পুত্র আছে। সে পুত্র এখন কোথায়? সে কথার কোন সন্ধান আমি পাইলাম না। নিয়োগী-পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলে. সে আমার উপর রাগিয়া উঠে।

তৃতীয় অধ্যায়

রাক্ষস না ভূত !

এইরূপে কিছুদিন গত হইল। পাল মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় হইল না। ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহিত সর্বদা আমি সাক্ষাৎ করিতাম। তিনি বলিতেন,—"ব্যস্ত হইও না। নিয়োগী-পুত্রের জীবনের আশা থাকিতে তোমার কোন আশা নাই। অপেক্ষা কর, দেখা যাউক, কি হয়।"

আমাদের বাড়ির সম্মুখে রাস্তার অপরপারে একখানি মুদির দোকান আছে। একদিন রবিবার বৈকাল বেলা দেখিলাম যে, পাল মহাশয় সেই দোকানে বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখ সেইরূপ বিষণ্ণ ও চিন্তায় আচ্ছন্ন। একখানি পুস্তক তিনি পাঠ করিতেছিলেন ও কদাচ কখন কখন এক একবার মুখ তুলিয়া কাহারও সহিত দুই একটি কথা কহিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমি দোকানে প্রবেশ করিয়া যে তক্তপোষের উপর তিনি বসিয়া ছিলেন, তাহার এক পার্শ্বে উপবেশন করিলাম। কোন দ্রব্য আমার প্রয়োজন আছে কি না, মুদি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম,—"না।" তক্তপোষের উপর আরও তিন ব্যক্তি বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। পাল মহাশয়ের ন্যায় তাঁহারাও প্রবীণ। তাঁহাদের মধ্যে কেহ আমাকে কোন কথা বলিলেন না। পাল মহাশয় পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া আমার দিকে একবার চাহিয়াও দেখিলেন না। আমি যুবক ; সামান্য একটা ছোঁড়া বলিলেও হয় ; আর তাঁহারা সকলেই প্রবীণ। তাঁহাদের সহিত প্রথম কথা কহিতে আমি সাহস করিলাম না। তাঁহারা, প্রথম আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন, সেই প্রত্যাশায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসিয়া রহিলাম ; কিন্তু আমার সহিত কেহ একটিও কথা কহিলেন না। নিরাশ হইয়া সে স্থান হইতে আমি প্রস্থান করিলাম। কিন্তু পাল মহাশয় এক মনে

কি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়াছিলাম। তিনি কালীসিঙ্গীর মহাভারতের শান্তি পর্ব পাঠ করিতেছিলেন।

সেই দিনই আমি সেই পুস্তক ক্রয় করিলাম; আর সেই রাত্রি হইতে তাহা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে লাগিলাম। ভিতর-বাড়িতে পাল মহাশয়ের ঘর, আর বাহির-বাড়িতে আমার, দুইয়ের মাঝখানে কেবল একটি প্রাচীর ব্যবধান ছিল। আমি মনে করিলাম যে, আমার মহাভারত পাঠের শব্দ প্রাচীর পার হইয়া, পাল মহাশয়ের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে। তাহা হইলে আমার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা হইবে। কিন্তু ঠিক বিপরীত ফল হইল। আমার ঘরের সম্মুখে বারেণ্ডা আছে; আর সেই বারেণ্ডার উত্তর-সীমায় বাড়ির ভিতর যাইবার জন্য দ্বার আছে। সর্বদা বন্ধ থাকে। একদিন রাত্রিকালে আমি যথারীতি উচ্চৈঃস্বরে মহাভারত পাঠ করিতেছি, এমন সময় বাড়ির ভিতর দিক হইতে সেই দ্বারে কে ধাক্কা মারিতে লাগিল। মহাভারত পাঠে আমার মন তখন নিমগ্ন ছিল, সুতরাং সে শব্দ প্রথম আমি শুনিতে পাই নাই। ক্রমে ধাক্কার শব্দ বৃদ্ধি হইয়া যখন আমার কণ্ঠ-শব্দকে পরাজয় করিল, তখন সে শব্দ আমি শুনিতে পাইলাম।

তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া সেই দ্বারের নিকট গিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে গা! কে শব্দ করিতেছে!" ভিতর হইতে পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—"একটু ধীরে ধীরে যদি বাপু তুমি পুস্তক পাঠ কর, তাহা হইলে এ বাড়িতে আমি তিষ্ঠিতে পারি, তা না হইলে আমাকে অন্যত্র পলায়ন করিতে হইবে।"

ঘোরতর অপ্রতিভ হইয়া আস্তে আস্তে পড়িবার নিমিত্ত আমি তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিলাম। অঙ্গীকার করিয়া সে রাত্রিতে যখন লজ্জায় ও ঘৃণায় অভিভূত হইয়া পুনরায় আমি আমার ঘরে প্রবেশ করিলাম, তখন যদি আপনারা আমাকে দেখিতেন, তাহা হইলে এই মদনের বদনে আপনারা বিন্দুমাত্রও হাসি পাইতেন না। রাগ করিয়া আমি মহাভারত দূরে নিক্ষেপ করিলাম। সেই দিন হইতে আর সে পুস্তক আমি স্পর্শ করিলাম না।

পাল মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ-পরিচয় হইল না। বরং মহাভারত পাঠের নিমিত্ত তাঁহার নিকট আমি লাঞ্ছিত হইলাম। গোঁফ ছাটা নিয়োগী মহাশয় বক্ষঃস্থল স্ফীত করিয়া দম্ভের সহিত বিচরণ করেন। তাঁহাকে দেখিলে আমার সর্বশরীর জ্বলিয়া যায়। ডাক্তারগণ আসিয়া তাঁহার পুত্রকে পনর দিনের মধ্যে ভাল করিয়া দিবেন বলিয়া আস্ফালন করেন। কিন্তু তাহার কাসি যায় না, জ্বরও কমে না, শরীরে সে বলও পায় না। ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে ক্রমাগত আশ্বাস প্রদান করেন। তাঁহার কৃপা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। এই ভাবে আরও কিছু দিন কাটিয়া গেল।

ক্রমে চৈত্র মাস পড়িল। তখন নূতন গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। রাত্রিতে সহসা আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তাহার পর পুনরায় নিদ্রা যাইবার নিমিত্ত অনেকক্ষণ চেষ্টা করিলাম; কিছুতেই আর নিদ্রার আবেশ হইল না। শয্যা হইতে উঠিয়া আমি আলো জ্বালাইয়া ঘড়িতে দেখিলাম যে, একটা বাজিয়া গিয়াছে। আমার ঘরের পশ্চিম দিকে দুইটি জানালা ছিল। তাহার একটি জানালা খুলিয়া দাঁড়াইলাম। আমার ঘরের নিম্নেই গলি পথ। গলির ভিতর পাল মহাশয়ের দিকে দূরে একটি গ্যাসের আলো। গলির ওপারে অন্যান্য লোকের বাড়ি। আমরা যে বাড়িতে থাকি, তাহার উত্তরে একটি অশ্বত্থ গাছ ছিল। তাহার নিম্নে ষষ্ঠী ঠাকুরের অনেকগুলি নোড়া-নুড়ি ছিল। সেই অশ্বত্থ গাছের ডাল, পাল মহাশয়ের তিনটি ঘরের মধ্যে দুইটি ঘরের ঠিক গায়ে লাগিয়াছিল।

জানালার দিকে দাঁড়াইয়া সহসা আমার সেই গাছের দিকে একবার দৃষ্টি পড়িল। সর্বনাশ! সেই গাছের উপর, নিবিড় শাখা-প্রশাখা ও পত্রের ভিতর হইতে বাহির হইয়া, কি একটা জন্তুর মত সেই স্থূল ডালটির উপর আসিয়া বসিল। তাহার পর ধীরে ধীরে সেই বৃক্ষ-শাখার উপর দিয়া সে পাল মহাশয়ের দ্বিতীয় ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। একটু দূরে গ্যাসের আলোক ছিল, তাই আমি তাহাকে দেখিতে পাইলাম; নতুবা সে অন্ধকার রাত্রিতে আমি তাহাকে দেখিতে

পাইতাম না। যখন সে আরও অগ্রসর হইল, তখন আমি দেখিলাম যে, সে কোনরূপ জন্তু নহে। তাহার আকৃতি কতকটা মানুষের মত। মানুষের মত বটে ; অথচ তাহাকে মানুষ বলিয়া আমার বোধ হইল না। ঘোড়ার মত তাহার মুখ লম্বা ছিল। মুখের বর্ণ সবুজ। বন্য শূকরের ন্যায় বড় বড় দাঁত। যে স্থানে চক্ষু থাকে, তাহার সেই স্থানে গোল গোল দুইটি গর্ত ছিল। শরীরের নিম্নভাগ মানুষের মত ছিল। কিন্তু সে মানুষ নহে, ভূতও নহে। আমি ভাবিলাম যে, যখন ইহার সবুজ কপালের উপর রক্তচন্দনের দীর্ঘ ফোঁটা রহিয়াছে, তখন এ নিশ্চয়ই রাক্ষস। আর, তাহার কি দাড়ি! ঘোর কৃষ্ণবর্ণের এমন চাঁপদাড়ি তো কখনও দেখি নাই! গোঁফে ও দাড়িতে তাহার সেই সবুজ লম্বা মুখ-মণ্ডলের অধোদেশটি আবৃত হইয়াছিল। ভয়ে আমি বিহ্বল হইয়া পড়িলাম, আতঙ্কে স্তম্ভিত হইয়া আমি আর জানালা বন্ধ করিয়া দিতে পারিলাম না, সে স্থান হইতে পলাইতেও পারিলাম না, কি চীৎকার করিতেও পারিলাম না!

আরও অদ্ভুত কথা। সেই রাক্ষসটা ক্রমে অগ্রসর হইয়া পাল মহাশয়ের দ্বিতীয় অর্থাৎ মাঝের ঘরের জানালার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর সেই জানালাতে সে অঙ্গুলি দ্বারা টোকা মারিয়া ইঙ্গিত করিতে লাগিল। এইরূপ কিছুক্ষণ অতি ধীরে ধীরে জানালায় শব্দ করিবার পর ভিতর হইতে কে জানালা উদ্ঘাটন করিল, গ্যাসের আলোকে নিমিষের নিমিত্ত আমি তাহার হস্তটি দেখিতে পাইলাম। সেই হাতে সোনার বালা ছিল। মৃণাল সদৃশ সেই কোমল বাহু,—পাল মহাশয়ের বয়স্ক গৃহিণীর নহে, সে হস্ত তাঁহার কন্যার। সবুজ রাক্ষসের সহিত পাল মহাশয়ের কন্যার সম্বন্ধ!

চতুর্থ অধ্যায়

সবুজ রাক্ষস

জানালার ধারে অশ্বথ ডালের উপর রাক্ষস বসিয়া রহিল। তাহার আকৃতি দেখিয়া আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল। ভয়ে আমি কাঁপিতে লাগিলাম। আমার চিন্তাশক্তি একেবারে লোপ পাইয়া গেল। একদৃষ্টে আমি তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

পাল মহাশয়ের কন্যা প্রথম জানালাটি উদঘাটন করিল। তাহার পর আমি শব্দে বুঝিলাম যে, জানালার দুইটি রেল খুলিয়া সে ভিতর দিকে টানিয়া লইল। রেল তুলিয়া রাক্ষসের জন্য সে পথ করিয়া দিল। রাক্ষস জানালা দিয়া, ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

রাক্ষস যেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল, আর সেই সময়ে আমার একটু জ্ঞানের উদয় হইল। তাড়াতাড়ি আমি আমার জানালাটি বন্ধ করিয়া দিলাম। জানালা বন্ধ করিয়া আমার আরও একটু সাহস হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আর একটি ভয়ের বিষয় আমার মনে উদয় হইল। আমার ঘরের পর পাল মহাশয়ের ঘর; তাহার পর যে ঘর, সেই ঘরে রাক্ষস প্রবেশ করিয়াছে। দূর অধিক নহে, ভিতর ও বাহির-বাটীর মাঝখানে বারেণ্ডায় সেই একমাত্র দ্বার। সেই পথে আসিয়া রাক্ষস যদি আমাকে খাইয়া যায়? পাল মহাশয়ের কন্যার সহিত তাহার প্রণয়, কারণ, তাহার ইঙ্গিত শ্রবণ মাত্র জানালা খুলিয়া রেল তুলিয়া, কত কষ্ট করিয়া, তাহাকে সে ঘরে আসিতে দিয়াছে। নিজের প্রণয়িনীকে সে ভক্ষণ করিবে না। প্রণয়িনীর পিতামাতাকেও সে ভক্ষণ করিবে না। থাকিবার মধ্যে নিকটে আছি আমি। যদি সে বলিয়া বসে যে, আমার ক্ষুধা পাইয়াছে, কিছু জলযোগ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে, আর তাহাকে পরিতুষ্ট করিবার নিমিত্ত যদি পাল মহাশয়ের কন্যা আমাকে দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে আমি কি করিব?

বিবাহের লোভে কেন যে এ স্থানে মরিতে আসিয়াছিলাম! একবার মনে করিলাম যে, সে বাটী হইতে পলায়ন করি। আর একবার মনে করিলাম যে, চীৎকার করিয়া পাঁচজনকে আহ্বান করি। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম যে, কাজ নাই বাপু! আর দ্বার খুলিবার শব্দ পাইয়া রাক্ষস হয়ত কুপিত হইতে পারে। রাক্ষসের কোপে পড়িয়া শেষে কি প্রাণটা হারাইব। আজ হয়, দুই দিন পরে হয়, সুবিধা পাইলেই সে আমাকে খাইয়া ফেলিবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া বিছানায় আমি শুইয়া পড়িলাম। শয়ন করিয়া পাল মহাশয়ের কন্যার কথা ভাবিতে লাগিলাম। এই বালিকা বয়সে রাক্ষসের সহিত প্রণয়! ছি! ভাল কন্যাকে বিবাহ করিতে আমার মন-প্রাণ এত আকুল হইয়াছিল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। ইহার পর কি হইল, আর আমি কিছুই জানি না।

পরদিন প্রাতঃকালে, দিনের আলোকে আমার অনেকটা সাহস হইল। গত রাত্রির ঘটনা বার বার চিন্তা করিতে লাগিলাম। একবার মনে করিলাম, সে সমুদয় মিথ্যা, স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু ভালরূপে অনুধাবন করিয়া অবশেষে বুঝিলাম যে, না, সে স্বপ্ন নহে; সত্য সত্যই আমি এক অপূর্ব জীব দর্শন করিয়াছিলাম; সে জীব রাক্ষস হউক, আর ভূতই হউক, আর যাহাই হউক। গত রাত্রিতে মনে করিয়াছিলাম যে, এ বাটীতে আর থাকিব না, অন্য স্থানে গিয়া বাস করিব। কিন্তু প্রাতঃকালে সে কল্পনা পরিত্যাগ করিলাম। মনে করিলাম যে, ইহার সবিশেষ তত্ত্ব আমাকে লইতে হইবে।

পাল মহাশয়ের বালিকা কন্যা যে সেই কিম্ভূতকিমাকার সবুজ রাক্ষসের প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছে, এ কথা বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। তাহা ব্যতীত সহসা বাটী পরিত্যাগ করিয়া অন্য বাটীতে বাসা করিলে পাছে রাক্ষসের কোপে আমি পতিত হই, সে আশঙ্কাও আমার মন হইতে দূর হয় নাই।

আমি ভট্টাচার্য মহাশয়ের ঘরে গমন করিলাম। তাঁহাকে একেলা

পাইয়া গত রাত্রির সমস্ত বিবরণ তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলাম। তাঁহার ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া, তাঁহাকে আমি এই বিবরণ প্রদান করিতেছিলাম। আমার কথা প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে চক্ষু টিপিলেন। তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আমি ঘরের দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, দ্বারের নিকট একটু অন্তরালে দাঁড়াইয়া গোঁফ-ছাটা নিয়োগী সমুদয় কথা শুনিতেছে। আমি যেই ফিরিয়া চাহিলাম, তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে সে প্রস্থান করিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন —"নিয়োগী ভাল মানুষ নহে। পাল মহাশয়ের এ বন্ধু, কুটুম্ব ও হবুবৈবাহিক। তোমার কথা এ শুনিয়া ফেলিল। কাজটা বড় ভাল হইল না।"

তাহার পর ভট্টাচার্য মহাশয় পুনরায় বলিলেন,—"বড়ই আশ্চর্য কথা তুমি বলিলে। যাহা বলিলে, তাহা সত্য কি স্বপ্ন, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু যখন তাহার বড় বড় দাঁত, চক্ষু স্থানে কেবল কোটর, রং সবুজ, আর কপালে লাল ফোঁটা, তখন সে নিশ্চয় রাক্ষস, সামান্য ভূত নহে। আমাদের গ্রামের নিকট একবার এইরূপ একটা রাক্ষস আসিয়াছিল।"

পঞ্চম অধ্যায়

হারাণ স্থরের গল্প

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হইয়াছিল?"

ভট্টাচার্য মহাশয় উত্তর করিলেন,—সে তোমাদের জাতি। তাহার নাম ছিল হারাণ স্থর। লোকালয় হইতে কিছু দূরে গ্রামের প্রান্তভাগে মাঠের ধারে হারাণ স্থর আপনার স্ত্রী ও দুইটি শিশু-পুত্র লইয়া বাস করিত। হারাণ স্থরের পীড়া হইল। কিছু দিন পীড়া ভোগ করিয়া এক দিন রাত্রিতে তাহার মৃত্যু হইল। শিশু দুইটিকে ছাড়িয়া লোক ডাকিবার নিমিত্ত, তাহার স্ত্রী সে রাত্রি বাহির হইতে সাহস করিল না। শিশু দুইটিকে লইয়া স্বতন্ত্র একটি শয্যাতে শয়ন করিয়া, সে কাঁদিতে লাগিল।

যখন ঘোর রাত্রি হইল, তখন কে এক জন বাহিরে আসিয়া ঘরের আগড় ঠেলিতে লাগিল,—'মাসি! আগড় খুলিয়া দাও।' হারাণের স্ত্রী মনে করিল যে, আমার বোনপো তো কেহ নাই ; এ ঘোর রাত্রিতে বিপদের সময় কে আসিয়া ডাকাডাকি করে। সে জন্য প্রথম উত্তর দিল না। কিন্তু বাহিরের সে ব্যক্তি পুনরায় সবলে আগড় ঠেলিয়া বলিল,—শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দাও, মাসি! মেসো মহাশয়ের পীড়ার কথা শুনিয়া আমি আসিয়াছি। শীঘ্র আগড় খুলিয়া দাও।"—হারাধনের স্ত্রী ভাবিল যে, —দূরসম্পর্কীয় তাহার কোন ভগিনী থাকিতে পারে। কর্তা হয় তো তাহার পুত্রের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে জন্য সে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ মনে করিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে সে শয্যা হইতে উঠিয়া আগড় খুলিয়া দিল। সেই মুহূর্তে ভয়ঙ্কর এক মূর্তি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। ঘরে মিট মিট করিয়া একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। সেই আলোকে হারাণের পত্নী সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখিতে পাইল। তাহার বর্ণ সবুজ, তাহার মুখ ও পেট যেন এক একটি জালা। তাহারও কপালে ফোঁটা ছিল! সেই জন্য আমার বোধ হয় যে তুমি কাল রাত্রিতে যাহাকে দেখিয়াছিলে, সেও রাক্ষস—ভূত নহে। কারণ, ভূতে ফোঁটা কাটে না, আর তাহাদের রং সবুজ হয় না।"

এত দূর বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় চুপ করিলেন। অতি আগ্রহের সহিত আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"হারাণ সুরের ঘরে তাহার পর রাক্ষস কি করিল?"

ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন,—"সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখিয়া, হারাণ সুরের পত্নীর প্রাণ উড়িয়া গেল! তাড়াতাড়ি সে ছেলে দুইটির নিকটে গিয়া তাহাদের মাঝখানে শয়ন করিল। ভাগ্যে শীতকাল ; সে জন্য বিছানায় বড় একখানি কাঁথা ছিল। সেই কাঁথা দিয়া ছেলে দুইটিকে সে ঢাকা দিল! নিজেও কাঁথা মুড়ি দিয়া কাঁদিতে ও কাঁপিতে লাগিল।

"রাক্ষস কিন্তু তাহাদিগকে কিছু বলিল না। ঘরের অপর পার্শ্বে যে স্থানে একটি মাদুরের উপর হারাণ সুরের মৃতদেহ পড়িয়া ছিল, রাক্ষস

বরাবর সেই স্থানে গিয়া মাদুরের উপরে উপবেশন করিল। তাহার পর মড়াৎ করিয়া হারাণের একটি হাত ভাঙ্গিয়া কড়মড় শব্দে চিবাইতে লাগিল। সে হাতটি সমাপ্ত হইলে পুনরায় আর একটি হাত ভাঙ্গিয়া সেইরূপ ভক্ষণ করিল। হাত দুইটি শেষ হইলে একটি পা ভাঙ্গিয়া খাইতে লাগিল। ঘরের ভিতর ক্রমাগত চপ্-চপ-চপ্ চপ কড়্-মড়্, কড়্-মড়্ শব্দ হইতে লাগিল। সেই শব্দে শিশু দুইটির নিদ্রাভঙ্গ লইল। গা টিপিয়া মাতা তাহাদিগকে কাঁদিতে নিষেধ করিল। কাঁদিবে কি, চীৎকার করিবে কি, তোমার মত তাহারাও ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। ভয়ে জড়সড় হইয়া কাঁথার ফাঁক দিয়া তিন জনে এই ভীষণ ও বীভৎস ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিল। হারাণের স্ত্রী ভাবিতে লাগিল যে,—স্বামীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাক্ষস যেরূপ দ্রুত ভক্ষণ করিতেছে তাহাতে আর অল্পক্ষণের মধ্যেই সে সমুদয় শরীরটা খাইয়া শেষ করিবে। ইহার পেটটি যেরূপ জালার মত দেখিতেছি, তাহাতে একটি দেহ খাইয়া ইহার পেট ভরিবে না। তখন আমাদের তিন জনকেই হয় তো খাইয়া ফেলিবে। নিজের যাহা হউক, শিশু দুইটিকে যে সে ভক্ষণ করিবে, প্রাণ থাকিতে তাহা তো আমি দেখিতে পারিব না। এইরূপ চিন্তা করিয়া হারাণের স্ত্রী গা টিপিয়া শিশু দুইটিকে উঠিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিল। তাহারা উঠিয়া বসিল। তখন সে ছেলে দুইটির হাত ধরিয়া ঘর হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল। আগড়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এমন সময় রাক্ষসের দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িল। চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া, দন্ত কড়মড় করিয়া অতি কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—'কোথা যাস?'—হারাণের পত্নী সভয়ে অতি বিনীত ভাবে উত্তর করিল,—'কোথাও যাই নি, বাবা, ছেলে দুইটি এখনি বিছানা ভিজাইয়া দিবে, সে জন্য তাহাদিগকে একবার বাহিরে লইয়া যাইতেছি।—রাক্ষস বলিল,—শীঘ্র আসিস!'—হারাণের পত্নী বলিল,—'হাঁ, বাবা, শীঘ্র আসিব।'—এই কথা বলিয়া আগড় খুলিয়া ছেলে দুইটিকে লইয়া, সে ঘর হইতে বাহির হইল। ঊর্দ্ধশ্বাসে তিন জনে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া, এক প্রতিবেশীর গৃহে গিয়া আশ্রয় লইল। প্রতিবাসীদিগের

নিকট সকল বিবরণ প্রকাশ করিল। কিন্তু সে রাত্রিতে রাক্ষসের সম্মুখে যাইতে কেহই সাহস করিল না। পরদিন প্রাতঃকালে অনেক লোক একত্র হইয়া লাঠি সোঁটা লইয়া হারাণের গৃহে গিয়া দেখিল যে, সে রাক্ষস নাই, হারাণের দেহও নাই, কেবল দুই চারিখানি অতি ক্ষুদ্র হাড়ের কুচি ঘরের ভিতর মাতুরের উপর পড়িয়া আছে। সমুদয় দেহটি ভক্ষণ করিয়া, রাক্ষস প্রস্থান করিয়াছে।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

পত্রের অর্থ

এই গল্প শুনিয়া আমার বড় ভয় হইল। আমি বলিলাম,—ভটাচার্য মহাশয়! আর আমি এ বাটীতে থাকিব না; গত রাত্রিতে রাক্ষসের বোধ হয় ক্ষুধা ছিল না, তাই আমার প্রাণ বাঁচিয়া গিয়াছে। কিন্তু এবার যে দিন সে আসিবে, সে দিন যদি তাহার ক্ষুধা থাকে, তাহা হইলে কি হইবে? নিকটে পাইয়া নিশ্চয় সে আমাকেই খাইবে। অতএব অদ্যই আমি এ বাসা হইতে উঠিয়া যাইব। প্রাণটা থাকিলে অনেক কন্যা জুটিবে, অনেক বিবাহ হইবে! পাল মহাশয়ের কন্যায় আর আমার প্রয়োজন নাই।"

ভটাচার্য মহাশয় হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"তুমি ইংরেজী পড়িয়াছ। ইংরেজী পড়িয়া ভূত প্রেত রাক্ষসে এত তোমার ভয় কেন? এ কলিকাতা সহর। আমি অনেক দিন কলিকাতায় আছি। এ স্থানে কখনও রাক্ষসের উপদ্রব হইতে শুনি নাই। কলিকাতা সহরে একটি মানুষকেও কখন রাক্ষসে খায় নাই। তোমার কোন ভয় নাই। ব্যস্ত হইও না। দেখ না কি হয়। রাত্রিতে একটু সতর্ক থাকিবে। রাক্ষস যদি পুনরায় আগমন করে, তাহা হইলে আমাকে বলিবে। আজ আমি তোমাকে রাম-কবচ লিখিয়া দিব। তাহা ধারণ করিলে, আর তোমার কোন ভয় থাকিবে না।"

রাম-কবচ ধারণ করিয়া আমার ভয় দূর হইল। সে বাসা পরিত্যাগ করিয়া, অন্য স্থানে আমি আর গমন করিলাম না। তাহার পর দুই রাত্রি আমি একটা পর্য্যন্ত জাগিয়া রহিলাম। মাঝে মাঝে জানালা খুলিয়া, অশত্থ গাছের দিকে দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু আর রাক্ষস দেখিতে পাইলাম না। তৃতীয় দিনে আফিস হইতে আসিয়া বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া আমার ঘরের তালা খুলিতেছি, এমন সময় বাড়ির ভিতর যাইবার যে দ্বার সর্বদা বন্ধ থাকে, পাল মহাশয়ের দিক হইতে সে দ্বারে কে ধাক্কা মারিল, আর তৎক্ষণাৎ কপাটের ফাঁক দিয়া আমার দিকে কে এক খণ্ড কাগজ ফেলিয়া দিল। তাড়াতাড়ি আমি কাগজখানি কুড়াইয়া লইলাম। তাহার পর ঘরের ভিতর গিয়া, তক্তপোষের উপর বসিয়া, তাহা আমি পাঠ করিলাম। কাগজখানিতে এইরূপ লেখা ছিল,—

"মহাশয়! আমাদের বিষয়ে আপনি লোককে কোন কথা বলিয়াছেন। লোকের কাছে এরূপ গল্প করিলে আমাদের মন্দ হইবে। এরূপ গল্প আর করিবেন না। আমাদের এই উপকার করিবেন।"

কাগজখানিতে কাহারও নাম স্বাক্ষর ছিল না। কিন্তু হাতের লেখা নিতান্ত কাঁচা। তাহা দেখিয়া আমি বুঝিলাম যে, এ লেখা পাল মহাশয়ের কন্যার। তাহার পত্র পাইয়া আমি রাক্ষসের কথা সব ভুলিয়া যাইলাম। কাগজে লেখা আছে,—"আমাদের এই উপকার করিবেন।" ইহার অর্থ কি? পাল মহাশয়ের কন্যা দ্বারের ফাঁক দিয়া আমাকে দেখিয়া থাকিবে। আমার রূপ দেখিয়া সে মোহিত হইয়াছে, আমার উপর সে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে। ঐ চারিটি কথার ইহা ভিন্ন অন্য অর্থ হইতে পারে না। উপকার! আমাকে ভালবাসে, আমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত সে লালায়িত হইয়াছে। সামান্য ঐ "উপকার" কথাটির ভিতর যে এত অর্থ নিহিত আছে, অন্যে তাহা বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু আমাদের দুই জনের মন-প্রাণ এক হইয়া গিয়াছে, সে জন্য তাহার মনের ভাব আমি অনায়াসেই বুঝিতে পারিলাম।

পুলকে পুলকিত হইয়া কাগজখানি আমি একবার মাথায় রাখিলাম। তাহার অর্থ এই যে, "হে সুন্দরী! তোমার আজ্ঞা আমি শিরোধার্য্য

করিলাম ।” তারপর তক্তপোষের উপর শয়ন করিয়া কাগজখানি আমি বুকের উপর রাখিলাম। তাহার অর্থ যে, “হে বরাননে - তোমার পত্র স্পর্শে আমার উত্তাপিত হৃৎপিণ্ড সুশীতল হইল ”

সাধে কি পিতা-মাতা আমার নাম মদন রাখিয়াছেন। মদন না হইলে এত ভাবুক আর কেহ হইতে পারে না। কিন্তু এমন সুখের সময় পোড়া রাক্ষসের কথা পুনরায় আমার মনে পড়িল। যাহার পায়ে আমি প্রাণ সঁপিয়াছি, কদাকার দুরন্ত রাক্ষসের সহিত তাহার যে ভাব, সেই চিন্তায় আমার হৃদয় জর জর হইল। তাহার পর যক্ষ-রক্ষ প্রভৃতি দেব-যোনি-ভুক্ত জীবগণ অন্তর্য্যামী হইয়া থাকে। আমার মনের কথা যদি সেই রাক্ষস জানিতে পারে? কুপিত হইয়া রাত্রিকালে আমার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া যদি হারাণ সুরের ন্যায় কড়মড় করিয়া আমাকে ভক্ষণ করে? প্রাতঃকালে উঠিয়া সকলে যদি দেখে যে মদনের আর চিহ্নমাত্র নাই, বিছানার উপর কেবল দুই তিন কুচি হাড় পড়িয়া আছে?

ভয়ের কথা বটে। কিন্তু চিরকাল হইতে আমি সাহসী পুরুষ; তাহাতে রাম-কবচ ধারণ করিয়াছি। নানারূপ প্রবোধ দিয়া মন হইতে আমি রাক্ষসকে দূর করিলাম। আমি ভাবিলাম যে, পাল মহাশয়ের কন্যার ন্যায় শান্ত সুশীলা রূপবতী গুণবতী কামিনী রাক্ষসের সহিত প্রণয় করিতে পারে না। তাহা যদি করিত, তাহা হইলে আমাকে ঘোরতর ভালবাসিয়া আমার নিকট উপকারের প্রার্থনা করিত না। প্রকৃত আমি রাক্ষস দেখি নাই, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। আর যদিও প্রকৃত সে রাক্ষস হয়, তাহা হইলে পাল মহাশয়ের নিকট অন্য কোন কাজে সে আসিয়া থাকিবে। কলিকাতা সহরে জনাকীর্ণ পথে দিনের বেলা গাড়ী করিয়া অথবা পদব্রজে রাক্ষস আসিতে পারে না। সেজন্য রাত্রিকালে গোপন ভাবে আসিয়াছিল। শুনিয়াছি যে, সহরের ভিতর উট কি হাতী আসিবার হুকুম নাই। রাক্ষস আসিবারও বোধ হয়, হুকুম নাই।

এইরূপ নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়া মন হইতে কুচিন্তা আমি দূর

করিলাম। পালকন্যার কল্পিত মুখচন্দ্রের বিমল জ্যোতি দ্বারা আমার তাপিত হৃদয় আলোকিত ও স্নিগ্ধ করিতে লাগিলাম।

সপ্তম অধ্যায়

মদনের বদনে অম্বলের বড়ি

দুই দিন পরে অপরাহ্নে আফিস হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, আমি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতেছি, এমন সময় দ্বারের নিকট পাল মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি বাহিরে যাইতেছিলেন, আমি ভিতরে প্রবেশ করিতেছিলাম! আমাকে দেখিয়া পাল মহাশয় দাঁড়াইলেন। তাহার পর, আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ঘরের পার্শ্বে তুমিই বাসা লইয়াছ?"

স্বয়ং পাল মহাশয় আমার সহিত কথা কহিলেন! হৃদয়-মন্দিরে যে দেবীকে স্থাপিত করিয়া অহরহঃ পূজা করি, সেই দেবীর পিতা আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শরীর আমার শিহরিয়া উঠিল, মন আমার পুলকিত হইল, বুক আমার টিপ্‌ টিপ করিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম,—"মদন! প্রাতঃকালে আজ কাহার মুখ তুমি দেখিয়াছিলে?"

অতি বিনীত ভাবে আমি উত্তর করিলাম,—"আজ্ঞা, হ্যাঁ মহাশয়। আমিই আপনার ঘরের পার্শ্বে বাস করি।"

পাল মহাশয় পুনরায় বলিলেন,—"তুমি অতি উত্তম মহাভারত পাঠ করিতে পার। তবে কি জান, দূর হইতে আমি বুঝিতে পারি না, কেবল শব্দ পাই, এই মাত্র। বৃথা শব্দ শুনিয়া কি হইবে, সেইজন্য ধীরে ধীরে পড়িতে বলিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর যদি তোমার অবকাশ থাকে, আর আমার ঘরে আসিয়া যদি তুমি পাঠ কর, তাহা হইলে আমি শ্রবণ করি।"

আগ্রহের সহিত আমি উত্তর করিলাম,—"সন্ধ্যার পর আমার

কোন কাজ নাই। আপনি ডাকিলেই আমি আপনার ঘরে গিয়া মহাভারত পাঠ করিতে পারি।”

পাল মহাশয় বলিলেন যে,—“তবে আজ সন্ধ্যাবেলা আমি তোমাকে ডাকিব। এক ঘণ্টাকাল তোমার নিকট আমি মহাভারত শ্রবণ করিব।”

সন্ধ্যার পর পাল মহাশয় সেই বারেণ্ডার দ্বারে ধাক্কা মারিয়া আমাকে ডাকিলেন। আমি তাঁহার ঘরে গিয়া, অনেকক্ষণ পর্যন্ত মহাভারত পাঠ করিলাম। আমার কণ্ঠস্বর অতি মধুর, তাহার উপর আমি সুর করিয়া পড়িতে পারি। নিজে পাঠ করিয়া আমি নিজেই মোহিত হই। কিন্তু পাল মহাশয়ের বোধ হয়, সঙ্গীত-বিদ্যায় অধিকার নাই। তিনি বলিলেন,—“এ কাশীদাসী মহাভারত অথবা কৃত্তিবাসী রামায়ণ নহে। সুর করিয়া পড়িতে হইবে না, সহজ ভাষায় পাঠ কর।” যে আজ্ঞা, বলিয়া আমি তাহাই করিতে লাগিলাম।

এইরূপ প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা আমি তাঁহার নিকট মহাভারত পাঠ করিতে লাগিলাম। তাঁহার সহিত আমার সদ্ভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রবিবারে নিমন্ত্রণ করিয়া, অতি আদরে তিনি আমাকে ভোজন করাইলেন।

প্রথম দুই চারি দিন আমি তাঁহার কন্যাকে দেখিতে পাই নাই। পাল মহাশয়ের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত সতৃষ্ণ নয়নে আমি চারিদিকে চাহিয়া থাকিতাম; তাহার মলের শব্দ অথবা কণ্ঠস্বর শুনিবার নিমিত্ত সতৃষ্ণ কর্ণে সর্বদাই আমি সতর্ক থাকিতাম। যে দিন আমার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, সেই রবিবারে আমার বাসনা পূর্ণ হইল। একজন ঠিকা ঝি ব্যতীত পাল মহাশয়ের অন্য দাসদাসী ছিল না। প্রাতঃকালে দুই-এক ঘণ্টা,—অপরাহ্ণে দুই-এক ঘণ্টা, কাজ করিয়া সে ঝি আপনার গৃহে চলিয়া যাইত। আমি ও পাল মহাশয় যখন ভোজন করিতে বসিলাম, ঝি তখন উপস্থিত ছিল না। আহার করিতে বসিয়া আমাদের যাহা কিছু প্রয়োজন হইল, সে সমুদয় পাল মহাশয়ের কন্যা

আনিয়া দিল। সেই দিন তাহাকে দর্শন করিয়া আমার নয়ন সার্থক হইল।

নিশ্চয় নয়ন সার্থক হইল। তাহাকে দেখিলে কাহার না নয়ন সার্থক হয়? কেমন মাজা-মাজা উজ্জ্বল রং! কেমন নরম নরম গোল-গোল গায়ের গড়ন! চাঁদের মত মুখখানি বটে, কিন্তু চাঁদ যেরূপ চাকার ন্যায় গোল, সেরূপ গোল নহে। চাঁদের মুখে অলকা-তিলকা আছে, ইহার তাহা নাই। নাকটি শুক-চঞ্চুর ন্যায় বটে, কিন্তু সেইরূপ বঁড়শীর ন্যায় বক্র নহে। চক্ষু দুইটি মৃগ নয়নের মত বটে, কিন্তু সেরূপ ড্যাব্-ডেবে নহে। বাহু দুইটি মৃণালের মত বটে, কিন্তু ততটা সরু নহে। উরুদ্বয় রাম-রম্ভাকে পরাজয় করে বটে, কিন্তু তত মোটা নহে। ফল কথা, কালিদাস, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিদিগের রূপ-বর্ণনা-পাঠ করিয়া যেরূপ মুখশ্রী আমি মনে কল্পনা করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই নহে। তাহার মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক মানুষের মত; কবি-কল্পিত কোনরূপ অলৌকিক অদ্ভুত জীবের ন্যায় নহে। তাহাকে দেখিয়া আপনাদের দাসানুদাস মদনের মুণ্ড ঘুরিয়া গেল। প্রথমে শাকের ঘণ্ট না খাইয়া, প্রথমে অম্বলের বড়ি মদন বদনে দিয়া বসিলেন!

অষ্টম অধ্যায়

মেদো চাঁড়াল ও পঞ্চু বাবু

পাল মহাশয়ের সহিত এইরূপে আমার আলাপ পরিচয় হইল। দিন দিন তাঁহার সহিত আমার সদ্ভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার কন্যার রূপে গুণে আমার মন মোহিত হইয়া গেল। কি করিয়া তাহাকে পাইব, কেবল সেই চিন্তায় আমি দিনপাত করিতে লাগিলাম। রাক্ষসকে আর আমি দেখিতে পাই নাই। সে রাত্রির ঘটনা স্বপনের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া ক্রমে আমার প্রতীতি হইল।

কিছু দিন গত হইলে, পাল মহাশয়ের কন্যার সহিত আমার বিবাহের কথা উত্থাপন করিবার নিমিত্ত ভট্টাচার্য মহাশয়কে আমি

অনুরোধ করিলাম। তখন বৈশাখ মাস। ফল দিবার নিমিত্ত পাল মহাশয়ের গৃহিণী একদিন ভট্টাচার্য মহাশয়কে বাটীর ভিতর ডাকিলেন। ফল গ্রহণ করিয়া, কিছুক্ষণের নিমিত্ত তিনি পাল মহাশয়ের নিকট বসিলেন। সেই অবসরে তিনি আমার বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। পাল মহাশয়ের সহিত এ সম্বন্ধে যেরূপ কথাবার্তা হইয়াছিল, সেই দিন সন্ধ্যাবেলা ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে তাঁহার ঘরে ডাকিয়া, সে সমুদয় বিবরণ প্রদান করিলেন। পাল মহাশয়ের সহিত তাঁহার এইরূপ কথাবার্তা হইয়াছিল।

ভট্টাচার্য মহাশয় পাল মহাশয়কে বলিলেন,—"নিয়োগী মহাশয়ের পুত্রের পীড়া ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতেছে। এ যাত্রা সে আর রক্ষা পাইবে না।"

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—"হাঁ! পীড়া বড়ই কঠিন হইয়াছে।"

ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন,—"আমি শুনিয়াছি যে, আপনার কন্যার সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। এ যাত্রা সে রক্ষা পাইলেও, কাস রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে কন্যা-সম্প্রদান শাস্ত্র-নিষিদ্ধ।"

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—"আমি তাহা জানি। কিন্তু কি করিব! আমার কন্যা যখন ছয় মাসের, তখন হইতে নিয়োগীর সহিত আমার কথা হইয়াছে। তাহার এই ঘোর বিপদের সময় কোন কথা আমি বলিতে পারি না। নিয়োগীর সহিত বিবাদ করিতেও আমি ইচ্ছা করি না। নিয়োগী-পুত্রের শরীর দিন দিন যেরূপ শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে অল্প দিনের মধ্যেই বোধ হয়, আমি আমার প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইব। তবে সে কথা এখন আর বৃথা তুলিয়া প্রয়োজন কি?"

ভট্টাচার্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অন্য কোন স্থানে পাত্র স্থির করিয়াছেন?"

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—"না, এখনও কোন স্থানে স্থির করিতে পারি নাই; তবে গোপনে অনুসন্ধান করিতেছি।"

ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন,—"আপনার ঘরের নিকট মদনমোহন বলিয়া ঐ যে ছোকরা থাকে, তাহার সহিত দিলে হয় না? ছোকরা শান্ত, সচ্চরিত্র, লেখা-পড়া জানে, দু-পয়সা উপার্জনও করিতেছে।"

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—"কিছুতেই নয়! সে আমাদের স্বজাতি শুনিয়া, আমিও প্রথম সেইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু গোপনে তাহার সমুদয় সন্ধান লইয়া এখন সে ইচ্ছা আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। আমরা লেখা-পড়া-জানা চাকুরে ভদ্র সদ্‌গোপ। মদনের বাপ স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া চাষ করিত। অতি কষ্টে সে ছেলেটিকে লেখা-পড়া শিক্ষা দিয়াছে। চাষ করা যে নিতান্ত গর্হিত কাজ, লেখা-পড়া শিখিয়া মদন তাহা বুঝিয়াছে। সে জন্য বাপকে এখন সে একখানি মুদিখানার দোকান করিয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়! পূর্বের কলঙ্ক ঘুচিবার নহে। আমি চাকুরে সদ্‌গোপ হইয়া, চাষী সদ্‌গোপের সহিত কন্যার বিবাহ কি করিয়া দিব?"

ভট্টাচার্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"স্বহস্তে চাষ করা কি নিতান্ত অন্যায় কাজ?"

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—"আপনি নিজেই কেন বুঝিয়া দেখুন না? চাষ করিলে মানুষ চাষা হয়, আর চাকরিতে মানুষ বাবু হয়। তাহার যত টাকা থাকুক না কেন, আপনার নিকট একজন চাষা আসিলে নাক সিট্‌কাইয়া আপনি তাহার সহিত কথা কহিবেন না। কিন্তু সেই জাতীয় কোন লোক যদি চাকুরে হয়, তাহা হইলে 'আসুন, আসুন, বাবু আসুন' বলিয়া আপনি তাহাকে মাথায় তুলিয়া লইবেন। কেবল আপনি নহেন, দেশের সকল লোকেই এইরূপ করিয়া থাকে। আমাদের গ্রামে দুই জন চাঁড়াল আছে—এক জনের নাম মাধব আর এক জনের নাম পঞ্চু। দুই জনে একসঙ্গে পাঠশালায় লিখিয়াছিল। আলু, আম ও পাটের চাষ করিয়া মাধব বিলক্ষণ দু-পয়সা সঙ্গতি করিয়াছে। কিন্তু সে নিজে হাতে কোদালি-কুঠারি ধরিয়া পরিশ্রম করে। সে জন্য সকলে তাহাকে মাধব না বলিয়া মেদো চাঁড়াল বলে। পঞ্চু একটু ইংরেজী শিখিয়া পনর টাকা বেতনে রেলে টিকিট কাটা

কাজ পাইয়াছে ; সে জন্য সকলে তাহাকে পঞ্চু বাবু বলে। চাকরি না করিয়া সে যদি চাষের কাজ করিত, তাহা হইলে কেহ তাহাকে পঞ্চু বাবু বলিত না, সকলেই তাহাকে পেঁচো চাঁড়াল বলিত। এই জন্য হাড়ি বাগ্দী সকলেই আপন পুত্রদিগকে ইংরেজী শিক্ষা দিয়া, চাকরে করিতে চেষ্টা করিতেছে। কাহার না ইচ্ছা যে,তাহার ছেলে জেণ্টলম্যান হয় ?"

ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন,—"সত্য বটে। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা চিরকাল পুরুষ-পুরুষানুক্রমে অধ্যাপক পণ্ডিতের ব্যাবসায় অবলম্বন করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারাও এক্ষণে পুত্রদিগকে ইংরেজী শিক্ষা দিয়া জেণ্টুমান করিতেছেন।"

পাল মহাশয় বলিলেন,—"আমাদের মধ্যে যেরূপ ভদ্র সদ্গোপ ও চাষী সদ্গোপ আছে, আপনাদের মধ্যেও সেইরূপ ভদ্র ও চাষী ব্রাহ্মণ আছে। হলধারী ব্রাহ্মণদিগকে বাভন বলে ; বেহার অঞ্চলে তাহারা বাস করে। ভাল ব্রাহ্মণগণ যেরূপ তাহাদের সহিত আদান-প্রদান করিতে পারে না, আমরাও সেইরূপ চাষী সদ্গোপকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি না।"

ভট্টাচার্য মহাশয়ের ঘরে বসিয়া, তাঁহার মুখ হইতে আমি এই সমুদয় বিবরণ শ্রবণ করিতেছিলাম। পাল মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমি একেবারে বসিয়া পড়িলাম। সত্য বটে, আমার পিতা স্বহস্তে চাষ করিতেন। আর এ কথাও সত্য যে চাষ ছাড়াইয়া আমি তাঁহাকে মুদিখানার দোকান করিয়া দিয়াছি। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, চাষের কলঙ্ক দূর হইয়াছে ; আমরা এক্ষণে বাবু হইয়াছি। কিন্তু পাল মহাশয় গোপনে গোপনে এত সন্ধান লইবেন, তাহা আমি কি করিয়া জানিব। যাহা হউক, তাঁহার কন্যাকে লাভ করা সম্বন্ধে আমি এক্ষণে হতাশ হইয়া পড়িলাম।

কিন্তু ভট্যাচার্য্য মহাশয় আমাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, —"তুমি হতাশ হইও না। শাস্ত্র হইতে বচন বাহির করিয়া পাল মহাশয়কে আমি বুঝাইয়া দিব যে, সকল সদ্গোপ একজাতি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—শাস্ত্র হইতে এরূপ বচন বাহির করিতে পারিবেন?”

ঈষৎ হাসিয়া ভট্টাচার্য মহাশয় উত্তর করিলেন,—“আমাদের শাস্ত্র মহাসাগর স্বরূপ। এমন জিনিস নাই, যা ইহার ভিতর হইতে বাহির হয় না।”

ভট্যাচার্য মহাশয় বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমা নাড়িয়া ইঙ্গিত করিলেন। তাহার অর্থ এই যে, সব টাকার খেলা! টাকা দিলে শাস্ত্রের ভিতর হইতে যাহা ইচ্ছা তাহাই বাহির করিয়া দিতে পারা যায়।

এই সময় বাহিরে একটু কাসির শব্দ হইল। ভট্টাছার্য মহাশয় কিছু চমকিত হইয়া বলিলেন,—“এঃ? গোঁপছাঁটা নিয়োগী আড়ালে দাঁড়াইয়া, আমাদের কথা শুনিতেছে।”

এই কথা বলিতে বলিতে নিয়োগী মহাশয় আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইলেন। ভট্টাচার্য মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন,—“কি ঠাকুর! সকল সদ্‌গোপ একজাতি? তাহাদের মধ্যে ইতর-ভদ্র নাই?”

ভট্টাচার্য মহাশয় উত্তর করিলেন,—“হ্যাঁ! আমার মত তাই। সকল সদ্‌গোপ একজাতি। চাষ ছাড়িয়া দিলেও সে সদ্‌গোপ থাকে, অন্য জাতি হয় না। তাহা ব্যতীত তোমরা সকলেই ব্রহ্মার পা হইতে বাহির হইয়াছ।

নিয়োগী বলিলেন,—আমরা ব্রহ্মার পা হইতে বাহির হইয়াছি? আর তোমরা?”

ভট্টাচার্য মহাশয় উত্তর করিলেন,—“আমরা ব্রহ্মার মুখ হইতে বাহির হইয়াছি।”

এই কথা শুনিয়া নিয়োগী মহাশয় রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। আমাকে লক্ষ্য করিয়া অন্যান্য জাতি বিষয়ে তিনি নানারূপ প্রশ্ন করিলেন। যথাসাধ্য আমি সেই সমুদয় তর্কের উত্তর দিলাম। অবশেষে যখন দেখিলাম যে, তাঁহার ক্রোধ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে ও তিনি অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করিতেছেন, তখন সে স্থান হইতে আমি চলিয়া যাইতে উদ্যত

হইলাম। যাইবার সময় নিয়োগী আমাকে বলিলেন,—"পালের কন্যাকে তুমি বিবাহ করিবে! বামন হইয়া চাঁদে হাত! পাল অন্য স্থানে বর খুঁজিতেছে! বটে! তোমার পালকেও আমি দেখিয়া লইব। রাত্রিতে জানালা দিয়া ঘরে রাক্ষস আসে! বটে! পালকে বলিও যে, রাক্ষসের উপর খোক্কোস আছে।"

নবম অধ্যায়

আবার সেই সবুজ রাক্ষস

এই কথা বলিয়া নিয়োগী সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। আমিও আমার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। মনোদুঃখে সে রাত্রিাত আমি আর আহার করিলাম না। সে রাত্রি পাল মহাশয়ের নিকট মহাভারত পাঠ করিতেও যাইলাম না। ফল কথা, সেই দিন হইতে মহাভারত পাঠে আমার অরুচি জন্মিয়া গেল। পাল মহাশয়ের সহিত কথাবার্তা,—তাঁহার গৃহে যাতায়াতও সেই দিন হইতে আমার অনেক কমিয়া গেল।

এইরূপে কিছুদিন গত হইল। একদিন রাত্রিকালে আমি শয়ন করিয়া আছি। অঘোর নিদ্রায় আমি অভিভূত আছি। বাহির-বাটীতে আমার ঘর, আর ভিতর-বাটীতে পাল মহাশয়ের ঘর,—এই দুই ঘরের মাঝখানে যে দেয়াল, সেই দেয়ালের ঠিক গায়ে আমার বিছানা ছিল। সহসা পাল মহাশয়ের দিক হইতে সেই দেয়ালের গায়ে গুপ গুপ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। সেই শব্দে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল! শুইয়া শুইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কে শব্দ করে?"

তাঁহার ঘর হইতে পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—"শীঘ্র উঠিয়া বাহিরে এস! বিশেষ প্রয়োজন আছে: গোল করিও না।"

আমি উঠিয়া প্রথমে ঘড়িতে দেখিলাম যে, রাত্রি তখন দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। তাহার পর, দ্বার খুলিয়া আমি বারেণ্ডায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। পাল মহাশয়ও সেই সময় আপনার ঘরের ভিতর

হইতে বাহির হইয়া, বারেণ্ডার দ্বারের খিল খুলিলেন। আমার দিকে সেই দ্বার শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ ছিল। পাল মহাশয় আমাকে সেই শৃঙ্খল খুলিতে বলিলেন। আমি শৃঙ্খল খুলিলাম। ভিতর-বাটী এবং বাহির-বাটী এক হইয়া গেল। এই সময় আমি দেখিতে পাইলাম যে, লাঠি ধরিয়া কে এক জন অতি ধীরে ধীরে পাল মহাশয়ের সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার উপক্রম করিতেছে, আর প্রদীপ হাতে লইয়া পাল মহাশয়ের গৃহিণী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। ভালরূপে দেখিয়া আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম। সে নিয়োগীর পীড়িত পুত্র। শয্যাশায়ী মরণাপন্ন রোগী এত রাত্রিতে কেন সে স্থানে আসিয়াছে, ভাবিয়া আমি ঘোরতর বিস্মিত হইলাম।

পাল মহাশয় চুপি চুপি আমাকে বলিলেন,—"আস্তে আস্তে কথা কহিও। বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমার ঘরের ভিতর এস। তাহার পর সকল কথা তোমাকে বলিব।"

পাল মহাশয়ের আজ্ঞায় বারেণ্ডার দ্বারে খিল দিয়া, নিঃশব্দে আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। পাঁচ ছয় পা গিয়াই পাল মহাশয়ের ঘরের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলাম। পাল মহাশয় ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমিও প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়,—সর্বনাশ! চাহিয়া দেখি না তাঁহার ঘরের ভিতর সেই রাক্ষস! ঘরের মাঝখানে মাদুরের উপর আসন-পিঁড়ি হইয়া রাক্ষস মহাশয় গট হইয়া বসিয়া আছেন! আরও আশ্চর্য্য কথা! লজ্জা সরমের মাথা খাইয়া, পাল মহাশয়ের কন্যা সেই মাদুরের এক পার্শ্বে বসিয়া আছে!

ভয়ে আমার পা থর থর কাঁপিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম যে, আর কিছু নয়, পাল মহাশয় এই রাক্ষসকে আপনার জামাতা করিয়াছেন। জল-খাবার স্বরূপ আমার দেহটি তাহাকে প্রদান করিবার নিমিত্ত এই ঘোর রাত্রিতে তিনি আমাকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। মহাভারত পাঠ করাইয়া, নিমন্ত্রণ করিয়া, অনেক দিন হইতে তিনি ইহার যোগাড় করিতেছেন। আমার প্রতি কেন যে তিনি এত কৃপা করিয়াছিলেন, তাহার অর্থ এখন আমি বুঝিতে পারিলাম। আমি আরও ভাবিলাম যে,

নিয়োগীদিগেরও ইহাতে যোগ আছে। তা না হইলে, যে লোক বিছানা হইতে উঠিতে পারে না, সে কেন এই রাত্রি দুই প্রহরের সময় এ স্থানে আসিবে। যাহা হউক, আমি তাঁহার ঘরের ভিতর আর প্রবেশ করিলাম না। প্রাণ লইয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে পলায়ন করিবার উপক্রম করিলাম। কিন্তু পাল মহাশয় খপ করিয়া আমার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। আমার হাত ধরিয়া তিনি বলিলেন,—"কোথা যাও!"

আমি তাঁহার পায়ে পড়িলাম। তাঁহার পা দুইটি জড়াইয়া আমি বলিলাম,—"আমি একেলা মায়ের একলা ছেলে! দোহাই আপনার!"

পাল মহাশয় বলিলেন,—"সে আবার কি!"

আমি বলিলাম, "দোহাই আপনার। আপনার উনি জামাতা, উনি বোধ হয় বিভীষণের প্রপৌত্র। উনি দেবতা। আমাকে খাইয়া উনি সুখ পাইবেন না। উনি বরং আসিয়া টিপিয়া দেখুন, আমার গায়ে মাংস নাই, আমার গায়ে সব হাড়।"

পাল মহাশয় বলিলেন,—"এ বলে কি!"

এই সময় গঙ্গদত্তর কথা আমার মনে পড়িল। আমি বলিলাম,—"আমাকে ছাড়িয়া দিন? রাক্ষস মহাশয়ের নিমিত্ত আমি ভাল মোটা তাজা মানুষ ডাকিয়া আনিতেছি। তাহার কোমল মাংস ভক্ষণ করিয়া, রাক্ষস মহাশয় পরম তৃপ্তিলাভ করিবেন। জামাতার আদর করিয়া, আপনিও সন্তোষ লাভ করিবেন; আমাকে খাইয়া তাঁহার সুখ হইবে না। এ চাষার মাংস। স্বহস্তে আমরা চাষ করি। আমাদের মাংস শুষ্ক ও কঠিন,—ঠিক দড়ির মত। দোহাই আপনার।"

এত বিনয় বচনে আমি প্রাণ-ভিক্ষা চাহিলাম, তথাপি পাল মহাশয়ের দয়া হইল না। তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিলেন না। তখন নিরুপায় হইয়া যেমন এক দিকে তাঁহার হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তেমনি অন্য দিকে লোক জড় করিবার নিমিত্ত চীৎকার করিতে উদ্যত হইলাম। "কর কি!" এই কথা বলিয়া পাল মহাশয় আমার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। আর সেই সময় রাক্ষস উঠিয়া আমাকে আসিয়া ধরিল। নিমেষের মধ্যে সে আমাকে ঘরের ভিতর টানিয়া

লইল ; তাঁহার পর, সে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। এক বার, আমাদের গ্রামে, কাজি বুড়ীর ধামা-ঢাকা বীজ মোরগ রাত্রিকালে আমি চুরি করিয়া খাইয়াছিলাম। জবাই করিবার সময়, আমার হাতে সেই মোরগ যেরূপ ঝট্‌পট্‌ করিয়াছিল, আজ রাক্ষসের হাতেও আমি সেইরূপ ঝট্‌পট্‌ করিতে লাগিলাম। কিন্তু সে হইল রাক্ষস, আর আমি হইলাম মানুষ। তাহার হাত হইতে আমি আপনাকে ছাড়াইতে পারিলাম না। তাহার স্পর্শে আমার হাত-পা অবশ হইয়া গেল। ক্রমে আমার সর্বাঙ্গ হিম হইয়া গেল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল, । কম্পজ্বরের ন্যায় শরীর আমার কাঁপিতে লাগিল, দাঁতে দাঁত লাগিয়া ঠক ঠক করিয়া শব্দ হইতে লাগিল ! আমি অচেতনপ্রায় হইলাম, আমার কণ্ঠ হইতে কেবল গোঁ গোঁ ধ্বনি বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও সম্পূর্ণভাবে আমি অজ্ঞান হই নাই, কারণ, তখনও আমি ভাবিতেছিলাম যে,—"হায় রে ! শেষে রাক্ষসের আহার হইব বলিয়া কি বাপ-মা আমাকে এত বড় করিয়াছিলেন !"

দশম অধ্যায়

আমার সাহস ও বিক্রম

কাজি বুড়ীর সেই বীজ মোরগের মত ঝট্‌পট করিতে করিতে, শরীর আমার অবশ হইয়া পড়িল। অবশেষে আমি একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। অজ্ঞান অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। বোধ হয়, অধিকক্ষণ নহে। পুনরায় আমার জ্ঞান হইলে, চক্ষু চাহিয়া আমি দেখিলাম যে, মাদুরের উপর আমি শয়ন করিয়া আছি। পাল মহাশয়ের গৃহিণী আঁচল দিয়া আমার কপাল মুছাইতেছেন। তাঁহার কন্যা আমাকে বাতাস করিতেছে। নিকটে উনিশ কুড়ি বৎসর বয়স্ক এক সুশ্রী যুবক বসিয়া আছে। আর কিছু দূরে পাল মহাশয় নিজে বাক্সর ভিতর একটি শিশি তুলিয়া রাখিতেছেন। আমি তখন কোথায় আছি, প্রথম তাহা আমার স্মরণ হইল না। ক্রমে সকল কথা

স্মরণ হইল। সভয় নয়নে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। কিন্তু রাক্ষসকে সে ঘরে আর দেখিতে পাইলাম না।

আমাকে চেতন করিবার নিমিত্ত পাল মহাশয় শিশি হইতে কি ঔষধ দিয়াছিলেন। সেই শিশি পুনরায় তিনি বাক্সর ভিতর তুলিয়া রাখিতেছিলেন। আমার জ্ঞান হইয়াছে দেখিয়া, তিনি আমার নিকট আসিলেন।

তাঁহার কন্যা ও স্ত্রী সেই সময় সে স্থান হইতে সরিয়া বসিলেন। আমি পাল মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম—"রা—রা—রা?"

সমুদয় প্রশ্নটি স্পষ্টরূপে আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না। সে রাক্ষস মহাশয় এখন কোথায়, ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য ছিল। আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—"তোমাকে আর কি বলিব! তুমি মানুষ কি, কি, তাহাই আমি বুঝিতে পারি না। রাক্ষস আবার কোথায়? আমার এত বয়স হইয়াছে; কিন্তু রাক্ষস আমি কখনও দেখি নাই। ইনি আমার পুত্র। বিপদে পড়িয়া আমার পুত্রকে ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইয়াছে। এই সে পরচুলের দাড়ি গোঁপ, আর এই সে মুখস,—যাহা দেখিয়া তুমি এত ভয় পাইয়াছিলে।"

এই কথা বলিয়া, পাল মহাশয় প্রথম আমায় সেই সুশ্রী যুবককে দেখাইলেন, আর তাহার পর সেই পরচুল ও মুখস দেখাইলেন।

নিজের বড়াই করিতে নাই; কিন্তু স্বভাবতঃ আমি যে একজন সাহসী পুরুষ, সে পরিচয় বোধ হয়, আর আপনাদিগকে দিতে হইবে না। প্রকৃত রাক্ষস না হউক, রাক্ষসের মত তো বটে! সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের হাতে পড়িয়াও আমি ধৈর্য্য ধরিতে সমর্থ হইয়াছিলাল, তাহাই আমার সাহসের যথেষ্ট পরিচয়। আপনারা হইলে ভয়ে হয় তো কত কি করিয়া ফেলিতেন। তাহার পর বলিলে হয় তো আপনারা বিশ্বাস করিবেন না; কিন্তু সত্য বলিতেছি যে, কিছুমাত্র ভয় না করিয়া, রাক্ষসের মুখস আমি টিপিয়া দেখিলাম,—স্বচ্ছন্দে হাতে করিয়া টিপিয়া

দেখিলাম। তাহাতে আমার কিছুমাত্র ভয় হইল না। এখন আপনারা বুঝিয়া দেখুন, আমার কত সাহস!

যখন আমি নিশ্চয় বুঝিলাম যে, সে বস্তুটা মুখস বটে; রাক্ষসের মুণ্ড বা অন্য কোন ভয়াবহ পদার্থ নহে, তখন আমি উঠিয়া বসিলাম। বসিয়া আমি পাল মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি জন্য আপনার পুত্রকে এরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইয়াছে? আর কেনই বা ইহাকে অশ্বত্থগাছ-পথে যাতায়াত করিতে হয়?"

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন—"সে অনেক কথা। বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিবার সময় নাই। আপাততঃ আমরা ঘোর বিপদে পড়িয়াছি। শীঘ্র তাহার প্রতিকার না করিতে পারিলে, আমাদের সর্বনাশ হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এই রাত্রি দুই প্রহরের সময় বিপদ কোথা হইতে আসিবে?"

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—"আমার পুত্রের নাম মিহির। মিহির এক খুনী মোকদ্দমায় পড়িয়াছে। দুই বৎসর পুর্বে সে ঘটনা ঘটিয়াছে। মিহির সে লোককে খুন করে নাই; কিন্তু সমুদয় দোষটি তাহার ঘাড়ে পড়িয়াছে। সে জন্য এই দুই বৎসর নানারূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সে পথে পথে ফিরিতেছে। দুঃখের কথা বলিতে আমার বুক ফাটিয়া যায়, বাবা আমার কতই না কষ্ট ভোগ করিতেছে। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রাত্রিকালে অতি গোপনে সে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করে। আমাদের নিকট আসিতে তাহাকে আমি বার বার মানা করিয়াছি। কিন্তু আমাকে, তাহার গর্ভধারিণীকে ও তাহার ভগিনীকে না দেখিয়া সে থাকিতে পারে না। কিছু দিন পুর্বে রাত্রিকালে যখন সে অশ্বত্থ গাছ দিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতেছিল, সেই সময় তুমি তাহাকে দেখিয়াছিলে। পাছে কেহ সন্দেহ করে, সে জন্য আমার আজ্ঞায় আমার কন্যা তোমাকে সেই চিঠি লিখিয়াছিল। মিহির যদি আজ ধরা পড়ে, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহার ফাঁসী হইবে। কারণ, সে যে খুন করে নাই সে যে সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ, তাহা প্রমাণ করিবার উপায় নাই। এ

বিষয়ে যদি তুমি কোনওরূপ সহায়তা করিতে পার, সেই জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি। আমি তোমাকে ডাকিতে ইচ্ছা করি নাই। আমার গৃহিণী, আমার পুত্র ও আমার কন্যা, সকলের অনুরোধে আমি তোমাকে ডাকিয়াছি। কিন্তু সামান্য একটি মুখস ও পরচুলের দাড়ি দেখিয়া তোমার যখন এত ভয়, তখন তোমার দ্বারা যে কোন উপকার হইবে, তাহা আমার বোধ হয় না। বরং আর একটু হইলেই, তুমি ভয়ে চীৎকার করিয়া সর্বনাশ করিতে! তোমার চীৎকারে পাড়ার লোক আমার বাড়ীতে আসিয়া জমা হইত। মিহিরের পলায়ন করিবার তখন আর কোন উপায় থাকিত না। সেই জন্য তোমাকে ঘরের ভিতর আনিয়া তোমার মুখ চাপিয়া ধরিতে আমরা বাধ্য হইয়াছিলাম।"

পাল মহাশয়ের ভর্ৎসনায় আমি অতিশয় লজ্জিত হইলাম। কিন্তু তাঁহার কন্যা যে আমাকে ডাকিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিল, সে জন্য আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। আপনাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমি একজন বুদ্ধিমান্ লোক। এই প্রখর বুদ্ধিবলে ইঙ্গিতমাত্রে আমি সকল কথা বুঝিতে পারি। ইতিপূর্বে আমি বলিয়াছিলাম যে, পাল মহাশয়ের কন্যা আমার রূপে গুণে মোহিত হইয়া আমাকে বিবাহ করিতে লালায়িত হইয়াছে। কেমন! আমার কথা সত্য নয়? আমার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়।

আর আমার সাহসেরও প্রশংসা করিতে হয়। পূর্বে সাহসের অনেক পরিচয় দিয়াছি। এখন আমি ভাবিলাম যে, আরও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া এই কন্যার মন-প্রাণ আমি একেবারে কাড়িয়া লইব। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহার কন্যার মুখপানে চাহিয়া আমি পাল মহাশয়কে বলিলাম, —"ঘরে তলোয়ার আছে? থাকে তো দিন, আমি লড়াই করিব।"

পাল মহাশয় বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন,—"তুমি পাগল না কি? কাহার সহিত তুমি লড়াই করিবে? পুলিশের সহিত লড়াই করিবে?"

আমার ভয় হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"পুলিশ এ স্থানে কি করিয়া আসিবে? পুলিশ কি করিয়া জানিবে যে, আপনার পুত্র মিহির এ বাটীতে আসিয়াছে?"

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন, "তাহাই তো ভয়। সেই বিপদেই তো এখন আমি পড়িয়াছি; আর সেই জন্যই তো তোমাকে আমি ডাকিয়াছি। কি করিব, কিছুই আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। পুলিশের লোক এখনি হয় তো আসিয়া উপস্থিত হইবে। নিয়োগী থানায় খবর দিতে গিরাছে।"

বিস্মিত হইয়া আমি বলিলাম,—"নিয়োগী!"

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—"হাঁ, নিয়োগী। তাহার পুত্র বেচুর সহিত আমার কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বেচুর এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সে বিবাহ আমি কিছুতেই দিতে পারি না। সেই কথা শুনিয়া, আমার উপর নিয়োগীর অতিশয় রাগ হইয়াছে। যখন বাসার কোন কোন লোকের নিকট তুমি রাক্ষসের গল্প করিয়াছিলে, নিয়োগী তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সে ভূতও নয়, রাক্ষসও নয়,—সে আমার পুত্র মিহির ব্যতীত অন্য কেহ নয়। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, সে আমার বাটীতে গমনাগমন করিতেছে। কারণ নিয়োগী সেই খুনের কথা অবগত আছে। তাহার পুত্র ও আমার পুত্র,—হুগলীতে এক বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিত। সেই বাসাতেই এই খুন হয়। নিয়োগী-পুত্রের পরামর্শে ও সহায়তায় আমার পুত্র পলায়ন করে। তোমার মুখে রাক্ষসের কথা শুনিয়া পর্যন্ত নিয়োগী বোধ হয়, চৌকি দিতেছিল। তাহার পর আজ রাত্রিতে মিহিরকে আসিতে দেখিয়া সে থানায় সংবাদ দিতে গিয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপনি কি করিয়া জানিলেন যে, সে থানায় খবর দিতে গিয়াছে?"

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—"নিয়োগীর পুত্র বেচু আসিয়া আমাকে এইমাত্র বলিয়া গেল। বেচু এখন আর বিছানা হইতে উঠিতে পারে না। তথাপি লাঠি ধরিয়া অতি কষ্টে সে এই মাত্র আসিয়াছিল। তাহার পিতা যে ঘোর অন্যায় কাজ করিতেছে, তাহা বোধ হয়, সে বুঝিতে পারিয়াছে। সে জন্য আমাকে সে সকল কথা বলিয়া গেল।"

একাদশ অধ্যায়

রাণারাণীর বুদ্ধি

আমি বলিলাম,—"মিহির এই বেলা অশ্বত্থ গাছ দিয়া পলায়ন করুক না কেন ?"

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—"তাহার যো নাই। বেচু বলিয়া গেল যে, সদর দরজায় একজন কন্‌ষ্টেবল দাঁড়াইয়া আছে। সে দিক দিয়া পলায়ন করিবার উপায় নাই। পশ্চিমে গলির রাস্তায় এই জানালার পার্শ্বে যে দিকে অশ্বত্থ গাছ রহিয়াছে, সে স্থানে নিয়োগীর বন্ধু সেই দালাল দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে। দুই পথে দুই জনকে পাহারা রাখিয়া নিয়োগী থানায় গিয়াছে।"

আমি জানালার নিকট গিয়া ঈষৎ উঁকি মারিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, সত্য বটে,—সে স্থানে সেই দালাল দাঁড়াইয়া আছেন, যিনি কেশবী আমলে একজন ধ্বজাধারী ব্রাহ্ম ছিলেন, যিনি এক্ষণে গোঁড়া হিন্দু হইয়াছেন, ও যিনি এক্ষণে মুরগী ভক্ষণ করেন না।

জানালার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া, আমি বাটীর উত্তর ও পূর্ব দিক্ পানে চাহিয়া দেখিলাম। সেই দুই দিক একেবারে ভগ্ন ; সে দুই দিক দিয়া পলায়ন করিবার কোন উপায় নাই। তাহার পর, আমি ছাদে উঠিবার সিঁড়ির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সিঁড়িও একেবারে ভগ্ন ; ছাদে উঠিবার উপায় নাই। পলায়ন করিবার কোন উপায় আমি দেখিতে পাইলাম না।

মিহির এতক্ষণ মাতার নিকট বসিয়া ছিল। খাইবার নিমিত্ত মাতা তাহাকে কিছু মিষ্টান্ন দিয়াছিলেন। মিহির খাইতে অস্বীকার করিতেছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে, আঁচলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে, খাইবার নিমিত্ত মাতা তাহাকে জেদ করিতেছিলেন। মাতার অনুরোধে মিহির সন্দেশ ভাঙ্গিয়া একটু মুখে দিয়া জল পান করিল। তাহার পর সে মাতাকে বুঝাইতে লাগিল।

মিহির বলিল,—"মা! তুমি জননী! আমার দেবতা। তোমার সাক্ষাতে আমি সত্য বলিতেছি যে, আমি সে ছোকরাকে খুন করি নাই। দুই জনে আমরা এক ঘরে থাকিতাম। চিরকাল তাহাতে আমাতে বড় ভাব ছিল। বাবার সহিত তাহার বাপের মকদ্দমা আরম্ভ হইলেও তাহাতে আমাতে ভাব যায় নাই। তবে যে রাত্রিতে সে খুন হয়, সেই দিন সন্ধ্যাবেলা তাহাতে আমাতে একটু বচসা হইয়াছিল। কিন্তু সে অন্য কথা লইয়া, মোকদ্দমার কথায় নয়। যাহা হউক, সে ঝগড়া কোন কাজের নয়, কথার তর্ক-বিতর্ক মাত্র। তাহার পর আমরা একসঙ্গে কত কথা কহিলাম, একসঙ্গে আহার করিলাম, একঘরে শয়ন করিলাম। রাত্রি দুইটা কি তিনটার সময় আমাকে একবার বাহিরে যাইতে হইল। বাহির হইতে আসিয়া পুনরায় ঘরের ভিতর যেই প্রবেশ করিয়াছি, আর সেই সময় বেণীর বিছানার নিকট হইতে কিরূপ একটা ঘড় ঘড় শব্দ আমি শুনিতে পাইলাম। যে ছোক্‌রা খুন হইয়াছে, তাহার নাম বেণী ছিল। আমি ভাবিলাম, বেণী বুঝি কিরূপ কুভাবে শয়ন করিয়াছে, তাই সে এইরূপ শব্দ করিতেছে। তাহাকে ঠেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইতে বলিব, এই জন্য আমি সেই অন্ধকার ঘরে তাহার বিছানার দিকে যাইতে লাগিলাম। সহসা আমার পায়ে মানুষের গা ঠেকিয়া গেল। তখনও আমি কোন বিপদের আশঙ্কা করি নাই। তখন আমি ভাবিলাম যে, বেণী ঘুমের ঘোরে তক্তপোষ হইতে পড়িয়া গিয়াছে। 'বেণী' 'বেণী' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে আমি তাহাকে তুলিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আমি দেখিলাম যে, তাহার সর্বশরীর অবশ হইয়া গিয়াছে, আর তাহার গলা দিয়া সেই ঘড় ঘড় শব্দ হইতেছে; আর সেই সময় আমার পায়ের জল অপেক্ষা ঘন কি সব লাগিয়া গেল। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। পাশের ঘরে নিয়োগী মহাশয়ের পুত্র বেচু ও আর আর ছোকরা ছিল। কিন্তু আমার চীৎকার শুনিয়া, কেবল বেচু একেলা দৌড়িয়া আসিল। সঙ্গে সে দিয়াশিলাই আনিয়াছিল। সে দিয়াশিলাই জ্বালিল। সেই আলোতে বেণীকে আমি তাহার তক্তোপোশে শয়ন করাইলাম। আর সেই সময় দেখিলাম যে, তাহার বুকে কে ছুরি মারিয়াছে; বুক হইতে

ভলকে ভলকে রক্ত বাহির হইতেছে, তাহাতে আমার গা ও কাপড়ে রক্তে রক্ত হইয়া গিয়াছে। ঘরের মেঝেতে যে স্থানে বেণী পড়িয়া ছিল, সে স্থানেও অনেক রক্ত জমা হইয়াছিল। সেই রক্ত আমার পায়ে লাগিয়া গিয়াছিল। নিয়োগী মহাশয়ের পুত্র বেচু ঘরের ভিতর আসিয়া দিয়াশলাই জ্বালিয়া সমুদয় ব্যাপার দেখিল। বেচু মনে করিল যে, আমি বেণীকে খুন করিয়াছি। সেই জন্য বেচু আমাকে বলিল,—"চুপ, চুপ! গোল করিও না। কিন্তু মিহির, এ কি তুমি করিয়াছ? সন্ধ্যা বেলা তাহার সহিত তোমার ঝগড়া হইয়াছিল, সেই জন্য ইহাকে খুন করিয়াছ? না, ইহার বাপের কাছ হইতে যে এক শত টাকার নোট আসিয়াছে, তাহার জন্য তুমি ইহাকে খুন করিয়াছ?' আমি বলিলাম, —'ও কি কথা, বেচু! আমি ইহাকে খুন করিয়াছি! আমি যদি খুন করিব, তবে চীৎকার করিয়া লোক ডাকিতে যাইব কেন?'—বেচু বলিল, —'দেখ, মিহির! তোমার সে কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না! তোমরা দুই জনে একঘরে থাক। তোমার সহিত কাল তাহার ঝগড়া হইয়াছিল' তোমার গায়ে রক্ত,—আর এ কি! এই বলিয়া ঘরের মেজে হইতে বড় একখানি ছুরি সে তুলিয়া লইল। ছুরিখানা রক্তমাখা ছিল। সে ছুরি আমার। ঘরের এক পার্শ্বে ছোট টেবিল ছিল। তাহার উপর কাগজ, কলম, পুস্তক প্রভৃতির সহিত আমার সেই ছুরিখানিও থাকিত। ছুরিখানি হাতে লইয়া বেচু বলিল,—'আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিও না। শীঘ্র তুমি পলায়ন কর।' আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। পলায়ন করিতে আমি উদ্যত হইলাম, তখন বেচু বলিল,—ও কি কর! ওরূপ রক্তমাখা কাপড়ে বাহিরে যাইও না। এখনি তোমাকে চৌকিদারে ধরিবে।' এই কথা বলিয়া সে দৌড়িয়া আপনার ঘরে গেল। আপনার একখানি কাপড় আনিয়া আমাকে দিল। সেই কাপড় পরিয়া আমি পলায়ন করিলাম। সে রাত্রিতে বেচু আমার অনেক উপকার করিয়াছে। আজও দেখ, সে আমাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু মা! এখন বোধ হইতেছে যে, পলায়ন করিয়া আমি ভাল কাজ করি নাই। যখন আমি অপরাধ করি নাই, তখন কি জন্য যে আমি পলায়ন করিলাম,

তাহা বুঝিতে পারি না। এরূপ অবস্থায় আর কত দিন কাল কাটাইব। ইহা অপেক্ষা ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়া মরাই আমার পক্ষে ভাল। তোমাদিগকে না দেখিয়া আর পথে পথে ফিরিতে পারি না। আর কষ্ট ভোগ করিতে পারি, না, মা!"

মাতা কাঁদিকে লাগিলেন। পাল মহাশয়ের কন্যা কাঁদিতে লাগিল। পাল মহাশয়ের চক্ষে জল আসিল, আমারও চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

মিহির পুনরায় বলিল,—"আজ আর পলাইবার কোন উপায় নাই। কিন্তু তাহার জন্য আমি কিছু মাত্র দুঃখিত নই। পথে পথে আর বেড়াইতে পারি না।"

এরূপ বলিতে বলিতে মিহির দেখিল যে, তাহার পিতা, মাতা ও ভগিনী সকলেই অতিশয় কাঁদিতেছেন। সে জন্য তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া সে পুনরায় বলিল,—"মা, কাঁদিও না! তুমি ভয় করিও না! ভগবান্ মাথার উপর আছেন। বিনাদোষে তিনি আমাকে ফাঁসী যাইতে দিবেন না।"

আমার নিজের সম্বন্ধে এই সময় একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। মিহিরের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া আমার বুকের ভিতর গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল। কেন বলিতে পারি না, কিন্তু এই সময় হইতে আমার স্বভাব পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হইল।

পাল মহাশয় বলিলেন,—"প্রাণ থাকিতে তোমাকে আমি ধরা দিতে দিব না। পলাইবার কোন উপায় কি নাই?"

এই সময় বাটীর নিম্নে অন্দর মহলের দরজায় সবলে কে আঘাত করিতে লাগিল। দরজা যেন ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল।

শশব্যস্ত হইয়া সকলে আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম। পাল মহাশয় বলিলেন, "ঐ পুলিশ আসিয়াছে।"

পাল মহাশয়ের কন্যা ও গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিলেন। মিহির পুনরায় তাঁহাদিগকে বুঝাইতে লাগিল। মিহির বলিল,—"ভয় নাই মা!

কাঁদিও না। অন্তর্যামী ভগবান্ জানেন যে, আমি কোন দোষে দোষী নই। তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন।"

দরজায় অতি সবলে আঘাত হইতে লাগিল। দরজা যেন ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল।

পাল মহাশয় বারেণ্ডায় গিয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে ও? দরজা ভাঙ্গে কে?"

বাহির দিকে নীচে হইতে কে উত্তর দিল,—"আমরা পুলিশের লোক। দরজা খুলিয়া দাও।"

পাল মহাশয় বলিলেন,—"রাত্রি প্রায় একটা বাজে। এ ঘোর রাত্রিতে আমি দরজা খুলিয়া দিতে পারি না। যদি তোমাদের কোন প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে প্রাতঃকালে আসিও, তখন দ্বার খুলিয়া দিব। রাত্রিকালে ঘরের ভিতর প্রবেশ কবিবার আইন নাই।"

পুলিশের লোক উত্তর করিল,—"দ্বার খুলিয়া দাও। যদি না খুলিয়া দাও, তাহা হইলে দ্বার আমরা ভাঙ্গিয়া ফেলিব। তোমার ঘরে খুনী আসামী আছে।"

পাল মহাশয় বলিলেন,—"আমার ঘরে খুনী আসামী কোথা হইতে আসিবে? এ ঘোর রাত্রিতে আমি দ্বার খুলিয়া দিব না;—তোমরা পুলিশের লোক হও আর যেই হও।"

তাহারা দ্বার যেন ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিল। পাল মহাশয় ঘরের ভিতর আসিয়া বলিলেন,—"সর্বনাশ হইল! আর কোন উপায় নাই! মিহির এইবার ধরা পড়িল! সর্বনাশ হইল!"

মিহিরের এক হাত মা ধরিয়াছিলেন ও অপর হাত ভগিনী ধরিয়াছিল। মিহিরকে মাঝখানে রাখিয়া, দুই জনে পার্শ্বে বসিয়া ক্রমাগত কাঁদিতেছিলেন। পাল মহাশয়ের এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া, ভগিনী সহসা মিহিরের হাত ছাড়িয়া দিল। তাহার পর সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আঁচলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে পিতাকে সে বলিল,—'বাবা! নীচে গিয়া পুলিশের লোককে তুমি দরজা খুলিয়া দাও। আমি মনে মনে এক

উপায় স্থির করিয়াছি। ভগবানের কৃপায় আমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে।”

কন্যার কথা শুনিয়া আমরা সকলেই অবাক্ হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম।

কন্যা ধীর-গম্ভীর স্বরে ভ্রাতাকে বলিল,—“দাদা, উঠ! মদন বাবুর ঘরে গিয়া তাঁহার বিছানায় তুমি শয়ন কর। বারেণ্ডার দ্বারে ওদিক্ হইতে তুমি শিকল দিয়া দাও, এদিক হইতে সেই দ্বারে আমি খিল দিতেছি।”

পাল মহাশয়ের কন্যা তাহার পর মাদুরের উপর হইতে সেই রাক্ষসের মুখস ও সেই পরচুল তুলিয়া লইল। স্বহস্তে সেই মুখস ও সেই পরচুলের দাড়ি গোঁপ সে আমার মুখে পরাইয়া দিল।

সকলে তাহার অভিসন্ধি তখন বুঝিতে পারিল। পাল মহাশয় বলিলেন, “রাধারাণী মা! ধন্য তোমার বুদ্ধি! তোমার বুদ্ধিবলে ও ভগবানের কৃপায় মিহির বোধ হয়, এবার নিষ্কৃতি পাইবে। মিহির! উঠ বাবা! শীঘ্র মদনবাবুর ঘরে তুমি গমন কর!”

পাল মহাশয়ের কন্যার নাম রাধারাণী।

দ্বাদশ অধ্যায়

মদনের প্রতিজ্ঞা

বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া রাধারণী মিহিরকে আমার ঘর দেখাইয়া দিল। ভিতর বাড়ি হইতে বাহির-বাড়িতে গমন করিয়া, মিহির প্রথম বারেণ্ডার দ্বারে শিকল দিল। তাহার পর, আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া সে ঘরেরও দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। অবশেষে সে আমার বিছানায় শয়ন করিল।

দ্বার খুলিয়া দিবার নিমিত্ত পাল মহাশয় এখনও নীচে গমন করেন নাই। রাধারাণী সে জন্য পুনরায় তাঁহাকে বলিল, “বাবা! তুমি নীচে গিয়া পুলিশের লোককে দ্বার খুলিয়া দাও। দ্বার খুলিতে কিন্তু একটু গলগণ্ড করিও। উপরে কেবল তোমার ঘরের দ্বার খোলা থাকুক।

প্রদীপ নিবাইয়া মা ও আমি অন্য ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া শয়ন করি।”

পাল মহাশয় প্রথম বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে পুলিশের লোককে বলিলেন,—“আপনাদের আর কষ্ট করিতে হইবে না। এখনি নীচে গিয়া আমি দ্বার খুলিয়া দিতেছি।”

এই বলিয়া সিঁড়ি দিয়া আস্তে আস্তে তিনি নীচে নামিতে লাগিলেন।

পরচুল ও মুখস পরিয়া অবাক্ হইয়া এতক্ষণ আমি চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম। রাধারাণী স্বহস্তে আমার এই সাজ করিয়া দিয়াছিল। তাহার কোমল হস্তস্পর্শে শরীর আমার রোমাঞ্চ হইয়াছিল। সেই সুখে মুগ্ধ হইয়া, চিন্তা করিতে এতক্ষণ আমি সময় পাই নাই। কিন্তু এখন আমার বড় ভয় হইল। আমি ভাবিলাম,—“এ মন্দ কথা নয়! রাক্ষসের হাত হইতে কত কষ্টে পরিত্রাণ পাইলাম। এখন দেখিতেছি, আমার ফাঁসীর যোগাড় হইতেছে। নিয়োগী মহাশয় পুলিশকে নিশ্চয় বলিয়াছেন যে, রাক্ষসের সাজ সাজিয়া খুনী আসামী বাড়িতে আগমন করে। সুতরাং পুলিশ আসিয়াই আমাকে ধরিয়া ফেলিবে। তাহার পর, আমাকে থানায় লইয়া যাইবে। তাহার পর, আমার নামে মোকদ্দমা করিবে। তাহার পর, আমাকে ফাঁসীকাঠে ঝুলাইয়া দিবে। আমাকে দিয়া রাধারাণী ভ্রাতার প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছে। মেয়েটি সামান্য মেয়ে নয়!”

এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় মিহিরের সেই দুঃখের কাহিনী আমার স্মরণ হইল। আপনাকে ধিক্কার দিয়া আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম,—“ছি, মদন! তুমি না এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, আজ হইতে আর পাগলামি করিবে না? আর কখন কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিবে না? আজ হইতে তুমি তোমার স্বভাব পরিবর্তন করিবে? ছি, মদন! তোমার কি লজ্জা নাই?”

এক দিনে সামান্য কথায় মানুষের চক্ষু ফুটিয়া যে চৈতন্য হয়, তাহা আপনারা অসম্ভব বিবেচনা করিবেন না। লালা বাবু তাহার দৃষ্টান্ত।

কথিত আছে যে, এক দিন লালা বাবু বিষয়কর্মে সাতিশয় ব্যস্ত ছিলেন। বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল তথাপি স্নান আহার করিতে তিনি যাইলেন না। বাড়ির ভিতর হইতে কয়বার লোক তাঁহাকে ডাকিতে আসিল, তবুও তিনি উঠিলেন না। অবশেষে তাঁহার কন্যা আসিয়া বলিল,—"বাবা! বেলা গেল যে!" "বেলা গেল", এই দুইটি কথায় লালা বাবুর হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত হইতে সংসারের প্রতি তাঁহার বৈরাগ্য জন্মিল।

মিহিরের কাহিনী শুনিয়া আমারও আজ সেইরূপ হইল। আমার স্বভাবে যে সমুদয় দোষ আছে, এত দিন তাহা আমি দেখি নাই। সে সমুদয় দোষ এখন আমার প্রত্যক্ষ হইল। তাহার পর আমি ভাবিতে লাগিলাম,—"সংসার কি ভয়ানক স্থান! মিহির সম্পূর্ণ নিরপরাধ; নিশ্চয় খুন করে নাই। তথাপি তাহাকে কত না কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। ধরা পড়িলে হয় তো তাহার ফাঁসীও হইবে। অন্তর্যামী ভগবান কেন এমন করিতেছেন? এ রহস্য আমি বুঝিতে পারি না। হে ঈশ্বর! তুমি জান; আমি কিছুই জানি না।"

এইরূপ ভাবিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে,—"আজ হইতে যথাসাধ্য সকল বিষয়ে আমি চুপ করিয়া থাকিব। তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক।"

ভ্রাতাকে আমার ঘর দেখাইয়া দিয়া, বারেণ্ডার দ্বারে ভিতর হইতে খিল দিয়া রাধারাণী পুনরায় আমার নিকট আসিয়া বলিল,—"আপনি ভয় করিবেন না। আপনি যে দাদা নহেন, তাহা জানিতে পারিলেই পুলিশ আপনাকে ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া আপনি শীঘ্র পরিচয় দিবেন না। যত বিলম্ব করিতে পারেন, ততই ভাল। কারণ, বিলম্ব হইলে দাদাকে সরাইতে আমরা সময় পাইব।"

রাধারাণীর মধুর বচনে আমার মন আশ্বাসিত হইল। আমিও তখন মনে মনে বুঝিয়া দেখিলাম যে, সত্য বটে; আমাকে কেন তাহারা ফাঁসী দিবে? আমি যে মিহির নই, জানিতে পারিলেই তাহারা

আমাকে ছাড়িয়া দিবে। আমার নাম-ধাম প্রকাশ করিতে আমি যত পারি, তত বিলম্ব করিব।

রাধারাণী পুনরায় বলিল,—"আপনার এ ঘরে থাকা উচিত নহে। আপনাকে অন্য স্থানে যাইতে হইবে। আসুন!"

রাধারাণীর সহিত সে ঘর হইতে আমি বাহির হইলাম। চক্ষুর উপরে মুখসে দুইটি গোল ছিদ্র ছিল। তাহার পূর্বে রাক্ষসের ভয়াবহ চক্ষু কোটর বলিয়া আমার প্রতীতি হইয়াছিল। সেই ছিদ্র দিয়া আমি দেখিতে পাইতেছিলাম। তেতালায় উঠিবার নিমিত্ত পূর্বে যে স্থানে সিঁড়ি ছিল, তাহার পার্শ্বে সামান্য একটু নিভৃত অন্ধকারময় স্থান ছিল। সে স্থানে যে ভগ্ন প্রাচীর আছে, তাহার কোণে রাধারাণী আমাকে বসিতে বলিল। আমি সেই কোণে বসিলাম। ঘর হইতে রাধারাণী মাদুরটি তুলিয়া আনিয়াছিল। সেই মাদুর সে আড়াল করিয়া দিল। মাদুরের অন্তরালে চুপ করিয়া আমি বসিয়া রহিলাম। নানারূপ আশ্বাস-বাক্যে আমাকে প্রবোধ দিয়া রাধারাণী সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

প্রাচীরের কোণে মাদুরের আড়ালে বসিয়া, শব্দ শুনিয়া, সমুদয় ঘটনা আমি বুঝিতে পারিলাম। পাল মহাশয় দ্বার খুলিয়া দিলেন; সে শব্দ আমি পাইলাম। অনেকগুলি লোক বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল; সে শব্দ আমি পাইলাম। সাত আট জন লোক, তড়্‌তড়্‌ করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল; সে শব্দ আমি পাইলাম। পাল মহাশয়ের তিনটি ঘর আতি পাতি করিয়া তাহারা খুঁজিতে লাগিল; সে শব্দও আমি পাইলাম। তাহাদের অনুসন্ধান যে বৃথা হইল, তাহাদের কথাবার্তায় তাহাও বুঝিতে পারিলাম। অবশেষে দুই জন লোক আমার দিকে আসিতেছে, পদ-শব্দে তাহাও আমি বুঝিলাম।

যে স্থানে আমি লুক্কায়িত ছিলাম, সেই দুই জন লোক সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোল লণ্ঠনের প্রখর আলোক তাহারা মাদুরের উপর ধরিল। তাহার পর, এক জন অগ্রসর হইয়া মাদুরটি

সরাইয়া ফেলিল। তৎক্ষণাৎ সেই দুই জন লোক এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"আসামী পাইয়াছি। আসামী পাইয়াছি।"

সেই কথা শুনিয়া পুলিশের অন্যান্য লোক সেই স্থানে দৌড়িয়া আসিল। তাহাদের মধ্যে এক জন তৎক্ষণাৎ আমার হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া দিল। ঘরের ভিতর পাল মহাশয়ের কন্যা ও গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এক জন পুলিশের লোক আমার মুখ হইতে সেই রাক্ষসের মুখস খুলিতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যিনি কর্তা, তিনি তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "উঁ হুঁ। মুখস খুলিও না। এই অবস্থাতেই ইহাকে সাহেবের নিকট লইয়া যাইব।"

আমার ভয় হইয়াছিল যে, মুখস খুলিলে পাছে কেহ আমাকে চিনিতে পারে! রাধারাণীর সমুদয় আয়োজন তাহা হইলে বৃথা হইত। নিয়োগী তখন সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন না বটে; কিন্তু পুলিশের লোক যখন আমাকে থানায় লইয়া যায়, সেই সময় বাহির-বাটির যত বাসাড়ে তামাসা দেখিবার নিমিত্ত আপন আপন ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল। নীচের বাসাড়েগণ নীচে ও দোতালার বাসাড়েগণ উপরের বারেণ্ডার রেল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সকলের সম্মুখ দিয়া পুলিশের লোক আমাকে লইয়া গেল। মুখস খুলিলে তাহারা আমাকে চিনিতে পারিত। মুখসের চক্ষু-কোটর দিয়া আমি সকলকে দেখিলাম। নিয়োগীকে কোন স্থানে দেখিতে পাইলাম না। নিয়োগী জানিতেন না যে, তাহার পুত্র পাল মহাশয়কে গোপনে সংবাদ দিয়া, তাঁহার পরিশ্রম বিফল করিয়াছে। যেন এ ব্যাপারের কিছু জানেন না, পর দিন পাল মহাশয়কে তাহাই বলিবার নিমিত্ত তিনি বোধ হয়, আপনার দ্বার বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতর বসিয়াছিলেন। দালালকেও কোন স্থানে দেখিতে পাইলাম না।

আমি থানায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। সাহেবের সম্মুখে আমার মুখস খোলা হইল। কিন্তু পরচুলের দাড়ি গোঁফ যেমন তেমনি রহিল। থানার সাহেব আমাকে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আমি

কোন উত্তর করিলাম না। আমাকে গারদে কয়েদ করিয়া রাখা হইল।

গারদে আমি বসিয়া আছি, এমন সময়ে বাহিরে নিয়োগীর গলার শব্দ পাইলাম। নিয়োগীর সহিত পুলিশের যে কথাবার্তা হইল, তাহাতে আমি বুঝিলাম যে, মিহিরকে ধরিয়া দিবার নিমিত্ত পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দিবার ঘোষণা ছিল। নিয়োগী সেই পুরস্কারের প্রার্থনা করিলেন। পুলিশের লোক বলিল যে,—"রও! আগে ইহার মোকদ্দমা হউক, তাহার পর তুমি সে পুরস্কার পাইবে।" সেই কথা শুনিয়া নিয়োগী মহাশয় প্রস্থান করিলেন।

পুলিশের লোক পরদিন আমাকে আর একজন সাহেবের নিকট লইয়া গেল। সে সাহেবও আমাকে ছুই চারি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কিন্তু একটি কথাও মুখ দিয়া বাহির করিলাম না।

হুগলীতে সেই খুন হইয়াছিল। আমাকে হুগলীতে লইয়া গিয়া সে স্থানের পুলিশের হাতে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত সাহেব আজ্ঞা করিলেন। ছুই জন পুলিশের লোক আমাকে হুগলীতে লইয়া চলিল। আমরা তিন জনে রেলগাড়ীতে গিয়া বসিলাম। আমার হাতে হাতকড়ি ছিল। কিন্তু পথে যাইতে কৌশল করিয়া, আমি সেই পরচুলের দাড়ি গোঁফ খুলিয়া চুপি চুপি গাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দিলাম। পরক্ষণেই পুলিশের লোক আমার দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইল। সে যে পরচুল, তা বোধ হয়, তাহারা জানিত না। তাহারা বলিল,—"তুই এক জন পাকা বদমায়েস!"

যথাসময়ে আমরা হুগলীর থানায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। কলিকাতা পুলিশের লোক হুগলী পুলিশের হাতে আমাকে সমর্পণ করিয়া চলিয়া গেল। হুগলী থানার এক জন কর্মচারী মিহিরকে জানিত। সে তখন থানায় উপস্থিত ছিল না। কিছুক্ষণ পরে সে আসিয়া আমাকে দেখিয়া বলিল,—"মিহির পাল! এ কেন মিহির পাল হবে?"

এই কথা শুনিয়া থানার দারোগা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে তুমি কে?"

এইবার আমার মুখ দিয়া কথা ফুটিল। আমি বলিলাম,—"আমি মদন ঘোষ।"

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মদন ঘোষ আবার কে?"

নাম ধাম প্রভৃতি বলিয়া, আমি আমার সমুদয় পরিচয় প্রদান করিলাম। তাহা শুনিয়া, উপস্থিত সকল লোকেই ঘোরতর বিস্মিত হইল।

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কলিকাতা পুলিশ তোমাকে ধরিয়া আনিল কেন? আর মিহির বলিয়া তোমকে এ স্থানে দিয়া গেল কেন?"

আমি উত্তর করিলাম,—"পাল মহাশয় ও আমি এক বাড়িতে বাস করি। তাঁহার সহিত আমার সদ্ভাব আছে। তামাসা ছলে রাক্ষসের মত মুখস পরিয়া, পাল মহাশয়ের পরিবারবর্গকে আমি ভয় দেখাইতে গিয়াছিলাম। সেই অবস্থায় কলিকাতা পুলিশের লোক আমাকে মিহির মনে করিয়া ধৃত করিল"

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কলিকাতার থানায় তুমি আপনার পরিচয় প্রদান কর নাই কেন?"

আমি বলিলাম,—"ভয়ে আমি হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল।"

যাহা হউক, হুগলীর পুলিশের লোক আমাকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিল না। সে স্থানের সাহেবের নিকট আমাকে লইয়া গেল। আরও দুইদিন ধরিয়া ভালরূপে তদন্ত করিল। হুগলীর যে সমুদয় লোক মিহিরকে জানিত, তাহাদিগকে আনিয়া আমাকে দেখাইল। পাল মহাশয়ের গ্রামের কয়েক জন লোককে আনিয়া আমাকে দেখাইল। যখন সকলেই বলিল যে, আমি মিহির নই, তখন আমাকে তাহারা ছাড়িয়া দিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নিয়োগী মহাশয়ের গান

তিন দিন পরে অপরাহ্ণে আমি আমার কলিকাতার বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, নিয়োগী আপনার ঘরের দ্বারের নিকট একটি কেরোসিন তেলের পুরাতন ও ভাঙ্গা বাক্সর উপর বসিয়া খবরের কাগজ পাঠ করিতেছেন। সকলে যে ভাবে সংবাদ-পত্র পাঠ করে, নিয়োগী সে ভাবে পাঠ করিতেছিলেন না; গীত গাহিবার ন্যায় সুর করিয়া গদ্য লেখা তিনি পাঠ করিতেছিলেন। যথা,—

ম-অ-অ-অ-হে-এ-এ-এশ-পা-আ-আ-আ-লে-এ-এ-এর ইত্যাদি।

সংবাদপত্রের যে কথাগুলি লইয়া তিনি মনের আনন্দে গান করিতেছিলেন, তাহা এইরূপ ছিল,—

"মহেশ পালের পুত্র মিহির দুই বৎসর পূর্বে হুগলীতে খুনী মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হইয়া ফেরার হইয়াছিল। মুখস্ পরিয়া ছদ্মবেশে মাঝে মাঝে সে পিতা-মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিত। এই অবস্থায় সেদিন সে ধরা পড়িয়াছে।" ইত্যাদি।

মিহির পাল ধরা পড়িয়াছে। আনন্দে নিয়োগী মহাশয়ের মন একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আনন্দের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, তিনি সেই গদ্য ভাষায় লিখিত সংবাদটি গীতের ন্যায় গাহিতেছিলেন। নিয়োগী এখনও জানিতে পারেন নাই যে, প্রকৃত মিহির সে রাত্রি ধরা পড়ে নাই, জাল মিহির ধরা পড়িয়াছিল।

আমাকে দেখিয়া ভট্টাচার্য মহাশয় ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হে মদন। এত দিন কোথায় ছিলে?"

আমি উত্তর করিলাম,—"সে সব কথা আপনাকে পরে বলিব। পাল মহাশয় কেমন আছেন?"

ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন,—"পাল মহাশয় এখানে নাই। যে

রাত্রিতে তাঁহার পুত্র ধরা পড়িল, সেই রাত্রিতেই সপরিবারে তিনি এ স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। পুত্রের মোকদ্দমার তদ্বির করিবার নিমিত্ত তিনি বোধ হয়, হুগলী গিয়াছেন। ভাল কথা! তোমার ঘরের চাবি আমার কাছে আছে। তিনি আমাকে সেই চাবি দিয়া গিয়াছেন।”

ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট হইতে চাবি লইয়া, আমি আমার ঘরে গমন করিলাম। পাল মহাশয় কোথায় গিয়াছেন, বিছানায় শুইয়া সেই কথা ভাবিতে লাগিলাম।

কয় দিন অনুপস্থিতির পর, আমি অফিস যাইলাম। আফিস হইতে আসিয়া বাসার সকলকে আমি পাল মহাশয়ের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলাম; কিন্তু কেহই আমাকে বলিতে পারিল না। রবিবার দিন আমি পুনরায় হুগলীতে গিয়া, তাঁহার অনুসন্ধান করিলাম। সে অনুসন্ধান নিষ্ফল হইল। তাহার পর, আর এক দিন রবিবার তাঁহার গ্রামে গিয়া তাঁহার অনুসন্ধান লইলাম। কিন্তু সে স্থানেও কেহ কিছু বলিতে পারিল না। এইরূপে বহু দিন ধরিয়া ক্রমাগত আমি তাঁহার অন্বেষণ করিলাম। কিন্তু আমার সকল চেষ্টা বিফল হইল। অবশেষে হতাশ হইয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

নিয়োগী মহাশয় ক্রমে জানিতে পারিলেন যে, প্রকৃত মিহির ধরা পড়ে নাই; আমি যে মিহির সাজিয়া ধরাদিয়াছিলাম, সকল লোকেই ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিল। একদিকে প্রতিহিংসা ও পুরস্কার বিষয়ে নিয়োগী বিফলমনোরথ হইলেন; অপর দিকে তাঁহার পুত্র বেচুর ক্রমে আসন্নকাল উপস্থিত হইল।

একদিন বেলা নয়টার সময় আমি আফিস যাইতেছি, এমন সময় বেচু আমাকে তাহার নিকট ডাকিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, সে আর অধিক দিন বাঁচিবে না।

বেচু আমাকে বলিল,—“মদন বাবু! আপনাকে আমি একটি বড় গোপন কথা বলিব। সেই কথা বলিবার নিমিত্ত আজ কয় দিন ধরিয়া আমি সুযোগ খুঁজিতেছি; কিন্তু পিতার ভয়ে আমি বলিতে পারি

নাই। আজ পিতা আমাদের গ্রামে গিয়াছেন। সেই জন্য আপনাকে ডাকিলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি কথা?"

নিয়োগী-পুত্র উত্তর করিল,—"আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, তিন চারি দিনের মধ্যেই আমার মৃত্যু হইবে। আমার বড় ভয় হইতেছে যে, মৃত্যুর পর আমি ঈশ্বরের নিকট কি করিয়া দাঁড়াইব। ঘোর নরক। ঘোর নরক! ভাবিলে শরীর আমার শিহরিয়া উঠে।"

এই কথা বলিয়া বেচু কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,—"বেচু বাবু! ঈশ্বর দয়াময়। মানুষের শরীরে যে সামান্য দয়া আছে, সে কেবল সেই দয়া-সাগরের এক বিন্দুমাত্র। যদি আপনি কোন পাপ করিয়া থাকেন, তাহার নিমিত্ত আন্তরিক অনুতাপ করুন। তাহাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। দয়াময় আপনাকে ক্ষমা করিবেন।"

নিয়োগী-পুত্র পুনরায় বলিল,—"দেখুন, মদন বাবু! এই আসন্ন কালে সকল বিষয় আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। জ্ঞান হইয়া পর্য্যন্ত আমি যাহা কিছু করিয়াছি, ব্যোম জগতে সে সমুদয় যেন ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। আমার সমুদয় চিন্তা, কথা ও কাজের ফল আমার জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে। সে সমুদয় আমাকে ভোগ করিতে হইবে। কাজ করিলেই যে তাহার ফল আছে, মানুষ অনুক্ষণ তাহা দেখিতেছে। হায় হায়! তবু মানুষ কেন কুকর্ম্ম করে! মদন বাবু! মানুষ আর যাহা করুক, মানুষ সত্য হইতে যেন বিচলিত না হয়: অন্য পাপ মানুষের বিরুদ্ধে, কিন্তু অসত্য ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। মনুষ্য-জীবন ছেলেখেলা নহে,—ধর্ম্মও খেলা করিবার বস্তু নহে যে, তাহা লইয়া যে যা মনে করিবে, সে তাহাই করিবে। আমি সত্য বলিতেছি যে, পরকাল আছে, নরক আছে। এই মৃত্যুকালে আমি একান্ত মনে মানুষকে এই উপদেশ প্রদান করি যে, মানুষ যেন সত্য হইতে বিচলিত না হয়।"

তাহার কথা শুনিয়া, আমার শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। আমিও যেন নরক প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলাম। পাপীদিগের পরিত্রাহি ডাক

আমারও যেন কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। শিহরিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সত্য মিথ্যা কি, মোটা-মুটি তাহা আমি বুঝি। কিন্তু ধর্ম বিষয়ে সত্য কি ”

বেচু উত্তর করিল,—"আপনি আমাকে বড় কঠিন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্ম বিষয়ে প্রকৃত সত্য কি, সকলে তাহা অনুভব করিতে পারে না ; অনুভব করিবার তাহাদের ক্ষমতা নাই।"

এইরূপ বলিয়া সে আমাকে তাহার নিজের বিশ্বাসের কথা বলিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমি মনোযোগের সহিত তাহা শ্রবণ করিলাম। আমার বোধ হইল যে, পীড়িত হইয়া পর্য্যন্ত নিয়োগী পুত্র একান্ত মনে সর্বদা ঈশ্বরকে ডাকিয়াছে। কৃপা কবিয়া তিনি তাহার চক্ষু উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তা না হইলে, এরূপ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, এত অল্প বয়সে এরূপ জ্ঞান হয় না। প্রথম প্রথম তাহার মুখ দেখিয়া ও তাহার কথাবার্তা শুনিয়া, তাহার প্রতি আমার বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। কিন্তু এখন আমি বুঝিলাম যে, ক্রমাগত ভগবান্‌কে ডাকিয়া পিতৃদত্ত কলুষিত মনকে সে পবিত্র করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার নিকট বসিয়া তাহার কথা শুনিয়া, আমারও চক্ষু যেন উন্মুক্ত হইল। আমি রূপবান, আমি গুণবান্, আমি বুদ্ধিমান, আমি সাহসী পুরুষ,—আমার মনে এই প্রকার যে অভিমান ছিল, মুহূর্তমধ্যে সে সমুদয় ভাব আমার চিত্ত হইতে তিরোহিত হইল। কীটস্য কীট,—সামান্য একটা অধম জীব বলিয়া, আমি আমাকে মনে করিতে লাগিলাম। বেচু ধর্মবিষয়ে যাহা আমাকে বলিল, সে সব কথা এ স্থানে বলিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু শেষকালে সে আমাকে এই কয়টি কথা বলিল,—"মদনবাবু! প্রকৃত সত্য কি, তাহা আমি আপনাকে বলিলাম। কিন্তু এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা সকলের নাই। সে নিমিত্ত সাধারণ মনুষ্যকে আমার উপদেশ এই যে, যাহার যেরূপ বিশ্বাস, সে যেন তদনুযায়ী কাজ করে। মনে একরূপ বিশ্বাস বাহিরে অন্যরূপ কাজ, এ যেন কেহ করে না। সেরূপ অসত্য কপট জীবনের ক্ষমা নাই ;. সেরূপ লোককে নিশ্চয় নরকে ডুবিতে হইবে।"

আমি চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম। বেচু পুনরায় আমাকে বলিল,—"যে কথা বলিবার নিমিত্ত আমি আপনাকে ডাকিয়াছি, তাহা এখনও আপনাকে বলি নাই। বড় বিষম কথা! কি করিয়া আপনাকে বলিব, তাই ভাবিতেছি। আপনি অনুতাপের কথা বলিতেছিলেন। আজ এক বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত ঘোর অনুতাপিত হৃদয়ে আমি ঈশ্বরকে ডাকিতেছি। যখন সে দিন মিহিরের আগমন-সংবাদ পিতা পুলিশকে দিতে গেলেন, সেই জন্যই সে দিন মরিতে মরিতে অতি কষ্টে আমি পাল মহাশয়কে গিয়া সাবধান করিলাম। মিহিরের আমি সর্বনাশ করিয়াছি। আমি ভাবিলাম যে, নিরপরাধ মিহিরকে যে আমার সাক্ষাতে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে, তাহা আমি দেখিতে পারিব না।"

বিস্ময়ান্বিত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মিহিরের আপনি সর্বনাশ করিয়াছেন? মিহিরের আপনি কি করিয়াছেন?"

নিয়োগী পুত্র বলিল,—"যে খুনের জন্য মিহির পথে পথে ফিরিতেছে যে খুনের জন্য তাহার ফাঁসি হইবার সম্ভাবনা, সে খুন সে করে নাই, সে খুন আমি করিয়াছি।"

আমি বলিলাম,—"কি! !! সত্য?"

নিয়োগী পুত্র উত্তর করিল,—সম্পূর্ণ সত্য। মিহির, আমি আর সেই ছোকরা,—তাহার নাম বেণী,—আরও তিন চারি জন, হুগলীতে এক বাসায় থাকিয়া স্কুলে পড়িতাম। সকলেই আমরা এক জাতি। আমরা সকলে পরস্পরের কুটুম্ব ও পরিচিত। মিহির ও বেণী এক ঘরে থাকিত। পাল মহাশয়ের সহিত বেণীর পিতার ভূমি সম্প্রত্তি লইয়া বিবাদ হয়। কিন্তু তাহাতে মিহির ও বেণীতে যে সদ্ভাব ছিল, তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। পরীক্ষার টাকা ও অন্যান্য খরচের নিমিত্ত বেণীর পিতা এক শত টাকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমার সাক্ষাতে বেণী সেই টাকাগুলি বিছানায় আপনার শিয়র দেশে বালিশের নিম্নে রাখিয়া দিল। আমার পিতা ধনবান ব্যক্তি নহেন। খরচের টানাটানি আমার সর্বদাই থাকিত। সে টাকাগুলি দেখিয়া আমার লোভ হইল। দৈবের লিখন কেহ খণ্ডাইতে পারে না। সেই দিন রাত্রি দুইটা কি তিনটার

সময় সহসা আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। জাগ্রত হইয়া আমি বিছানায় শুইয়া আছি, এমন সময় মিহির ও বেণী যে ঘরে থাকে, সেই ঘরের দ্বার খুলিবার শব্দ হইল। বিছানা হইতে উঠিয়া, আমিও আস্তে আস্তে আমার ঘরের দ্বার খুলিলাম। দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া দেখিলাম যে, গাড়ু হাতে লইয়া মিহির বাহিরে গেল। আমি ভাবিলাম, উত্তম সুবিধা হইয়াছে। দেখি, বেণীর বালিশের নীচে হইতে নোটগুলি লইতে পারি কি না। এই মনে করিয়া আমি আস্তে আস্তে তাহার ঘরে প্রবেশ করিলাম? ঘর অন্ধকারে পরিপূর্ণ। যাহা হউক, নিঃশব্দে বেণীর বিছানার নিকট গিয়া, আমি নোটগুলি লইতে পারিলাম। নোট লইয়া পলায়ন করিবার উপক্রম করিতেছি, আর বেণী সেই সময় জাগিয়া উঠিল। 'চোর' এই কথা বলিয়া আমাকে সে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলিল।

এত দূর বলিয়া বেচু আর বলিতে পারিল না। তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া অতি দ্রুতভাবে সম্পন্ন হইতে লাগিল। "জল!" এই কথা বলিয়া সে আমাকে গেলাশ দেখাইয়া দিল। তাড়াতাড়ি জলের গেলাশ লইয়া আমি তাহার মুখে ধরিলাম।

চতুর্দশ অধ্যায়

বেচুর শেষ কথা

জল পান করিয়া বেচু কিছু সুস্থ হইল। অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় সে বলিতে আরম্ভ করিল—

"আমাকে ধরিয়া চোর চোর বলিয়া বেণী পুনরায় চীৎকার করিতে উদ্যত হইল। আমি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলাম ও সেখান হইতে পলায়ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু বেণী আমাকে সহজে ছাড়িল না। সেই ঘরের দেয়ালের নিকট সামান্য একটি মেজ ছিল। তাহার উপর বেণী ও মিহিরের পুস্তক, কাগজ-কলম ইত্যাদি থাকিত। মিহিরের বড় একখানি ছুরি ছিল। ছুরিখানি সর্বদাই এই মেজের উপর পড়িয়া থাকিত। অন্ধকারে বেণীর সহিত জড়াজড়ি

করিতে করিতে ক্রমে আমি সেই মেজের উপর গিয়া পড়িলাম। দৈবের ঘটনা! আমার দক্ষিণ হাতটি মেজস্থিত ঠিক সেই ছুরির উপর পড়িল। তখনও বেণী আমাকে সবলে ধরিয়াছিল। তাহাকে যে খুন করিব, সে ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। কিন্তু কোনরূপে তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি না পাইয়া, আমি সেই ছুরি তাহার বুকে মারিয়া বসিলাম। 'বাপ'! বলিয়া বেণী তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল। আমি পলায়ন করিয়া আপনার ঘরে প্রবেশ করিলাম। হায় হায়! এক মিনিট পূর্বে আমি এক জন সাধু সচ্চরিত্রবান্ যুবক ছিলাম। এক মিনিটের মধ্যে আমি চোর, খুনে, নর-পিশাচ হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে মিহির ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার ঘরে গিয়া আলো জ্বালিয়া দেখিলাম যে, বেণী মৃতপ্রায় হইয়াছে, তাহাকে তুলিতে গিয়া মিহিরের শরীর ও কাপড় রক্তে আরক্ত হইয়া গিয়াছে ও সেই স্থানে মিহিরের ছুরি পড়িয়া আছে। ইহা ব্যতীত সেই দিন বৈকাল বেলা বেণী ও মিহিরে কিছু বচসা হইয়াছিল। আমি মনে করিলাম,—ভাল হইয়াছে! এ দোষ সম্পূর্ণরূপে মিহিরের উপর আরোপিত হইতে পারিবে, আর তাহা হইলে আমাকে কেহ সন্দেহ করিবে না। এইরূপ ভাবিয়া, তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিবার নিমিত্ত মিহিরকে আমি পরামর্শ দিলাম। মিহির সে সময় স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সে আমার কথা-মত কার্য করিল। আমার একখানা কাপড় পরিধান করিয়া সে পলায়ন করিল। তাহার পলায়ন, তাহার পরিত্যক্ত রক্তাক্ত কাপড়, তাহার রক্তাক্তছুরি, পূর্ব দিন বেণীর সহিত তাহার বিবাদ এই সকল দেখিয়া ও শুনিয়া পুলিশ তাহাকেই দোষী বলিয়া স্থির করিল অন্য কাহাকেও সন্দেহ করিল না। সে খুনের প্রকৃত বিবরণ এই আমি আপনাকে বলিলাম।"

আমার আফিস-গমন ঘুরিয়া গেল। বেচুকে আমি বলিলাম,—"এ রোগে আপনার মৃত্যু নিশ্চয়, তাহার অধিক বিলম্বও নাই। আজ হউক, কাল হউক, পরশু হউক, শীঘ্রই আপনাকে ঈশ্বরের নিকট দাঁড়াইতে হইবে। নিজের এরূপ গুরুতর অপরাধ অন্যের ঘাড়ে দিয়া, কোন্মুখে

আপনি ঈশ্বরের নিকট দাঁড়াইবেন? অতএব যদি সময় থাকিতে যথার্থই আপনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এ সকল কথা কেবল আমাকে বলিলে হইবে না।"

বেচু জিজ্ঞাসা করিল,—"আমাকে আর কি করিতে বলেন?"

আমি উত্তর করিলাম—"এ সকল কথা আপনাকে পুলিশের নিকট বলিতে হইবে।"

বেচু বলিল,—"তবে শীঘ্র পুলিশের লোককে আপনি ডাকিয়া আনুন। আমার পিতা প্রত্যাগমন করিতে না করিতে আপনি এ কাজ করুন। আমি যে বেণীকে খুন করিয়াছি, তাহা তিনি জানেন না; এ কথা শুনিলে তিনি আমাকে কিছুতেই বলিতে দিবেন না।" আমি তৎক্ষণাৎ থানায় দৌড়িয়া যাইলাম। থানার লোক আসিয়া নিয়োগী-পুত্রের সমুদয় বিবরণ লিখিয়া লইল। তাহার পর, পুলিশের কর্মচারী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বেণীর নিকট হইতে যে নোট তুমি লইয়াছিলে, তাহা কি তুমি খরচ করিয়া ফেলিয়াছ?"

নিয়োগী পুত্র উত্তর করিল—"একখানি পঞ্চাশ টাকার ও পাঁচখানি দশ টাকার নোট ছিল। দশ টাকার পাঁচখানি নোট ভাঙ্গাইয়া আমি খরচ করিয়াছি; কিন্তু পঞ্চাশ টাকার নোটখানি নম্বরী বলিয়া তাহা ভাঙ্গাইতে আমি সাহস করি নাই। সে নোট এখনও আমার নিকট আছে।"

এই বলিয়া বেচু তাহার তোরঙ্গের চাবি আমাকে দিল ও যে কোণে নোটখানি ছিল, তাহা আমাকে বলিয়া দিল। নোটখানি বাহির করিয়া আমি পুলিশের হাতে দিলাম। ইহার কিছু দিন পরে নম্বর দেখিয়া প্রমাণ হইল যে, ইহা বেণীর পিতার প্রেরিত সেই নোট বটে।

পুলিশ বেচুকে থানায় লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিল। আমি ও বেচু দুই জনেই আপত্তি করিলাম। কিন্তু পুলিশ সে কথা শুনিল না। পালকি করিয়া বেচুকে তাহারা লইয়া চলিল। দুধ, জল, ঔষধ প্রভৃতি লইয়া আমিও সঙ্গে চলিলাম। থানা হইতে পুলিশ তাহাকে আদালতে লইয়া গেল। সাহেবের নিকট পুনরায় তাহাকে সমুদয় বৃত্তান্ত প্রদান করিতে

হইল। সাহেব তাহাকে জেলখানার হাসপাতালে পাঠাইতে আদেশ করিলেন। নিজের খরচে আমি উকীল দিয়া জামিনের প্রার্থনা করিলাম; কিন্তু সে খুনী আসামী; জামিন হইল না।

এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নাড়াচাড়া, তাহার উপর ঘোরতর মনের আবেগ, এই সমুদয় কারণে আমি দেখিলাম যে, বেচুর অবস্থা ক্রমশই মন্দ হইয়া আসিতেছে। অপরাহ্নে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের বৈলক্ষণ্য ঘটিল। এ অবস্থায় জেলখানায় তাহাকে গাড়ী করিয়া লইয়া যাইতে পুলিশ সাহস করিল না। পাল্কিতে আস্তে আস্তে তাহাকে লইয়া চলিল। দুইজন পুলিশ-কর্মচারী সঙ্গে চলিল। পাল্কির উপর হাত রাখিয়া, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, রোগীর মুখের দিকে সতত দৃষ্টি রাখিয়া, আমিও সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। গড়ের মাঠে গিয়া রোগীর চক্ষুর ভাব দেখিয়া আমার বড় ভয় হইল। এক নিভৃত বৃক্ষতলে আমি পাল্কি নামাইতে বলিলাম। তাহার পর ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, বেচুর আসন্ন কাল উপস্থিত হইয়াছে। আমি তাহার মুখে বিন্দু বিন্দু জল দিয়া ধীরে ধীরে ভগবানের নাম করিতে লাগিলাম।

এবার আমার পানে চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে বেচু এই কয়টি কথা বলিল,—"মদন বাবু! আমি চলিলাম। রাধারাণীকে আপনি বিবাহ করিবেন। আপনি সংসারী হইবেন। সে দিন ধর্ম বিষয়ে অনেকগুলি কথা আপনাকে বলিয়াছি। আজ আর একটি কথা আপনাকে বলি। একখানি মহানির্বাণতন্ত্র ক্রয় করিবেন। বর্তমান-কালে মানবজাতির অবস্থা বুঝিয়া চরাচরের গুরু শ্রীশ্রীসদাশিব মনুষ্যজাতিকে এই মহারত্ন প্রদান করিয়াছেন। ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের নিকট এই তন্ত্র অনুসারে উপদেশ গ্রহণ করিবেন। তাহার পর, এই তন্ত্র অবলম্বন করিয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করিবেন। তাহা করিলে আপনার ইহকালে সুখ ও পরকালে সদগতি হইবে। আর বিশেষ কথা এই যে, এই তন্ত্রের প্রভাবে অকালমৃত্যুজনিত মহা শোকে আপনার হৃদয় সন্তপ্ত হইবে না। সেই সদাশিব এক্ষণে আমার কণ্ঠে আসীন হইয়াছেন। তাঁহার আদেশে আপনাকে আমি এই কথাগুলি বলিলাম।

আহা ! এই কথাগুলি বলিবার নিমিত্ত বেচু যেন এতক্ষণ জীবিত ছিল। যাই এই কথাগুলি শেষ হইল, আর দেহ হইতে তাহার প্রান-বায়ু অন্তর্হিত হইল। আমি কাঁদিতে লাগিলাম।

বেহারাগণ তাহার মৃতদেহ জেলখানায় লইয়া গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে যাইলাম। আমি মনে করিলাম যে, মৃতদেহ দিবার অনুমতি হইলে, আমি লোক ডাকিয়া আনিব। এইরূপ মনে করিয়া বাহিরে আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে নিয়োগী মহাশয় সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাসায় পৌছিয়া তিনি সমুদয় ঘটনা শুনিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি থানায়, ও থানা হইতে আদালতে গিয়াছিলেন। আদালত হইতে এইস্থানে উপস্থিত হইলেন।

মিহির মনে করিয়া, যে দিন পুলিশে আমাকে ধরিয়া লইয়া যায়, সে দিন হইতে আমার মনের ভাব পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার পর মুমূর্ষু বেচুর নিকট বসিয়া, তাহারা কথাবার্তা শুনিয়া আমার চক্ষু উন্মুক্ত হইয়াছিল। মনুষ্য-জীবন কিরূপ অনিত্য, তাহা আমি বুঝিয়াছিলাম। আমি ভাবিলাম যে, নিয়োগী মহাশয় যেরূপ লোক হউন না কেন, আমি তাঁহার বিচার করিবার কে ? মানুষ দোষে গুণে হইয়া থাকে। নিয়োগী মহাশয়েরও অনেক গুণ থাকিতে পারে,—যে গুণের পরিচয় আমি প্রাপ্ত হই নাই। দোষের ভাগ ত্যাগ করিয়া, মানুষের গুণের ভাগ গ্রহণ করাই যে ভাল, সকলকে আমি এই উপদেশ প্রদান করি। কাহারও প্রতি বিদ্বেষ ভাব মনে স্থান দিও না। কাহাকেও ঘৃণা করিও না। কাহারও প্রতি হিংসা করিও না। অনেক সময় কু-চিন্তা উদয় হইতে পারে। অন্যের ভাল হইয়াছে শুনিয়া, মনে হিংসার উদয় হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিবে। মনে কু-চিন্তা উদয় হইলে, ক্রমাগত ঈশ্বরকে ডাকিতে থাকিবে যে,—"হে ঈশ্বর ! আমার মন হইতে এরূপ চিন্তা দূর কর।

এইরূপ ভাবিয়া আমি কাঁদিতে কাঁদিতে নিয়োগী মহাশয়কে তাঁহার পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ প্রদান করিলাম। এরূপ ঘোর দুঃখ-সংবাদ প্রাপ্ত

হইয়াও তাঁহার অন্তঃকরণ আর্দ্র হইল না ; আমার প্রতি তাঁহার রাগ দূর হইল না। অন্ততঃ তাঁহার কোপ-দৃষ্টি দেখিয়া আমি তাহাই বুঝিলাম। যাহা হউক, তাঁহার পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিমিত্ত লোক ডাকিয়া আনিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। সে অনুমতি তিনি আমাকে প্রদান করিলেন। গাড়ী করিয়া শীঘ্র আমি লোক ডাকিয়া আনিলাম। তাঁহার পুত্রের সৎকার আমরাই করিলাম। দুইদিন পরে নিয়োগী মহাশয় কলিকাতা হইতে প্রস্থান করিলেন। এ পর্যন্ত তাঁহার আর কোন সংবাদ আমি পাই নাই। পাইতে ইচ্ছাও বড় করি না।

পাল মহাশয়ের ও তাঁহার পুত্রের অনুসন্ধানে পুনরায় আমি প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁহার সহিত যাহাদের আলাপ পরিচয় ছিল, একে একে সকলকে তাঁহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহার গ্রামে গিয়া একে একে গ্রামবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম। আরও কত স্থানে গিয়া অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু কেহই তাঁহার সন্ধান আমাকে বলিয়া দিতে পারিল না। মিহির নিরপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে, আর লুক্কায়িত থাকিবার আবশ্যক নাই, এই মর্মে দুইখানি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলাম। তাহাতেও কোন ফল হইল না। কিন্তু তাঁহাদের সহিত পুনরায় যে আমার দেখা হইবে, সে বিষয়ে আমি হতাশ হইলাম না। কারণ, পাল মহাশয় সম্পত্তিশালী লোক। এক দিন না এক দিন তাঁহাকে দেশে আসিতেই হইবে। তাহা ব্যতীত, কলিকাতার বাসা তিনি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। কলিকাতার সেই তিনটি ঘরে তাঁহার জিনিসপত্র আছে। তাহাতে চাবি দিয়া গিয়াছেন। এক দিন না একদিন কেহ না কেহ সে দ্রব্যাদি লইতে আসিবে। এই প্রত্যাশায় আমি দিনাতিপাত করিতে লাগিলাম।

পঞ্চদশ অধ্যায়

আগু কষ্ট—পরে ইষ্ট

এইরূপে আরও তিন মাস কাটিয়া গেল। ভাদ্র মাস পড়িল। সে বৎসর দারুণ বর্ষা হইয়াছিল। পথঘাট জলে জলময় ও কাদায় কর্দমময় হইয়াছিল। একদিন অপরাহ্ণ চারিটার সময় আফিসে বসিয়া কাজ করিতেছি, এমন সময় এক জন উৎকলবাসী আমাকে একখানি চিঠি আনিয়া দিল। সে পত্রে কেবল এই কয়টি কথা লেখা ছিল,—"অনুগ্রহ করিয়া অতি গোপনে এই লোকের সহিত শীঘ্র আসিবেন। আসিলে সকল কথা জানিতে পারিবেন।"

পাল মহাশয় ও মিহিরের জন্য সর্বদাই আমার মন উদ্বিগ্ন ছিল। চিঠিখানি পাইবামাত্র আমার মনে হইল যে, এইবার বোধ হয়, তাঁহাদের সন্ধান পাইলাম। কালবিলম্ব না করিয়া, আমি সেই লোকের সহিত চলিলাম। কলিকাতার যে অংশে অতি ঘন বসতি, উড়িয়া আমাকে সেই স্থানে লইয়া গেল। সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর সঙ্কীর্ণতর গলি, তাহার ভিতর একখানি খোলার বাড়ীতে আমি প্রবেশ করিলাম। অতি কুৎসিত স্থান, দুর্গন্ধে নাড়ি উঠিয়া যায়। চারিদিক কাদায় ও ময়লায় পরিপূর্ণ। সেই বাটীতে অতি সামান্য ও ক্ষুদ্র একখানি ঘর আমাকে দেখাইয়া দিল। ঘরের মেজে নিতান্ত আর্দ্র- যেন জল সপ-সপ করিতেছিল। আমি দেখিলাম যে, সেই ভিজা মেজেতে সামান্য একটি মাদুরের উপর গেরুয়া পরিচ্ছদ পরিহিত এক যুবক পড়িয়া আছে। "কেও মিহির"— এই কথা বলিয়া আমি তাহার নিকট গিয়া বসিলাম।

মিহির আমার দিকে চাহিয়া দেখিল। চিনিতে পারিলাম বটে; কিন্তু সে মিহির আর নাই; তাহার দেহ অস্থিচর্মসার হইয়া গিয়াছে; তাহার মুখ মলিন হইয়া গিয়াছে। তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম যে, শরীর হইতে অগ্নির ন্যায় উত্তাপ বাহির হইতেছে। মাঝে মাঝে অতি কষ্টের সহিত সে কাসিতেছে। নিশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সাধন

করিতেও যেন তাহার বড় ক্লেশ হইতেছে। আমি পুনরায় বলিলাম,—"মিহির!"

মিহির মৃদুস্বরে বলিল,—"চুপ চুপ! আমার নাম ধরিয়া ডাকিও না, কেহ শুনিতে পাইলে এখনি আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে।"

আমি বলিলাম,—"তবে তুমি এখনও সে কথা জান না? মিহির! সে ভয় আর কিছুমাত্র নাই। তুমি যে নিরপরাধ, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বেণীকে নিয়োগী পুত্র খুন করিয়াছিল; পুলিশের কাছে ও আদালতে সাহেবের কাছে, সে তাহা স্বীকার করিয়াছে। তোমার আর কোন ভয় নাই।"

এই কথা শুনিয়া মিহির বলিল,—"আমাকে তুলিয়া বসাও। আমি উঠিতে পারি না।"

আমি মিহিরকে তুলিয়া বসাইলাম। আমার স্কন্ধে মাথা ও বক্ষঃস্থলে আপনার শরীর রাখিয়া, সে বসিয়া রহিল। তাহার পর, বেচুর আদ্যোপান্ত বিবরণ বার বার সে আমার মুখ হইতে শুনিল। সেই বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাহার রোগ ও যাতনার যেন অনেকটা উপশম হইল, আর তাহার শরীরে যেন একটু বল হইল।

তাহার পর, আমি তাহাকে বলিলাম,—"মিহির! ভাই! তোমাকে আর ক্ষণকালের জন্য আমি এ স্থানে রাখিতে পারি না। এ স্থানে সহজ মানুষ মরিয়া যায়। তুমি ভয়ানক জ্বর ভোগ করিতেছ। বুকেও বোধ হয়, কিছু রোগ হইয়া থাকিবে। অতএব তোমাকে আমি আমার বাসায় লইয়া যাইব।"

মিহির উত্তর করিল,—"কি করিয়া তাহা হইবে! আমার হাতে একটিও পয়সা নাই। এই সন্ন্যাসীবেশে বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া, আজ দশ দিন কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছি। কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াই আমি শ্যামবাজারে গদাধর মোড়লের নিকট গমন করিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তাহার পরদিন হইতে এই বিষম জ্বর দ্বারা আমি আক্রান্ত হইয়াছি। সেই অবধি বিছানায় পড়িয়া আছি;—না ঔষধ, না পথ্য। গাড়ীতে যাইতে পারিব না, পালকি করিয়া

যাইতে হইবে। কিন্তু গাড়ী কি পাল্‌কি ভাড়া কোথায় পাইব যে, তোমার সহিত তোমার বাসায় যাইব? তবে তুমি যদি গদাধর মোড়লের নিকট একবার যাইতে পার, তাহা হইলে হয়।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “গদাধর মোড়ল কে?

মিহির উত্তর করিল,—“তিনি বাবার বন্ধু, আমাদের স্বজাতি। কলিকাতায় তিনি ব্যবসায় করেন। শ্যামবাজারে তাঁহার বাসা, তোমার সহায়তায় যে রাত্রে আমি পুলিশের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাই, সেই দিন বাবার নিকট যাহা কিছু নগদ টাকা ছিল, তাহা তিনি আমাকে প্রদান করিয়া বলিলেন যে, এ টাকা ফুরাইয়া গেলে তুমি গদাধর মোড়লের নিকট যাইবে, যখন যাহা আবশ্যক হইবে, গদাধর তোমাকে দিবে। আমাকে কদাচ তুমি পত্র লিখিবে না। কারণ, সেই পত্রের অনুসরণে পুলিশে তোমার সন্ধান পাইতে পারে।”

একটু চুপ করিয়া মিহির পুনরায় বলিল,—“তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্বেও আমি গদাধর মোড়লকে পত্র লিখিতাম, পিতাকে লিখিতাম না। গদাধর মোড়ল পিতাকে আমার সংবাদ দিতেন। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া যে দিন বাটী যাইতে ইচ্ছা হইত, সে সংবাদও গদাধর মোড়লের দ্বারা পিতাকে জানাইতাম। পিতা, মাতা ও রাধারাণী সকলে আমার জন্য বসিয়া থাকিতেন। আমি উপস্থিত হইলে, জানালার গরাদে তুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত রাধারাণী পথ করিয়া দিত।”

আদি জিজ্ঞাসা করিলাম,—“সে, রাত্রি তুমি কিরূপে পলায়ন করিলে? আর তাহার পর এত দিন কোথায় ছিলে? তুমি যে নিরপরাধ, তাহা যখন হইল তখন আমি প্রমাণ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম। সে সংবাদ-পত্র তোমার হাতে পড়ে নাই?”

মিহির উত্তর করিল,—“না সে বিজ্ঞাপন আমি দেখি নাই। মৃত্যুকালে বেচু আপনার দোষ স্বীকার করিয়া, আমাকে যে খুনের অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দিয়াছে, সেকথা তোমার মুখ হইতে এইমাত্র শুনিলাম। সে রাত্রি পুলিশে তোমাকে লইয়া গেল। তাহার পর,

বাসাড়েগণ যে যাহার ঘরে পুনরায় শয়ন করিল। আমি তোমার ঘর হইতে বাহির হইয়া, পুনরায় পিতা, মাতা ও ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাহার পর বাটীর সদর দরজা দিয়া পলায়ন করিলাম, অশ্বত্থ গাছ দিয়া নহে। দিন দুই কলিকাতার এক খোলার ঘরে লুক্কায়িত রহিলাম। তাহার পর, কাপড় ছোপাইয়া, গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিয়া, সন্ন্যাসীর বেশে সে বাটী হইতে বাহির হইলাম। একদল সন্ন্যাসীর সহিত প্রথম জগন্নাথ যাইলাম। তাহার পর, নানা তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলাম। পিতা যাহা কিছু টাকা দিয়াছিলেন, সে সমুদয় খরচ হইয়া গিয়াছে। টাকার জন্য গদাধর মোড়লের নিকট গমন করিলাম। তাঁহার দেখা পাইলাম না। তাহার পর আজ নয় দিন পীড়িত হইয়া বিছানায় পড়িয়া আছি। সে রাত্রি পিতা আমাকে তোমার পরিচয় দিয়াছিলেন: তুমি কোন্ আফিসে কাজ কর, তাহাও তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন। তাই আজ তোমাকে সংবাদ দিতে পারিলাম। তোমার বাসায়, কি গদাধর মোড়লের বাসায় লোক পাঠাইতে আমি সাহস করিতাম না। সে যাহা হউক, আমার হাতে এখন একটিও পয়সা নাই। গাড়ী কি পাল্‌কি ভাড়া কোথায় পাইব যে, তোমার বাসায় যাইব?"

আমি বলিলান,—"সে জন্য তোমার কোন ভাবনা নাই। গদাধর মোড়ল বোধ হয়, তোমার পিতার ঠিকানা জানেন?

মিহির উত্তর করিল,—"বোধ হয় কেন! পিতার ঠিকানা তিনি নিশ্চয় জানেন।"

মিহিরকে আমি আমার বাসায় লইয়া যাইলাম। পরিষ্কৃত শুভ্র বসন পরাইয়া, তাহাকে পরিষ্কৃত বিছানায় শয়ন করাইলাম। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনিয়া তাহাকে দেখাইলাম। ডাক্তার বলিলেন যে, মিহিরের পীড়া বড় কঠিন হইয়াছে। তাহার বক্ষঃস্থলের দুই দিকেই প্রদাহ হইয়াছে। যাহা হউক, তাহার ঔষধ ও পথ্যের আয়োজন করিয়া, ভট্টাচার্য মহাশয়কে তাহার নিকট বসাইয়া, আমি সেই রাত্রিতেই গদাধর মোড়লের অনুসন্ধানে গমন করিলাম।

এ'স্থানে বলিয়া রাখি যে, যখন যেরূপ ঘটনা ঘটিতেছিল, ভট্টাচার্য মহাশয়কে তাহার সমুদয় বিবরণ আমি প্রদান করিতেছিলাম। তাঁহার অনুগ্রহ আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না।"

গদাধর মোড়লের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। পাল মহাশয়ের তিনি বন্ধু বটেন; কিন্তু মিহির যে নিরপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে, সে সংবাদ এ পর্যন্ত তিনি শ্রবণ করেন নাই। আমার মুখে সেই সমুদয় বিবরণ শুনিয়া, তিনি অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু মিহিরের কঠিন পীড়া শুনিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম যে, পাল মহাশয় কাশীতে আছেন। সেই ঠিকানায় তৎক্ষণাৎ আমি বিস্তারিত ভাবে তার খবর দিলাম। ডাক্তার খরচের নিমিত্ত অনেকগুলি টাকা সঙ্গে লইয়া মোড়ল মহাশয় সেই রাত্রিতেই আমার সঙ্গে মিহিরকে দেখিতে আসিলেন। মিহিরকে দেখিয়া তিনিও পাল মহাশয়কে স্বতন্ত্রভাবে তারে খবর দিলেন।

একদিন পরে পাল মহাশয় সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য যে, মিহির নিরপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে, সে কথা তিনিও পূর্বে শ্রবণ করেন নাই। আমার তারের সংবাদে সে সুসমাচার তিনি প্রথম প্রাপ্ত হইলেন। পুত্রের মুখ দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন, কিন্তু তাহার পীড়ার জন্য সকলকেই ঘোরতর উৎকণ্ঠিত হইতে হইল। মিহিরের পীড়া ক্রমে এমনি কঠিন হইয়া উঠিল যে, দিন কয়েক তাহার বাঁচিবার আশা একেবারেই ছিল না। পাল মহাশয়, তাঁহার গৃহিনী, রাধারাণী, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আর আমি—এই কয়জনে, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মিহিরের সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম যাহা হউক, ভগবানের কৃপায় মিহির এ যাত্রা রক্ষা পাইল।

পীড়ার যখন একটু উপশম হইল, তখন মিহির একদিন আমার হাতটি ধরিয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিল,—"ভাই! তুমি আমার ভাই।"

পাল মহাশয়, তাঁহার গৃহিণী ও রাধারাণী সকলেই মিহিরের বিছানার পার্শ্বে সেই সময় বসিয়াছিলেন। মিহিরের এই কথা শুনিয়া পাল মহাশয় বলিলেন,—"হাঁ, মিহির! মদন তোমার ভাই। মদনকে

প্রথম আমি বুদ্ধিশুদ্ধিহীন পাগল বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু ইহার স্বভাব দেখিতেছি, সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ইহার ধীর-মধুর বাক্যে আমি বড়ই প্রীত হইয়াছি। তাহার পর, মদন আমার যে উপকার করিয়াছে, জীবনে তাহা আমি কখনই ভুলিতে পারিব না। সে রাত্রি তোমার পলায়ন, তাহার পর খুনী অভিযোগ হইতে তোমাকে অব্যাহতি দান, অবশেষে এই সঙ্কট পীড়ায় তোমার জীবন রক্ষা—এ সমুদয় মদনের সহায়তায় হইয়াছে। সে নিমিত্ত আমি বলিতেছি যে, তুমি আমার যেমন পুত্র, মদনও সেইরূপ আমার পুত্র। রাধারাণী মা! তুমি কি বল?"

রাধারাণী বুঝিতে পারিল। লজ্জায় সে ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। কোন উত্তর করিল না। তাহার পর, সে স্থান হইতে উঠিয়া সে পলায়ন করিল।

সেই দিন আমি মিহিরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মিহির! মুখস পরিয়া কলিকাতার জনাকীর্ণ পথ দিয়া তুমি কি করিয়া চলিতে? কেহ তোমাকে কিছু বলিত না?"

একটু হাসিয়া মিহির উত্তর করিল,—"তুমি পাগল! পথ চলিবার সময় আমি মুখস্ পরিতাম না। কেবল অশ্বত্থ গাছে উঠিবার সময় আমি মুখস্ পরিতাম। চোর মনে করিয়া কেহ আমার নিকট না আসে, লোকে ভূত মনে করিয়া ভয়ে পলায়ন করে, সেই জন্য গাছে উঠিবার সময় আমি মুখস পরিতাম। দুই একবার ভূত মনে কয়িয়া লোকে পলায়ন করিয়াও ছিল।"

খুনী অভিযোগ হইতে মিহির সহজে নিষ্কৃতি পায় নাই। ভাল হইয়া হুগলীর কাছারিতে তাহাকে হাজির হইতে হইয়াছিল। সে স্থানে সামান্য একটু মোকদ্দমাও হইয়াছিল। এই বিচারের সময় আর একটি নূতন কথা বাহির হইয়া পড়িল। বেচুর সহিত আর দুইটি ছাত্র একঘরে শয়ন করিত। খুনের সময় তাহাদের একজন জাগরিত ছিল। বেচুকে বেণীর ঘরে প্রবেশ করিতে ও কিছুক্ষণ পরে দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিতে সে দেখিয়াছিল। এইরূপ আরও অনেককথা সে অবগত ছিল। মিহিরের

হইয়া সে সাক্ষ্য প্রদান করিল! যাহা হউক, অল্প দিনের মধ্যেই মিহির খালাস পাইল।

অধিক আর কিছুই বলিবার নাই। মিহির খালাস পাইলে, পাল মহাশয় তাহাকে লইয়া দেশে গমন করিলেন। মাঝে মাঝে তিনি ও মিহির কলিকাতায় আসিয়া, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। আমিও মাঝে মাঝে তাঁহাদের গ্রামে গমন করিতাম। রাধারাণীর সহিত আমার যে বিবাহ হইবে, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন কথা হয় নাই। কিন্তু কি আমি কি ভট্টাচার্য মহাশয়, কি আর আর লোক, সকলেই বুঝিল যে, সে তো হবেই, তবে আর কথার আবশ্যক কি! আমার পিতা যে স্বহস্তে চাষ করিতেন, সে কথার কোনরূপ আর উল্লেখ হইল না। তবে এক দিন কথায় কথায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পাল মহাশয় বলিলেন যে,—"লোকের মনে কি কুসংস্কার! যাহাদের পরিশ্রমে ভূমি হইতে মনুষ্যের আহার আচ্ছাদন উৎপাদিত হয়, তাহাদিগকে লোকে চাষা বলিয়া ঘৃণা কর। বড় মানুষের রাজভবন ও গাড়ী ঘোড়া হইতে সামান্য ভিখারীর একমুষ্টি অন্ন পর্যন্ত সমুদয় বস্তু কৃষকের পরিশ্রমেই উৎপন্ন হয়। ভারতের সমুদয় জাতির সম্বল—কৃষিকার্যের ফল। সুতরাং কৃষকেরা সাধারণের পূজ্য, তাহারা ঘৃণিত নহে। এ বিবেচনা যাহাদের নাই, তাহাদিগকে আমি আর কি বলিব!"

পাল মহাশয় পুনরায় বলিলেন,—"বিপদে পতিত হইয়া আমি আর একটি জ্ঞানলাভ করিয়াছি! ঈশ্বর সর্বদাই আমাদের নিকট আছেন। জলে যেমন মৎস্য ডুবিয়া থাকে, ঐশ্বরিক শক্তির ভিতর সেইরূপ আমরা ডুবিয়া আছি। সেই অনন্ত জ্ঞান-সাগরে আমরা ডুবিয়া আছি, তাহা যদি ভালরূপে আমরা বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে মনুষ্য নানা জ্ঞান ও নানারূপ অলৌকিক শক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু তিনি যে সর্বদাই আমাদের কাছে আছেন, তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। সেইজন্য সেই বিশ্বাত্মার সহিত নিজের আত্মা সংযোজিত করিয়া, মানুষ সেই অনন্ত জ্ঞান ও শক্তি-সাগর হইতে নিজের সামান্য জ্ঞান ও শক্তি পরিপুষ্ট করিতে পারে না। তথাপি তিনি সর্বদাই আমাদের মঙ্গল

সাধন করিতেছেন। বিনা দোষে মিহিরকে যখন পথে পথে ফিরিতে হইয়াছিল,তখন ভগবানের অবিচারের উপর আমি কতই না দোষারোপ করিয়াছিলাম। কিন্তু মিহিরের উপর সেই মিথ্যা অভিযোগ যদি আরোপিত না হইত, তাহা হইলে তাহার এক মাস পরেই বেচুর সহিত আমার কন্যার বিবাহ হইয়া যাইত। কারণ বিবাহের দিন স্থির পর্যন্ত হইয়া গিয়াছিল। সে বিবাহ হইলে আমার সর্বনাশ হইত। যে চুরি করিতে পারে, যে খুন করিতে পারে, আমার কন্যা সেইরূপ লোকের হাতে পড়িত। তাহার পর, রোগগ্রস্ত লোকের হাতে পড়িয়া অল্পদিনের মধ্যেই তাহাকে বিধবা হইতে হইত। অতএব মিহিরকে দুই বৎসরের নিমিত্ত ক্লেশ দিয়া, দয়াময় ভগবান চিরজীবনের নিমিত্ত আমার কন্যাকে রক্ষা করিয়াছেন।"

পুনরায় যখন মাঘ মাস আসিল, পুনরায় যখন শ্রীপঞ্চমীর সময় আসিল, তখন পাল মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া, ভট্টাচার্য মহাশয়কে বিবাহের দিন ধার্য করিতে বলিলেন। তাহার পর, সে শুভকার্য,—অন্য লোকের যে ভাবে সম্পন্ন হয়, আমারও সেইভাবে হইল। পূর্বের ন্যায় যদি আমার প্রাণে রস থাকিত, তাহা হইলে কিরূপে বাসর-ঘর হইল, কিরূপে শালী-শালাজগণ আমার সহিত তামাসা করিল, সে সব পরিচয় বিস্তারিত ভাবে আমি আপনাদিগকে প্রদান করিতাম। কিন্তু নিয়োগী-পুত্রের চিতাগ্নিতে সে রস আমার শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। রস নাই বটে, তবে মন আমার আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে। কারণ, আমার রাধারাণী, রূপে গুণে লক্ষ্মী। সরস্বতী দেবীর বরে আমি একাধারে এই লক্ষ্মী সরস্বতী লাভ করিয়াছি। সে দিন দেবীকে পূজা করিতে গিয়াছিলাম, তাই ভট্টাচার্য মহাশয়কে পাইয়াছিলাম। তাহার পর, তাঁহার দ্বারা পাল মহাশয়কে পাইলাম। অবশেষে রাধারাণীকে লাভ করিলাম। সে দিন দেবীকে যদি অঞ্জলি দিতে না যাইতাম, তাহা হইলে এ সব যোগাযোগ হইত না। সেইজন্য বলি যে, মা সরস্বতীর কৃপায় আমি রাধারাণীকে লাভ করিয়া, আজ, হে পাঠক! আপনাদের দাসানুদাস এই মদন ঘোষের বদন হাসিতে পূর্ণ হইয়াছে।

শেষ ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ডাকিনীর নাচ

গড়গড়ি মহাশয় বলিলেন,—

মদন ঘোষের গল্পটি শেষ হইবার পূর্বে মুণ্ডটির দিকে আমি চাহিয়াছিলাম। গল্প যত শেষ হইতে লাগিল, মুণ্ডটির নাসিকা ও চক্ষু ততই বিলীন হইতে লাগিল, আর ইহার বর্ণ ততই লোহিত হইতে লাগিল। অবশেষে গল্পটি যেই সমাপ্ত হইল, আর মুণ্ডটি তৎক্ষণাৎ রক্তমুক্তায় পরিণত হইল।

এরূপ যে হইবে, পূর্ব হইতেই তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সুতরাং শেষ মুণ্ডটিও যখন মুক্তা হইয়া গেল, তখন আমি বিস্মিত হইলাম না, মনে মনে দুঃখও করিলাম না। আমি ভাবিলাম যে, মা জগদম্বা যখন আমার প্রতি কৃপা কবিলেন না, তখন নিশ্চয় আমার আয়ু শেষ হইয়াছে। ডাকিনীকে আমি কিছুতেই বিবাহ করিতে পারিব না, আজ এই স্থানেই স্বহস্তে আমি আমার প্রাণ বিসর্জন করিব।

এইরূপ মনে করিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তাহার পর যোড়হস্তে মাকে বলিলাম,—"মা! এ দীন হীন সন্তানকে তুমি দয়া করিলে না। তোমার মুণ্ডমালার মুণ্ডগণ ফাঁকি দিয়া আমার গল্প শুনিল। তাহারা আমার কোন উপকার করিল না। তোমার এ কলঙ্ক, মা, জগতে চিরকাল থাকিবে। তোমাব শাণিত খড়্গ দ্বারা এই মুহূর্তে আমি আমার মুণ্ড কাটিয়া তোমার পায়ে সমর্পণ করিব। তাহাতে যদি মা, তোমার সন্তোষ হয়, তো তাহাই হউক!"

মায়ের হাত হইতে আমি খড়্গটি লইলাম। হাত দিয়া দেখিলাম যে, খড়্গ অতি সুতীক্ষ্ণ ছিল। কিন্তু এক কোপে নিজের মুণ্ড দেহ হইতে কিরূপে বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায়, তাহা আমি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। পূর্বে কেহ কেহ এরূপ করিয়াছিল, পুস্তকে তাহা আমি পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু কিরূপে তাহারা করিয়াছিল? আমি

দেখিলাম যে, নিজে নিজের মুণ্ড এক কোপে কাটিয়া ফেলিতে পারা যায় না। দুই হাতে খড়গ ধারণ করিয়া যত বলেই কোপ মারি না কেন, মুণ্ডটি সম্পূর্ণরূপে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না। অবশেষে এই স্থির করিলাম যে, শয়ন করিয়া, দক্ষিণ হস্তে খড়গ ধরিয়া, বাম দিক্ হইতে নিজের গলদেশ কাটিতে আরম্ভ করি। যতক্ষণ হস্তে শক্তি থাকিবে, ততক্ষণ কাটিয়া যাইব, তাহার পর যাহা হয় তাহা হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া আমি শয়ন করিলাম ও তাহার পর আমার গলদেশ কাটিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু এক রতিও কাটিতে পারিলাম না। একবার বাম দিকে, একবার সম্মুখ দিকে, একবার দক্ষিণ দিকে, সকল দিকে খড়গ রাখিয়া কাটিতে চেষ্টা করিলাম। খড়গ অতি তীক্ষ্ণ ছিল, কিন্তু একটু দাগ পর্যন্তও আমার গলায় পড়িল না। সবলে কোপ মারিয়া দেখিলাম, তাহাতেও কিছু হইল না।

বাহিরে ডাকিনীগণ খল খল হাসিয়া উঠিল; ভূমিকম্প বৃদ্ধের সহিত ডাকিনীগণ মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিল।

ভূমিকম্প মহাশয় আমাকে বলিলেন,—"বিধাতার ভবিতব্য কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না। প্রজাপতির নির্বন্ধ এই যে, নারিকেলমুখী তোমার পত্নী আর তুমি তাহার পতি। মা জগদম্বারও এইরূপ ইচ্ছা, বেতালগণেরও এই ইচ্ছা। অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। লাউমুখী! শাঁকমুখী! শামুকমুখী! সকলে তোমরা বিবাহের আয়োজন কর। আমার হাতে শঙ্খ দাও, আমি নিজে শঙ্খ বাজাইব।"

মন্দিরটি ডাকিনীদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ হইল। কেহ বরণডালা, কেহ শঙ্খ লইয়া মায়ের সম্মুখে সকলে দাঁড়াইল। স্তম্ভিত হইয়া আমিও সেই ভিড়ের ভিতর দাঁড়াইয়া রহিলাম।

শঙ্খ হাতে লইয়া ভূমিকম্প বলিলেন,—"এ বিবাহের আমি কন্যাকর্তা এবং নিজে পুরোহিত হইব। কিন্তু কন্যা-সম্প্রদানের পূর্বে মায়ের সম্মুখে এস, সকলে একবার প্রাণ ভরিয়া নৃত্য করি।"

এই বলিয়া শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে ভূমিকম্প মহাশয় নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শঙ্খের শব্দে আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

তাঁহার নৃত্যের বলে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে অন্য ডাকিনীগণ কেহ উলু দিতে দিতে, কেহ বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে নৃত্য করিতে লাগিল। ঢাক ঢোল তূরী ভেরী দামামা দগড়া প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের শব্দে জগৎ পরিপূর্ণ হইল।

নৃত্য প্রথম ধীরে ধীরে আরম্ভ হইল। কিন্তু ক্রমে তাহার বেগ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল। বাষ্পীয় যন্ত্রের চক্রের ন্যায় ডাকিনীদিগের দেহ ক্রমে প্রবল বেগে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল।

ডাকিনীদিগের উলুধ্বনিতে, ভূমিকম্প মহাশয়ের শঙ্খনিনাদে, নানারূপ বাদ্যযন্ত্রের ভীষণ কোলাহলে, আমার কর্ণে তালি লাগিয়া গেল। তাহার পর তাহাদের দারুণ ঘূর্ণায়মান নৃত্যে আমার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। আমি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম সত্য, কিন্তু তাহাদের চক্রবৎ ঘূর্ণিত দেহ দর্শনে আমার মস্তক যেন প্রবল বেগে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল।

মস্তক ঘুরিয়া আমি ভূমিতে পতিত হই আর কি, এমন সময় কোথা হইতে দুইটি হস্ত আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল। সেই হস্ত অবলম্বনে কিঞ্চিত সুস্থ হইয়া, কাহার হস্ত দেখিবার নিমিত্ত আমি চাহিয়া দেখিলাম যাহা দেখিলাম, তাহাতে ঘোরতর বিস্মিত হইলাম। দেখিলাম যে, মায়ের বাম হস্তস্থিত সেই নরমুণ্ড ও মুণ্ডমালার সমুদয় মুণ্ড মুক্তা রূপ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় নরমুণ্ডের আকার ধারণ করিয়াছে; আর প্রতি মুণ্ডের গলদেশ হইতে দুইটি করিয়া হাত বাহির হইয়াছে। একটি মুণ্ডের দুইটি হস্ত আমাকে ধরিয়া আছে, ও অন্য মুণ্ডদিগের হস্তগুলি ডাকিনীদিগকে ধরিয়া আছে। আমাকে যে হস্তদ্বয় ধরিয়াছিল, তাহারা আমাকে স্থিরভাবে রাখিয়াছিল, কিন্তু অন্য মুণ্ডদিগের হস্তগুলি ডাকিনীদিগকে প্রবলবেগে ঘূর্ণিত করিতেছিল। পুতুল-বাজির পুতুলগণ যেরূপ মনুষ্য কর্তৃক পরিচালিত হয়, মুণ্ডমালার হস্ত দ্বারা ডাকিনীগণও সেইরূপ পরিচালিত হইতেছিল। বোঁ বোঁ, ভোঁ ভোঁ, তা থেই থেই, তা থেই থেই, হস্ত কর্তৃক পরিচালিত হইয়া ডাকিনীগণ কখন ঘুরিতেছিল, কখন নাচিতেছিল। ভূমিকম্পের নৃত্য ক্রমে অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল।

হস্ত কর্তৃক পরিচালিত হইয়া তিনি শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া নাচিতে লাগিলেন। এত বেগে তিনি আমার চারিদিক ঘুরিতে লাগিলেন যে, তিনি যেন সর্বদাই এক স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন, আমার এইরূপ বোধ হইল। দারুণ নৃত্যে, দারুণ কোলাহলে, আমার মস্তিষ্ক দধি-মন্থনের ন্যায় যেন মন্থিত হইতে লাগিল। আমার দারুণ শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল। ঘোর বেদনায় আমার মস্তক যেন খসিয়া পড়িতে লাগিল।

এই সময় মুণ্ডমালার হস্ত দুইটি ভূমিকম্পের মস্তক ধরিয়া আমার দিকে কিছু অবনত করিল। শঙ্খের এক দিক্ ভূমিকম্পের মুখে রহিল, শঙ্খের পশ্চাৎ দিক আমার বক্ষঃস্থল ঈষৎ স্পর্শ করিল। এই সময় ভূমিকম্প মহাশয় শঙ্খে সবলে ফুঁ দিলেন। এই সময় মুণ্ডমালার হস্ত দুইটি আমাকে ছাড়িয়া দিল। শঙ্খের পশ্চাৎ দিক্ হইতে প্রবল ঝটিকার ন্যায় বায়ু নির্গত হইয়া আমার বক্ষঃস্থলে লাগিল। সেই প্রবল বায়ুবেগে আমার শরীর মন্দিরের দ্বার পার হইয়া আকাশ-পথে চলিতে লাগিল। নিমেষের মধ্যে সহস্র সহস্র ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া শূন্যপথে আমার শরীর প্রবলবেগে ছুটিতে লাগিল। নদ-নদী, বন-উপবন পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগরের উপর দিয়া আমার শরীর শূন্যপথে ছুটিতে লাগিল। দুই চারি মুহূর্তের মধ্যে আমার শরীর সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিল। সে দারুণ বেগে জ্ঞান-গোচর আর আমার কিছুমাত্র রহিল না। অবশেষে ঝুপ করিয়া আমি ভূমিতে পতিত হইলাম।

ভূমিতে পতিত হইবার পূর্বে আমি চক্ষু মুদিত করিয়াছিলাম। ভূমিতে পতিত হইয়াও আমি চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলাম। মনে করিলাম যে, আমি আর জীবিত নাই, আমার হস্ত পদ অস্থি মজ্জা সমুদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে আমি চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম। প্রথম আমি আমার মাথায় হাত দিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, মস্তকটি চূর্ণ হইয়া ধূলার ন্যায় হইয়া যায় নাই। তাহার পর হাত দুইখানি দেখিলাম, দেখিলাম যে, হাত দুইখানিও যেমন তেমনি আছে,

তবে কৃশ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর পদদ্বয় নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম। তাহাও ভগ্ন বলিয়া বোধ হইল না। অবশেষে কোথায় কোন্ দেশে আমি নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত এদিক্ ওদিক দৃষ্টি করিলাম। যাহা এখন আমার নয়নগোচর হইল, তাহা দর্শন করিয়া আমি ঘোরতর বিস্মিত হইলাম। আমি দেখিলাম যে, পাহাড়-পর্বত অথবা সাগর-মহাসাগরের উপর আমার শরীর পতিত হয় নাই, ঘরের ভিতর, তক্তপোষে বিছানার উপর আমার শরীর পতিত হইয়াছে। অন্ততঃ চক্ষু চাহিয়া আমি দেখিলাম যে, ঘরের ভিতর তক্তপোষের উপর আমি শয়ন করিয়া আছি, আর আমার পদতলে সেই তক্তপোষের উপর একজন স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমার কথাটি ফুরুল

সেই স্ত্রীলোককে দেখিয়া আমার বড় ভয় হইল। আমি ভাবিলাম যে, সেই নারিকেল-মুখী বুঝি সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে। অতি ধীরে ধীরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কে ও! নারিকেল-মুখী?"

স্ত্রীলোকটি কোন উত্তর করিলেন না। আমি আরও নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম। স্ত্রীলোকটি মানুষের মত, ডাকিনীর মত নহে। তাহা দেখিয়া মন আমার অনেকটা আশ্বস্ত হইল। সে স্ত্রীলোক যেন আমার পরিচিতা, যেন কোথায় তাহাকে আমি দেখিয়াছি, এইরূপ আমার মনে হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি কে, তাহা আমি স্মরণ করিতে পারিলাম না।

স্ত্রীলোকটিকে স্মরণ করিবার নিমিত্ত মনে মনে চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় সেই ঘরে আর একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক প্রবেশ করিলেন। আমার বিছানায় যিনি বসিয়া ছিলেন, তাঁহাকে বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন, —"শৈল! জামাতা এখন কেমন আছেন?"

এই প্রশ্ন শুনিবামাত্র আমার সকল কথা স্মরণ হইল। শৈল আমার

স্ত্রীর নাম। যে স্ত্রীলোকটি বিছানায় আমার পদতলে বসিয়াছিলেন, তিনি আমার স্ত্রী। বৃদ্ধা আমার শাশুড়ী-ঠাকুরাণী।

আমার স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"ডাক্তার বলিয়াছিলেন যে, নিদ্রা অবসানে হয়তো জ্ঞান হইবে। কিন্তু কৈ? জ্ঞান তো হয় নাই। এই মাত্র নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া বে-ছুট কথা বলিলেন।"

শাশুড়ী-ঠাকুরাণী তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সুবল! বাবা! এখন তুমি কেমন আছ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আমি এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি?"

শাশুড়ী-ঠাকুরাণী উত্তর করিলেন,—"বালাই! কোথায় পড়িবে কেন? বাড়িতে আছ। আমার বাড়িতে আছ। তোমার শশুর-বাড়িতে আছ।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—সে ডাকিনী সব কোথায় গেল? তাহারা তো এখানে আসে নাই।"

শাশুড়ী উত্তর করিলেন,—"ছি বাবা! ও সব কথা ছাড়িয়া দাও। ঔষধ দিয়া দুষ্টগণ তোমাকে অজ্ঞান করিয়াছিল। ডাকিনী এখানে কোথা হইতে আসিবে বাবা? ঐ দেখ, শৈল বসিয়া কাঁদিতেছে। ও সব বেছুট কথা ছাড়িয়া দাও।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কত দিন আমি এ স্থানে আছি?"

শাশুড়ী ঠাকুরাণী উত্তর করিলেন,—"তোমার প্রতিবাসী বটকৃষ্ণকে তুমি পত্র লিখিতে বলিয়াছিলে। তাহার চিঠি পাইবামাত্র যজ্ঞেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া আমি ও শৈল তোমার বাড়িতে গমন করিলাম। গিয়া দেখিলাম যে, তোমার ভাই হতভাগা তোমার পায়ে বেড়ি দিয়া রাখিয়াছে। তোমার তখন জ্ঞান-গোচর কিছুই ছিল না। কিন্তু বামী গোয়ালিনীর মুখে ভিতরের কথা আমরা সব শুনিলাম। সত্য সত্য তুমি পাগল হও নাই। গুঙ্কুরের বন্ধু সেই পোড়ার-মুখো ডাক্তার কি তোমাকে খাইতে দিয়াছিল। সে ঔষধ খাইয়া তোমার ওরূপ হইয়াছিল। তোমার ভাই কিছুতেই ছাড়িয়া দিবে না। আমরা নালিশ করিবার ভয় দেখাইলাম। তবে সে তোমাকে ছাড়িয়া দিল। সে স্থানে থাকিলে

নিশ্চয় তোমাকে মারিয়া ফেলিত। মার পেটের ভাই যে এমন নিষ্ঠুর হয়, তা কখন শুনি নাই। কিন্তু সে যাহা হউক, এখন তুমি কেমন আছ, বাবা? আমাদের চিনতে পার? আজ তিন মাস তোমাকে আমরা এস্থানে আনিয়াছি। তাহার উপর আবার জ্বর-বিকার। বাঁচিবার আশা আর ছিল না। এক চল্লিশ দিন যে কি করিয়া কাটিয়াছে, ভগবান্ তাহা জানেন। তিন মাস তুমি আমাদিগকে চিনিতে পার নাই। নারিকেল-মুখী, শাঁক-মুখী কত কি আমাদিগকে বলিতেছিলে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তবে কি সত্য সত্য আমি ডাকিনীর হাতে পড়ি নাই?"

শাশুড়ী ঠাকুরাণী উত্তর করিলেন,—"বালাই! ডাকিনীর হাতে কেন পড়িবে? শৈল তোমাকে সকল কথা বলিবে। এখন শৈলের সহিত একটু কথাবার্তা কর। আজ তিন মাস বাছা আমার আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে।"

এই কথা বলিয়া শাশুড়ী ঘর হইতে প্রস্থান করিলেন। আমার স্ত্রীর সহিত কথোপকথনে আমি বুঝিলাম যে, সেই ডাক্তারের ঔষধ সেবন করিয়া সত্যসত্যই আমি জ্ঞান-হত হইয়া গিয়াছিলাম। আমি কলিকাতা গমন করি নাই, আমি গির্জার উপরে পতিত হই নাই, সমুদ্রের ঝিনুকের ভিতরও আমি বাস করি নাই, ডাকিনীদিগের সহিতও আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। আমার গ্রামবাসীর পত্র পাইবামাত্র স্ত্রী ও শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাঁহাদের প্রতিবাসী যজ্ঞেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ আমার গ্রামে গমন করেন, ও সে স্থান হইতে তাঁহারা আমাকে আমার শ্বশুরালয়ে আনয়ন করেন।

আমার শাশুড়ী, স্ত্রী ও আর সকলে বলিলেন বটে যে, সনাতন নস্কর, ভূমিকম্প মহাশয়, গির্জা, সমুদ্র, সুন্দরবন, ডাকিনী ও কালীর মন্দির, এই সমুদয় সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম, সে সমুদয় পীড়ায় খেয়াল ব্যতীত আর কিছুই নহে, কিন্তু সকলের কথা এখন পর্যন্ত আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই। সে সমুদয় বিষয় আমি এত প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, তাহা সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া আমি ভাবনা করিতেও পারি না।

আমার স্ত্রী বলিলেন যে,শ্বশুরালয়ে আগমনের পর আমি জ্বর-বিকার দ্বারা আক্রান্ত হই। এক-চল্লিশ দিন অজ্ঞান অবস্থায় থাকিয়া সেই দিন সবে মাত্র আমার জ্ঞান হইয়াছিল। ডাক্তার বলিয়াছিলেন যে, জ্বর-বিকার কাটিয়া গেলে আমার মস্তিষ্কের দোষও কাটিয়া যাইবে। প্রকৃত তাহাই হইল, সেই দিন হইতে আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল।

সে দিন আমার স্ত্রী আমাকে অধিক কথোপকথন করিতে দিলেন না। আমার ভ্রাতার বিষয় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী সে দিন সে কথার কোন উত্তর দিলেন না।

কিছু সুস্থ ও সবল হইলে, দুই চারি দিন পরে, পুনরায় আমি আমার ভ্রাতার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার গৃহিণী তখনও পরিষ্কার করিয়া কোন উত্তর করিলেন না। "আমি শুনিয়াছি যে, ওক্কুর কলিকাতায় আছে।" তখন তিনি কেবল এই কথা বলিলেন।

প্রায় এক মাস পরে, যখন আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইলাম, তখন একদিন আমার স্ত্রী আমাকে কলিকাতা যাইতে বলিলেন। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন যে, "আমরা শুনিয়াছি যে, ওক্কুরের বড় বিপদ হইয়াছে। উচ্চ ছাদের উপর বসিয়া সে এক দিন মদ খাইতেছিল। সেই সময় নিকট দিয়া একটি চিল উড়িয়া গেল। তাহা দেখিয়া চিলের মত উড়িতে তাহার সাধ হইল। চিলের মত উড়িতে গিয়া সে ছাদ হইতে পড়িয়া গিয়াছে। তাহার দুইটি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ডাক্তারে তাহার পা দুইটি কাটিয়া দিয়াছে। এখন সে হাঁসপাতালে পড়িয়া আছে।"

এই কথা শুনিয়া আমি তৎক্ষণাৎ কলিকাতা গমন করিলাম। কলিকাতায় আসিয়া দেখিলাম যে, সত্যসত্যই অক্রুর হাঁসপাতালে পড়িয়া আছে, আর তাহার পদদ্বয় কর্তিত হইয়াছে। শ্বশুরালয়ে আমি যখন জ্বরবিকারে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়াছিলাম, কলিকাতায় সেই সময় এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমি আরও জানিতে পারিলাম যে, পৈতৃক সম্পত্তির নিজের অংশ অক্রুর বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। সম্পতি

বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইয়াছিল, তাহা সে অপব্যয় করিয়াছে। তাহার হাতে এখন আর একটি পয়সাও নাই।

কলিকাতায় থাকিয়া আমি অক্রুরের ভালরূপে চিকিৎসা করাইতে লাগিলাম। যখন সে একটু সুস্থ ও সবল হইল, তখন তাহাকে দুইটি কাঠের পা কিনিয়া দিলাম। তাহার পর তাহাকে আমার শ্বশুরালয়ে লইয়া আসিলাম। সম্পূর্ণরূপে সে আরোগ্য লাভ করিলে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমি আমার স্বগ্রামে গমন করিলাম। সে স্থানে কিছুদিন থাকিয়া একটি বয়স্থা কন্যা স্থির করিয়া তাহার বিবাহকার্য সমাধা করিলাম। পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত, পৈতৃক সম্পত্তির আমার অংশের উপস্বত্ব তাহাকে আমি দিয়াছি। পাছে বিক্রয় করিয়া ফেলে, সেজন্য সম্পত্তি একেবারে তাহাকে আমি লিখিয়া দিই নাই। সে এখন গ্রামে দলের দলপতি হইয়াছে। কে কি খায়,কে কি করে সর্বদা সে সেই সন্ধানে থাকে। লোককে একঘরে করিতে পারিলে, অথবা কাহারও কোনরূপ মন্দ করিতে পারিলে, সে পরম সন্তোষ লাভ করে। কিন্তু তাহার সংসারে সুখ নাই। তাহার অনেকগুলি পুত্রকন্যা হইরাছিল, কিন্তু একটিও বাঁচিয়া নাই। তাহার পর, স্ত্রীর সহিত তাহার সর্বদাই কলহ হয়। কলহ হইলে তাহার স্ত্রী সেই কাষ্ঠনির্মিত পা দুইখানি লুকাইয়া রাখে, তখন চলিতে না পারিয়া অক্রুর নিতান্ত বিপন্ন হয়। দুই হাতের সহায়তায় স্ত্রীর নিকট গমন করিয়া তাহার হাতে-পায়ে পড়িতে থাকে। অনেক সাধ্য-সাধনার পর তাহার স্ত্রী কাঠের পা দুইটি বাহির করিয়া দেয়।

স্বগ্রামে থাকিয়া যখন আমি কনিষ্ঠের বিবাহের আয়োজন করিতেছিলাম, তখন গুরুদেব এক মকদ্দমায় পড়িয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সে সময় আমার হাতে টাকা ছিল। সে বার আমি তাঁহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এক্ষণে তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে। কোথায় কিরূপ তাঁহার স্বর্গলাভ হইল, সে কথা আর শুনিয়া কাজ নাই।

যে ডাক্তার আমাকে বলপূর্বক ঔষধ দিয়া পাগল করিয়াছিল,

ভ্রমক্রমে তাহার একমাত্র পুত্র ডাক্তারখানা হইতে কি ঔষধ খাইয়া মরিয়া গিয়াছে। সেই শোকে তাহার স্ত্রী বায়ুগ্রস্ত হইয়াছে। রাত্রি দিন তাঁহার চীৎকারে ও নানারূপ উপদ্রবে ডাক্তার বড়ই বিপন্ন হইয়াছে।

আমি এক্ষণে আমার শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছি। শ্বশুরের যে সম্পত্তি পাইয়াছি, তাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে আমার সংসার চলিয়া যায়। ভালরূপ লেখা-পড়া জানি না, শাস্ত্র জানি না, জানি কেবল এই যে,—সত্য ও পরোপকার—ইহাই ধর্ম, ইহাই কর্ম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নোটে গাছটি মুড়ুলো

মহাদেব বাবুকে সম্বোধন করিয়া ঘনশ্যাম বলিলেন,—"আড্ডাধরী মহাশয়! সুবল গড়গড়ি মহাশয়ের কাহিনী আপনারা শ্রবণ করিলেন। আজ সেই গল্প শেষ হইল। এক্ষণে আপনারা ভাল মন্দ বিচার করুন।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন যে, বেতাল পঁচিশ, বত্রিশ সিংহাসন ও আরব্য উপন্যাসের পর এরূপ অদ্ভুত ঘটনা পৃথিবীতে আর কখন ঘটে নাই।

তাহার পর, সভ্যদিগের মধ্যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। সনাতন নস্কর, ভুমিকম্প-মহাশয়, গির্জা, সমুদ্র, ঝিনুক, সুন্দরবন, ব্যাঘ্র, ডাকিনী, কালীর মন্দির, এই সকল বিষয় সম্বন্ধে গড়গড়ি মহাশয় যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা সত্য, অথবা পাগলের ভ্রান্তি, এই কথা লইয়া ঘোর বাদানুবাদ উপস্থিত হইল।

হলধর বলিলেন,—"এ সমুদয় ঘটনা প্রকৃত ঘটে নাই। হয় পাগল অবস্থায় আর না হয় বিকার অবস্থায় গড়গড়ি মহাশয়ের মস্তিষ্কে এই সমুদয় অলীক দৃশ্য আবির্ভূত হইয়াছিল।"

ঘনশ্যাম বলিলেন,—এ সমুদয় ঘটনা সত্য ঘটিয়াছিল। এমন অদ্ভুত ঘটনা কখন মিথ্যা হইতে পারে না।"

হলধর উত্তর করিলেন,—"গড়গড়ি মহাশয় যদি শ্বশুরালয়ে শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন, তাহা হইলে কি করিয়া তিনি কলিকাতা গমন করিলেন ?

দুই পক্ষের বাদানুবাদ শ্রবণ করিয়া অবশেষে মহাদেববাবু ধীর-গম্ভীর স্বরে আপনার রায় প্রকাশ করিলেন।"

মহাদেববাবু বলিবেন,—"গড়গড়ি মহাশয় যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, তাঁহার জড় দেহ শ্বশুরালয়ে পড়িয়াছিল। নাক্ষত্রিক দেহ অবলম্বন করিয়া তিনি কলিকাতায় গমন করিয়াছিলেন।"

হলধর বলিলেন,—"সে কথা সম্ভব। তা হইতে পারে। সেই যারে বলে তাড়িত-দেহ। সেই তাড়িত-দেহে গড়-গড়ি মহাশয় এই সকল কাণ্ড করিয়াছিলেন !"

অদ্ভুত ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে আড্ডাধারী মহাশয় এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন। তাহাতে সকলের মন হইতে সন্দেহ দূর হইল। প্রফুল্ল মনে সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

পুরাতন কূপ

প্রথম অধ্যায়

নীলকুঠী

কানপুরের নিকট নবাবগঞ্জ নামক একটি স্থান আছে। সেই স্থানে একটি পুরাতন কূপ আছে। সেই কূপে এক বাঙ্গালী বালক একবার পড়িয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালী বালক সেই সময়ে পাঁড়েনী নামক এক ব্রাহ্মণীর নিকট বাস করিতেছিল। পাঁড়েনীর স্বামী বালকের পিতার পাচক-ব্রাহ্মণ ছিল। এই ঘটনার কুড়ি বৎসর পরে জন কয়েক বাঙ্গালী বাবু পাঁড়েনীকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট পাঁড়েনী সেই ঘটনা এইরূপে বর্ণন করিল :

পাঁড়েনী বলিল, কানপুর হইতে ফরক্কাবাদের রাস্তায় জোন সাহেবের নীলকুঠি ছিল। গোবিন্দবাবু সেই নীলকুঠিতে কাজ করিতেন। তিনি বড়বাবু ছিলেন। সাহেব, বাবুকে অতিশয় ভালবাসিতেন। নিকটে একটি গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। পরিবার লইয়া, গোবিন্দবাবু তাহাতে বাস করিতেন। পরিবারের মধ্যে গোবিন্দবাবুর বৃদ্ধা মাতা ও স্ত্রী। আমার স্বামী সেই সংসারে পাচক-ব্রাহ্মণেব কাজ করিতেন। কালক্রমে গোবিন্দবাবুর ভার্যা যুগল পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া, সূতিকা-ঘরেই মানবলীলা সংবরণ করেন। এ অঞ্চলে তখন বাঙ্গালীদিগের যথেষ্ট সম্মান ছিল। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। গোবিন্দবাবুর বিপদে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই কাঁদিতে লাগিল। তিনি নিজে শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। সদাশয় জোন সাহেবও তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইলেন।

গোবিন্দবাবুর বৃদ্ধা মাতা নবপ্রসূত শিশু দুইটিকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। একসঙ্গে দুইজনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সে নিমিত্ত পিতামহী তাহাদের নাম লব কুশি রাখিলেন। কিছু দিন পরে বাবু দেশে গিয়া পুনরায় বিবাহ করিয়া নব বধূ লইয়া কর্ম্মস্থানে

প্রত্যাগমন করিলেন। নূতন বধূটির ক্রমে চক্ষু-মুখ ফুটল, সেই সঙ্গে সপত্নীপুত্রদ্বয়ের উপর তাঁহার বিদ্বেষ দিন দিন প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। বাবু নিজেও ক্রমে ছেলেদের প্রতি অনাস্থাপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। নিতান্ত দুরন্ত, এখ বলিয়া সর্বদাই তিনি তাহাদিগকে তাড়না করিতেন। কিন্তু যত দিন তাঁহার বৃদ্ধা মাতা জীবিতা ছিলেন, তত দিন শিশু দুইটির বিশেষ কোন অযত্ন হইতে পায় নাই। ছেলে দুইটির বয়স যখন পাঁচ বৎসর, দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় পিতামহীর পরলোক হইল। পিতামহীকে হারাইয়া বালক দুইটি একেবারে নিঃসহায় হইয়া পড়িল। বাপ স্নেহহীন, বিমাতা শত্রু। উঠিতে বসিতে প্রহার, তিরস্কার ও কুবাক্যে তাহাদের সুকোমল হৃদয় জর্জরিত হইল। বালক দুইটি দেখিতে কিন্তু রাজপুত্রের ন্যায়। সাধ করিয়া পিতামহী তাহাদের মস্তকে কেশ বাড়িতে দিয়াছিলেন। ঝোঁকড়া-ঝোঁকড়া কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। দীর্ঘকেশ-সম্বলিত মস্তক নাড়িয়া যখন দুই ভ্রাতার কথাবার্তা হইত, তখন কাহার পাষাণ মন সে রমণীয় দৃশ্যে ও সে সুধামাখা স্বরে দ্রবীভূত না হইত? হইত না কেবল বিমাতার, আর হইত না স্ত্রীচরণপরায়ণ পিতা ঠাকুরের। মাতৃহীন বালক দুইটির সকল গুণই ছিল। দোষের মধ্যে ছিল কেবল বয়সগুণে অস্থিরতা, দৌড়াদৌড়ি ও দুরন্তপণা। ফল কথা, শিশু দুইটির রূপ গুণ দিন দিন যতই বিকসিত হইতে লাগিল বিমাতার মনে হিংসা-দ্বেষও ততই প্রবল হইতে লাগিল। কিন্তু জোন সাহেব তাহাদিগকে বড়ই স্নেহ করিতেন, তাহাদের দুরন্তপণা তিনি ভালবাসিতেন, তাহাদের সহিত তিনি নিজে ছুটাছুটি করিতেন। নীলের হউজ হইতে শিশু দুইটি যখন তাঁহার দুগ্ধফেননিভ ধবল বসন কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিত, তখন রাগ করা দূরে থাকুক, আদরে তিনি তাহাদিগকে বুকে করিয়া লইতেন। জুতা মোজা ও ভাল পরিচ্ছদ জোন সাহেব তাহাদিগকে সর্বদাই কিনিয়া দিতেন। শিশু দুইটির আর একজন সহায় ছিলেন। আমার পতি পাঁড়ে তাহাদিগকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতেন। ভাল মাছ, দুধের সর, ঘরে যাহা কিছু উপাদেয় বস্তু প্রস্তুত হইত, লুকাইয়া তিনি তাহাদিগকে তাহা আহার করিতে দিতেন।

আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল। লব কুশির বয়স সাত বৎসর হইল। এই সময়ে গদর পড়িল, অর্থাৎ সিপাহী-বিদ্রোহ উপস্থিত হইল. দেশে অরাজকতার আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। গৃহদাহ, লুট-পাট, মার-পিট, চুরি-ডাকাতি, খুন-খরাবি চারিদিকেই চলিতে লাগিল। বিদ্রোহিগণ ঘোর নিষ্ঠুরতা সহকারে সাহেবদিগকে বধ করিতে লাগিল। বাঙ্গালীরা ইংরেজের গুরু, এই বলিয়া বাবুদের প্রতিও অত্যাচার কম হইল না। নানা সাহেবের প্রধানমন্ত্রী আজিমুল্লা বাবুদের ডাকিয়া বলিল,—"তোমরা আমাদের অধীন চাকরী কর।" বাবুরা তাহাতে সম্মত হইলেন না। সেই অপরাধে বাবুদিগকে তোপে উড়াইয়া দিবার হুকুম হইল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কার্য্যে তাহা পরিনত হয় নাই।

জোন সাহেব গোবিন্দবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন,—"বাবু! এ স্থানে আর আমার থাকা উচিত নয়। বদমায়েসরা আমাকে মারিয়া ফেলিবে। আপাততঃ কানপুরে গিয়া আশ্রয় লইব। আমার অনুপস্থিতে তুমি যথারীতি কুঠির কর্ম চালাইবে। যদি জীবিত থাকি, তাহা হইলে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।"

এই বলিয়া গোবিন্দবাবুর হস্তে সমস্ত কার্যের ভার দিয়া সাহেব প্রস্থান করিলেন। নিকটস্থ গ্রামবাসীদিগের জোন সাহেব বাপ-মা ছিলেন। দয়া-মায়া, পরোপকারে তিনি দেবস্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। জোন সাহেব তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন, এই অশুভ সংবাদে চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। শত শত লোক আসিয়া যোড়হস্তে জোন সাহেবকে বলিল,—"মহাশয়! আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন না, আপনার নিমিত্ত আমরা সকলে প্রাণ দিব।"

কিন্তু সে ঘোরতর বিপ্লবের সময় জোন সাহেব সে স্থানে থাকা উচিত বোধ করিলেন না। বাবুর হাতে সকল কর্মের ভার দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। জোন সাহেব একবার বিলাতে গিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু অল্পদিন পরেই তাঁহার গৃহশূন্য হইয়াছিল। আর তিনি বিবাহ করেন নাই।

জোন সাহেব চলিয়া গেলে, দুই দিবস পরেই বদমায়েসরা সাহেবের বাঙ্গলা জ্বালাইয়া দিল। গোবিন্দবাবুর ঘর লুট-পাট করিল। তাঁহাকে খুঁটিতে বাঁধিয়া বিলক্ষণ প্রহার করিল। তাঁহার স্ত্রীর গায়ে যাহা-কিছু গহনা-পত্র ছিল, সে সমস্তই কাড়িয়া লইল। পুনরায় আসিয়া সকলকে মারিয়া ফেলিবে, এরূপ ভয়ও দেখাইল। সর্বত্রই তখন বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত। বিচার নাই, বিবেচনা নাই ঘোরতর অরাজকতা। কোন স্থানে সপরিবারে পলাইয়া যে, আপনারা স্ত্রীর ও শিশু দুইটির প্রাণরক্ষা করিবেন, এরূপ উপায় গোবিন্দবাবুর ছিল না।

বাবুরাম নামক একজন সে দেশী কায়স্থ তাঁহার অধীনে কর্ম করিতেন। বাবুরামের নিবাস অযোধ্যার এলাকায় হরডুই জিলার একখানি গ্রামে। এই বিপ্লবের সময় পরিবারবর্গকে বিদেশে নিজের কাছে রাখা উচিত নয়, এই ভাবিয়া বাবুরাম তাহাদিগকে হরডুই পাঠাইবার নিমিত্ত আয়োজন করিলেন।

গোবিন্দ বাবু তাঁহাকে বলিলেন,—"ভাই। তোমার পরিবারবর্গের সহিত যদি আমার স্ত্রী ও পুত্র দুইটিকে তোমার গ্রামে পাঠাইয়া দাও, ও তোমার গৃহে তাহাদিগকে কিছুদিনের নিমিত্ত আশ্রয় দাও, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়; এমন কি, তাহাদিগের প্রাণদান করা হয়। তা না হইলে এবার আসিয়া বদমায়েসরা সকলকে মারিয়া ফেলিবে। পরিবারবর্গ কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে, আমি একপ্রকার নিশ্চিন্ত হই। তাহার পর আমার নিজের কপালে যাহা থাকে, তাহাই হইবে।"

বাবুরাম উত্তর করিলেন,—"আমার পরিবারের সহিত আপনার স্ত্রীকে আমি পাঠাইতে পারি। কিন্তু বালক দুইটির ভার আমি লইতে পারিব না। তাহারা এখানে সেখানে দৌড়াদৌড়ি করিবে। এ হুল-স্থূলের সময় কে তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে? সঙ্গে আমি নিজে যাইতে পারিতাম, তাহা হইলেও এক কথা থাকিত। কিন্তু সাহেবের অবর্তমানে তাঁহার কার্য পরিত্যাগ করিয়া আপনিও যাইবেন না, আমিও যাইব না।"

অগত্যা গোবিন্দ বাবু কেবল স্ত্রীকে বাবুরামের পরিবারের সহিত পাঠাইতে বাধ্য হইলেন।

ছেলে দুইটি লইয়া এখন ঘোর ভাবনা উপস্থিত হইল। কবে কে আসিয়া তাহাদিগকে কাটিয়া যাইবে, সর্বদাই এই ভয় হইতে লাগিল। অবশেষে পাঁড়ে বলিলেন,—"মহাশয় যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে ছেলে দুইটিকে আমি কানপুরে রাখিয়া আসি। কানপুরের নিকট নবাবগঞ্জে মাঠের মাছখানে একটি নির্জন বাগানে বনের ভিতর আমার স্ত্রী বাস করেন। সে স্থানে কোন ভয় নাই। আমার স্ত্রীর দুইটি মেটে কলসী চুরি করিতে কেহ আর যাইবে না। যদি বলেন তো লব কুশিকে আমার স্ত্রীর কাছে রাখিয়া আসি।"

গোবিন্দ বাবু আমার স্বামীর কথায় সম্মত হইলেন। স্বামী রাত্রি-কালে ছেলে দুইটিকে একখানি গরুর গাড়ীতে বসাইয়া প্রাতঃকালে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লব ও কুশি

তাড়াতাড়ি আমি একখানি চারপাই পাতিয়া দিলাম। জোন সাহেব যে ভাল মখমলের জামা দিয়াছিলেন, ছেলে দুইটি সেই জামা পরিয়া ছিল। তাহাদের কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল এলোথেলো হইয়া বুকে পিঠে পড়িয়াছিল। দেবকুমার তুল্য তাহাদের রূপ! বনের ভিতর আমার সেই ভাঙ্গা খোলার ঘর সেই অপূর্ব রূপরাশিতে আলোকিত হইল। বাজার হইতে পেঁড়া, জিলিপি প্রভৃতি খাবার কিনিয়া দিয়া, আমার স্বামী পুনরায় বাবুর নিকট প্রত্যাগমন করিলেন।

অজ্ঞাত স্থানে, অপরিচিত লোকের কাছে আসিয়া ছেলে দুইটি প্রথমে একটু ভীত হইয়াছিল। কিছুক্ষণ তাহারা বিষণ্ণ বদনে বসিয়া রহিল। কিন্তু আমার আদর ও স্নেহে ক্রমে তাহাদের সাহস হইল। ক্রমে তাহারা দুই একটি কথা কহিতে লাগিল। তাহার পর যখন কে

লব কে কুশি এই লইয়া আমি ভুল করিতে লাগিলাম, তখন আর তাহারা হাসি রাখিতে পারিল না; হা হা করিয়া দুই ভাই একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। সেই সময় হইতে তাহারা ভয় ও লজ্জা-ভাঙ্গা হইয়া গেল। বস্তুতঃ কে লব আর কে কুশি, তাহা চিনিবার যো ছিল না। একরূপ মুখ, একরূপ চক্ষু, সব ঠিক একরূপ। তাহার উপর আবার একরূপ চুল ও একরূপ পোষাক। কে লব কে কুশি, চারি পাঁচ দিন আমার চিনিতে গেল।

এক দিন লব আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"পাঁড়েনি! তোমরা হিন্দুস্থানী; বাবাকে বাঁধিয়া তোমরা মারিয়াছিলে। তোমরা কি আমাদিগকে কাটিয়া ফেলিবে?"

আমি বলিলাম,—"না বাবা! তোমাদিগকে কেহ কিছু বলিবে না। কাহার এমন পাষাণ হৃদয় আছে যে, তোমাদের গায়ে হাত তুলিবে?'

কুশি জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার কাঁসিখানি আমাকে বাজাইতে দিবে, পাঁড়েনী? কাঁসি বাজাইতে আমি বড় ভালবাসি।"

আমি বলিলাম,—"কুশি! কাঁসিখানি একবার তোমাকে বাজাইতে দিব। অধিক বাজাইলে কাঁসি ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমরা গরীব মানুষ; পুনরায় কাঁসি কোথায় পাইব?—তোমরাই বা কিসে রুটি খাইবে?"

শুনিয়াছিলাম, ছেলে দুইটি বড় দুরন্ত। কিন্তু আমার কাছে তাহারা কিছুমাত্র দুষ্টপণা করে নাই। ছেলেমাত্রই মিষ্ট কথার বশ। লব ও কুশিও তাহাই ছিল। তবে দোষের মধ্যে এই যে, আমি তাহাদিগকে ঘরে আটক করিয়া রাখিতে পারিতাম না। তাহারা মাঠে-মাঠে, এ বাগানে সে বাগানে বেড়াইতে যাইত। ছোট ছোট গাছে উঠিত। মাঝে মাঝে নবাবগঞ্জের বাজারেও যাইত, কিন্তু নবাবগঞ্জের সকল লোকই তাহাদিগকে ভালবাসিত।

রামদীন নামক নবাবগঞ্জে একটি যুবক ছিল। সে ভালো লোক ছিল না। এই দুর্দিনে মন্দ লোকের বড়ই প্রভুত্ব বাড়িয়াছিল। দ্রব্যাদি

লুণ্ঠন করা তো সামান্য কথা, এখন কেহ কাহার গলা কাটিয়া ফেলিলেও তাহার দাদ-ফরিয়াদ ছিল না। এক দিন লব কুশিকে রামদীনের সঙ্গে বেড়াইতে দেখিয়া আমার প্রাণে বড় আতঙ্ক হইল। বাঙ্গালীর ছেলে বলিয়া যদি সে তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলে. আমার সেই আশঙ্কা হইল। কিন্তু ভয়ে আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না।

আর একদিন দুই ভাই একটি পায়রার ছানা লইয়া বাটী আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"পায়রার ছানা তোমরা কোথায় পাইলে!"

কুশি বলিয়া ফেলিল,—"রামদীন আমাদিগকে পাতকোর ভিতর হইতে ধরিয়া দিয়াছে।"

লব অমনি বলিয়া উঠিল,—"কুশি! কুশি! করিলে কি? বলিয়া দিলে! রামদীন যে তোমাকে কাটিয়া ফেলিবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কূপ! কোন্ কূপ হইতে রামদীন তোমাদিগকে পায়রা ধরিয়া দিয়াছে?"

কুশি উত্তর করিল,—না পাঁড়েনী, আমি আর বলিব না। সে কূপের ভিতর গর্ত আছে। সে কূপের ভিতর রামদীন কখন কখন শুইয়া থাকে। তাহার ভিতর রামদীনের টাকা আছে। বলিতে সে মানা করিয়াছিল। যদি বলি, সে আমাকে কাটিয়া ফেলিবে।"

যাহা হউক, ছেলে দুইটিকে ভুলাইয়া আমি সকল কথা বাহির করিলাম। বুঝিলাম যে, আমাদের বাড়ী হইতে অল্প দূরে যে একটি বাগান আছে, আর সেই বাগানের ভিতর যে এক পুরাতন অন্ধকূপ আছে, রামদীন সেই কূপ হইতে কপোতশাবক ধরিয়া দিয়াছিল। আরও বুঝিলাম যে, সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া যখন সরকারী খাজনাখানা লুঠ করে ও পথে মাঠে টাকা ছড়াইয়া ফেলে, তখন রামদীন কিছু টাকা সংগ্রহ করে, আর সেই টাকা কূপের ভিতর সে লুকাইয়া রাখিয়াছে।

পরদিন আমি রামদীনকে মিনতি করিয়া বলিলাম,—"বাবা! অনাথ শিশু দুইটি আমাদের আশ্রয়ে আসিয়াছে। তাহাদিগকে প্রাচীন অন্ধকূপের নিকট লইয়া যাওয়া কি ভাল? কোন্ দিন পড়িয়া, গিয়া শেষে কি তাহারা প্রাণ হারাইবে!"

"তোমাকে বলিয়া দিয়াছে, বটে!" এই কথা বলিতে বলিতে রামদীন গজ্ গজ্ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

চারি পাঁচ দিন গত হইয়া গেল। একদিন অপরাহ্ণ তিনটার সময়, যে বাগানে সেই অন্ধকূপ আছে, ছেলে দুইটি সেই বাগানে খেলা করিতেছিল। কুশি সে দিন আমার নিকট হইতে আর একবার কাঁসি চাহিয়া লইয়াছিল। নিকটে সেই বাগানের বাহিরে, আমি গরু ছাড়িয়া দিয়া, পাছে কাহারও ক্ষেতে পড়ে, এ নিমিত্ত চৌকি দিয়া বসিয়াছিলাম। ও দিকে কুশি কাঁসি বাজাইতেছিল। সেই শব্দ শুনিয়া ছেলেদের জন্য আমি নিশ্চিত ছিলাম। কিছু ক্ষণ পরে সহসা কাঁশির শব্দ বন্ধ হইয়া গেল। "লব তুমি পারিবে না, আমি নামি," এই কয়টি কথা সহসা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। এই কয়টি কথা শুনিয়া আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দাঁড়াইয়া সেই প্রাচীন কূপের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, লব উপরে দাঁড়াইয়া আছে, আর সর্বনাশ! একটি ঝ্যাঁকড়ামাথা কূপের ভিতর নামিতেছে। সেই ঝ্যাঁকড়া মাথাটি কূপের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল।

"ওমা! এ কি সর্বনাশ হইল," "কে কোথায় আছ শীঘ্র এস,"—এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে আমি কূপের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলাম। কূপের নিকট আসিয়া লবকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"লব! লব! কুশি কই?

লব উত্তর করিল,—তোমার কাঁসিখানি কূপের ভিতর পড়িয়া গিয়াছে, কুশি তাহা তুলিয়া আনিতে কূপের ভিতর নামিয়াছে।"

পাতকোর ভিতর আমি উঁকি মারিয়া দেখিলাম, কিন্তু কুশিকে দেখিতে পাইলাম না। আমি তাড়াতাড়ি কূপের ভিতর নামিতে চেষ্টা করিলাম; কিছুতেই নামিতে পারিলাম না। পুনরায় উপরে আসিয়া কূপের ভিতর মুখ করিয়া,—"কুশি! কুশি!" করিয়া বারবার চীৎকার করিতে লাগিলাম। আমি কত ডাকিলাম, লব কত ডাকিল; কিন্তু কোন উত্তর নাই; কোন সাড়া শব্দ নাই। ঘোরতর বিপদ যে ঘটিয়াছে, তখন তাহা নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম। উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে

লোক ডাকিতে লাগিলাম। কিন্তু সে মাঠের মাঝখানে কাহারও সাড়া পাইলাম না, জনপ্রাণী কেহ আসিল না। তখন আমি লবকে বলিলাম, —"তুমি শীঘ্র নবাবগঞ্জে গিয়া খবর দাও। দুই চারি জন পুরুষ মানুষ, যাহাকে দেখিতে পাও, তাহাকে ডাকিয়া আন। আমি কূপের ধারে দাঁড়াইয়া থাকি।"

লব নবাবগঞ্জের দিকে দৌড়িল।

মাঝে মাঝে আমি কূপের ভিতর মুখ করিয়া, 'কুশি কুশি' করিয়া ডাকিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া লোক ডাকিতে লাগিলাম; মাঝে মাঝে শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মনে করিলাম যে, আর এখন লোক আসিলেই বা কি হইবে! যা হইবার, তা হইয়া গিয়াছে, ঘোর সর্বনাশ ঘটিয়াছে। কূপে তখন প্রায় চারি পাঁচ হাত জল ছিল। হয় কুশি তাহাতে ডুবিয়া মরিয়াছে, আর না হয় কূপের দূষিত বায়ুতে শ্বাসরোধ হইয়া তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। এখন লোক আসিলে আর কোন ফল হইবে না, কেবল তাহার মৃতদেহটি তুলিবে। আশা ভরসা একেবারে গেল বটে, তথাপি মন বুঝিল না। প্রায় আধ ঘণ্টা হইয়া গেল, তখনও লব ফিরিল না। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। নিজে নবাবগঞ্জের দিকে দৌড়িলাম। পথে দেখিলাম, লব দুই জন পুরুষ মানুষ লইয়া আসিতেছে। তাহাদের একজনের হাতে কূপ হইতে লোটা তুলিবার কাঁটা ছিল।

সকলে পুনরায় কূপের নিকট আসিলাম। রজ্জু-সংযুক্ত কাঁটা প্রথম তাহারা কূপের ভিতর নামাইয়া দিল। জল ভেদ করিয়া কাটা গিয়া ভূমি স্পর্শ করিল। চারিদিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কাঁটা দিয়া তাহারা কূপের নিম্নদেশ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল। কাঁটাতে কোন বস্তুই বাধিয়া গেল না। কূপের ভিতর কুশির চিহ্ন মাত্রও তাহারা দেখিতে পাইল না। অবশেষে একজন লোক কূপের ভিতর গিয়া নামিল। জলে ডুব দিয়া অনেক অনুসন্ধান করিল। কুশির মৃতদেহ তাহারা পাইল না। কুশি যে কূপের ভিতর পড়িয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। যখন সে কূপের ভিতর প্রবেশ করে, লব

তখন উপরে ; সে আগাগোড়া সমুদয় দেখিয়াছে। দূর হইতে আমিও কুশির মাথা দেখিতে পাইয়াছিলাম। সুতরাং সে যে কূপে পড়িয়া মরিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু মৃতদেহ গেল কোথা ?

যে লোকটি কূপের ভিতর নামিয়াছিল, সে বলিল,—"কূপের পার্শ্বে অনেকগুলি গহ্বর আছে, এমনকি জলের ভিতরও একপার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড গর্ত। সেই গর্ত বোধ হয়, পাতাল পর্যন্ত গিয়াছে। রাক্ষসে হয় তো তাহার মৃতদেহ টানিয়া লইয়া খাইয়া ফেলিয়াছে।"

ক্রমে সে স্থানে আরও অনেক লোক আসিল। আরও দুই চারি জন কূপের ভিতর নামিল। কিন্তু কুশির কিছুমাত্র সন্ধান হইল না।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। আর কি করিব। লবকে লইয়া আমি আমার কুটীরে যাইলাম।

তৃতীয় অধ্যায়

শুভ সংবাদ

"কুশি কোথায় গেল, কুশির কি হইল," এই কথা বলিয়া লব কাঁদিয়া আকুল হইল। দুই জনে এক প্রাণ এক শরীর বলিলেও হয়। আজ কুশিকে হারাইয়া চারি দিক্ সে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। আমি মনে মনে ভাবিলাম যে, লবও বাঁচিবে না। তাহার পর আমার নিজের কথা আমার ছেলে পিলে হয় নাই। কুশি যদি আমার নিজের ছেলে হইত, তাহা হইলে, সে দিন আমি যেরূপ হইয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা বোধ হয়, অধিক শোকাকুলা বা অধিক অধীরা হইতাম না। লবের ভয়ে অধিক কাঁদিতে পারিলাম না। মনের ভিতর শোকানল গুমে গুমে জ্বলিতে লাগিল। হায়! কি করিয়া আমি পুনরায় পাঁড়ের নিকট এ পোড়া মুখ বাহির করিব? আমি কুশির বাবাকে কি বলিব।

কোনরূপে সে কাল-রাত্রি কাটিয়া গেল। তাহার পর দিন লব ও

আমি পুণরায় কূপের ধারে গিয়া বসিলাম। সান্ত্বনা করিতে করিতে আমি লবকে একবার বলিয়াছিলাম যে, "কুশি স্বর্গে গিয়াছে।" লব সেই কথাটি ক্রমাগত তোলা-পাড়া করিতে লাগিল।

লব বলিল, "স্বর্গ উপরে, যে স্থানে সূর্য্য উঠে, চন্দ্র উঠে, নক্ষত্র উঠে, কুশি সেখানে যায় নাই. কুশি কূপের ভিতর গিয়াছে। সেখানে অন্ধকার, সেখানে পাতাল ; সেখানে স্বর্গ নয়। কুশি যদি স্বর্গে যায়, তাহা হইলে প্রথম সে কূপ হইতে উঠিবে, তাহার পর স্বর্গে যাইবে। সেই সময় আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিব, তাহাকে স্বর্গে যাইতে দিব না। চল, পাঁড়েনি, তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত কূপের ধারে গিয়া আমরা বসিয়া থাকি।

কি করি! ছেলেকে তা না হইলে কিছুতেই সুস্থির রাখিতে পারি না। কাজেই দুই জনে কূপের ধারে গিয়া বসিয়া রহিলাম। বাজার হইতে খাবার আনাইয়া লবকে দিলাম, কিন্তু সে কিছুই খাইল না। বিরসবদনে, একান্ত মনে, সমস্ত দিন কেবল কূপের দিকে সে চাহিয়া রহিল। সন্ধ্যা হইলে অনেক বুঝাইয়া লবকে লইয়া বাড়ী যাইলাম।

কিন্তু লব বলিল,—"পাঁড়েনি! আজ আমি ঘরের ভিতর শুইব না। ঘরের বাহিরে এই স্থান হইতে পাতকো দেখা যায়, কূপের দিকে চাহিয়া আমি এই স্থানে বসিয়া থাকিব। কূপ হইতে কুশি যখন উঠিবে তখন তাহাকে ধরিয়া আনিব।"

কি করি। চারপাই আনিয়া সেই স্থানে দুই জনে বসিয়া রহিলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল। লব একদৃষ্টে কূপের দিকে চাহিয়া রহিল। আমার চক্ষু দিয়া অবিরল, ধারায় অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। শোকে তাপে অনাহারে, আমি অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছিলাম। বসিয়া বসিয়াই একটু অবসন্ন হইয়া পড়িলাম ; আমার চক্ষু দুইটি একটু বুজিয়া আসিল। এমন সময় সহসা লব চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ঐ কুশি, ঐ কুশি, ঐ কুশি আসিয়াছে।"

এই কথা বলিয়া সে পাগলের ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে কূপের দিকে দৌড়িল। আমিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলাম। কিছু দূরে দেখি যে, সত্য

সত্যই কুশি ! টলিতে টলিতে কুশি আসিতেছে।

লব তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল, বলিল,—"কুশি এতক্ষণ কোথায় ছিলে ভাই ! পাঁড়েনি বলে, তুমি স্বর্গে গিয়াছ। আমি বলিলাম, না পাঁড়েনি কুশি স্বর্গে যায় নাই। সে একলা কোথাও যায় না। যেখানে যাই, আমরা দুই জনে একসঙ্গে যাই। এখন চল, ভাই, বাড়ী চল। আমি তোমাকে স্বর্গে যাইতে দিব না।"

অন্য সময় হইলে, বোধ হয় ভূত বলিয়া আমার মনে ভয় হইত। কিন্তু তখন আমার জ্ঞান ছিল না। তাড়াতাড়ি গিয়া আমি কুশিকে কোলে লইলাম। কোলে লইয়া তাহাকে বাড়ী আনিলাম। কিন্তু ছেলে কথা কহে না। তাহার শরীর কৃশ, মুখ মলিন, মুখে যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে। মুখে হাতে তাহার জল দিলাম। ঘরে দুধ ছিল, তাহাকে খাইতে দিলাম, কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে কুশির মুখ দিয়া দুই একটি কথা বাহির হইল। কি ঘটিয়াছিল, কুশির মুখ হইতে তখন ক্রমে ক্রমে সকল কথা জানিতে পারিলাম।

কুশি বলিল—"পাতকোর ধাবে আমরা দুইজনে খেলা করিতেছিলাম। মাঝে মাঝে একবার লব, একবার আমি, আমরা দুই জনে কাঁসি বাজাইতেছিলাম। এমন সময় কূপের ভিতর হইতে একটি পায়রা উড়িয়া গেল। কূপের ভিতর কোন্ স্থানে পায়রার বাসা আছে, তাহা দেখিবার নিমিত্ত আমি উঁকি মারিলাম। দৈবক্রমে আমার হাত হইতে কাসিখানি কূপের ভিতর পড়িয়া গেল। কূপের গা অনেক স্থানে ভাঙ্গা ছিল, ইটের খাটাল বাহির হইয়াছিল। কূপে যে জল আছে, তাহা আমি জানিতাম না। এ কূপ হইতে কেহ জল লয় না। সে জন্য মনে করিলাম যে, কূপে জল নাই, কূপ শুষ্ক। ইটের খাটাল দিয়া কূপেব ভিতর অনায়াসে নামিতে পারা যায়। কাসির জন্য, পাঁড়েনি তুমি দুঃখ করিবে, তাই লব কূপের ভিতর নামিতে চাহিল। কিন্তু আমি তাহাকে নামিতে দিলাম না। কাঁসি আনিবার নিমিত্ত আমি নিজেই নামিলাম।"

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া কুশি পুনরায় বলিল,"—ভাঙ্গা স্থানের গর্তে

ও ইটের খাটালে পা দিয়া কূপের ভিতর আমি আস্তে আস্তে নামিতে-ছিলাম। এমন সময় একবার যেখানে আমি পা রাখিয়াছিলাম, হঠাৎ সেই স্থানের ইট একটু ভাঙ্গিয়া গেল। আমি ঝুপ করিয়া অনেক নীচে গিয়া পড়িলাম; কিন্তু একেবারে জলে গিয়া পড়ি নাই। সে স্থানে ইটের ভিতর হইতে ছোট একটি গাছ বাহির হইয়াছিল। আমি সেই গাছটি ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলাম। তৎক্ষণাৎ কে আসিয়া আমার কোমর জড়াইয়া ধরিল। আমাকে টানিয়া কূপের গায়ে একটি গর্তে লইয়া গেল। সে স্থানে নিবিড় অন্ধকার। কে আমাকে ধরিয়া লইয়া গেল, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না। তাহার পর তোমরা, 'কুশি, কুশি' করিয়া ডাকিতে লাগিলে। তখন সে বলিল,—"খবরদার! যদি কথা কও, কি উত্তর দাও, তাহা হইলে তোমাকে এখনি কাটিয়া ফেলিব। তাহার স্বর শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, সে রামদীন। ভয়ে আমি চুপ করিয়া রহিলাম; উত্তর দিতে পারিলাম না। অনেকক্ষণ গর্তের ভিতর নিশব্দে দুই জনে বসিয়া রহিলাম। তাহার পর উপরে তোমাদের আর কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না। তখন রামদীন বলিল,—'তুমি এই স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাক, আমি দেখিয়া আসি। এই বলিয়া রামদীন উপরে উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নামিয়া আসিল। আসিয়া বলিল,—"এখন উপরে কেহ নাই। বড় যে পায়রার কথা পাঁড়েনিকে বলিয়া দিয়াছিলি? এখন কি হয়? এখন যদি তোকে মারিয়া ফেলি তাহা হইলে তোর কোন বাপ রাখে? কিন্তু তোকে প্রাণে মারিব না। বিলক্ষণ সাজা দিয়া তাহার পর ছাড়িয়া দিব। রামদীন এখন আমাকে উপরে উঠিতে বলিল। ইটে পা দিয়া ছোট ছোট গাছ ধরিয়া আমি উপরে উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমি একলা কিছুতেই উপরে উঠিতে পারিতাম না। উপর হইতে রামদীন হাত বাড়াইয়া দিতে লাগিল। সেই হাত ধরিয়া ক্রমে ক্রমে অতি কষ্টে উপরে উঠিলাম। উঠিয়া দেখিলাম, তুমিও নাই, লবও নাই, কেহ কোথাও নাই। তখন তোমরা নবাবগঞ্জে লোক ডাকিতে গিয়াছিলে। হাত ধরিয়া রামদীন আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। বাগানের বাইরে

সাহেবদের যে খোলার ঘরে সহিস ও চাকরেরা থাকিত, রামদীন আমাকে সে দুটি ছোলাভাজা খাইতে দিল। সেই ছোলাভাজা ও একটু জল খাইয়া আমি মাটির উপর শুইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে রাত্রি হইল। আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। সে রাত্রিতে আর কি হইল, তাহা আমি জানি না। আজ দিন হইলে রামদীন তলওয়ার বাহির করিয়া কখন আমাকে কাটিতে যাইতেছিল কখন আমাকে মারিতে যাইতেছিল। সে বলিল,—'তোরে এক একবার মারিয়া ফেলিতে মন হয়, কিন্তু আবার মন হয় না। তাহা না হইলে কুপের ভিতর গলা টিপিয়া তোরে আমি মারিয়া ফেলিতাম। কেমন! পাঁড়েনিকে আর কিছু বলিবি? পায়রার কথা বলিয়াছিলি, তহোতে কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু আমার টাকার কথা প্রকাশ করিয়া দিলি কেন? আমি বলিলাম —"পাঁড়েনিকে আর কখন কিছু বলিয়া দিব না। তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি বাড়ী যাই। আমার জন্য লব হয়তো কত কাঁদিতেছে।" সে বলিল,—'এখনও নয়, আরও জব্দ করিয়া তাহার পর ছাড়িয়া দিব।' রামদীনের কাছে অনেক টাকা আছে, সাহেবদের কাপড় আছে। সে সকল আমাকে দেখাইল। তাহার পর সে টাকা গুণিতে বসিল। তাহার পর ঘরের ভিতর আমাকে বন্ধ করিয়া দ্বারে শিকল দিয়া, আজ রামদীন একবার বাহিরে গিয়াছিল। যদি আমি চীৎকার করি, তাহা হইলে আমাকে কাটিয়া ফেলিবে, এইরূপ ভয় দেখাইয়া সে একবার মাত্র অল্পক্ষণের নিমিত্ত বাজারে গিয়াছিল। বাজার হইতে পুরি আনিয়া সেও খাইল, আমাকেও খাইতে দিও। তাহার পর পুনরায় রাত্রি হইল। রামদীন নিদ্রা গেল। আজ আমি কোনরূপে পলাইব, এইরূপ মনে করিয়া জাগিয়া রহিলাম। অনেক রাত্রিতে রামদীনের ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। যখন আমার নিশ্চয় বোধ হইল যে সে নিদ্রা গিয়াছে, তখন আমি আস্তে আস্তে দ্বার খুলিয়া পলাইয়া আসিলাম।"

এই গেল কুশির বিবরণ। পর দিন আমি রামদীনের নিকট গিয়া তাহরে পায়ে হাতে অনেক পড়িলাম। ঘরে আমার দুধ হইত, তাহাকে

এক লোটা দুধ দিলাম। ঘি করিয়া রাখিয়াছিলাম, সে ঘি তাহাকে দিলাম। বাজার হইতে পেড়া কিনিয়া দিলাম। এইরূপে বিধিমতে সান্ত্বনা করিয়া তাহাকে বলিলাম,—"বাবা! শিশু দুইটির মা নাই! আমাদের আশ্রয়ে আসিয়াছে। আমার নিকট কুশি কিছুমাত্র তোমার নিন্দা করে নাই। তোমার কি আছে না আছে, সে কথাও কিছু বলে নাই। আর যদি তুমি দু-পয়সা রোজগার করিয়া থাক, সে তো ভাল কথা। সে কথা আমি গোপন রাখিব, কাহাকেও কিছু বলিব না। তুমি তাহাদিগকে পায়রা ধরিয়া দিয়াছিলে, সে জন্য লব কুশি তোমার কত সুখ্যাতি করিয়াছিল। সে দিন তুমি পাতকোর ভিতর না থাকিলে কুশি নিশ্চয় জলে পড়িয়া মারা পড়িত। ভাগ্যে তুমি সে সময় পাতকোর ভিতর ছিলে তাই তাহার প্রাণ বাঁচিয়া ছিল। যদি বাছা, ছেলেটির তুমি প্রাণ রক্ষা করিলে, তবে আর তাহাকে কিছু বলিও না।"

কিছু দিন পরে ইংরেজের পুনরায় রাজত্ব হইল। দেশে পুনরায় বিচার-আচার আরম্ভ হইল, অরাজকতা ঘুচিল, লুট-পাট, খুন-খারাবি সব বন্ধ হইয়া গেল। দেশে পুনরায় শান্তি সংস্থাপিত হইলে গোবিন্দবাবু হরডুই হইতে স্ত্রীকে আনাইয়া ও আমার নিকট হইতে ছেলে দুইটিকে লইয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন। আমাদিগকে পারিতোষিক স্বরূপ তিনি যে টাকা দিলেন, পাঁড়ে সেই টাকা দিয়া জমী লইয়া চাষ করিতে লাগিলেন। আর দশ বৎসর হইল, পাঁড়ে পরলোক গমন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি লোকের গম পিষিয়া ও নানা প্রকার দুঃখ ধান্ধা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করি।

কিন্তু বাবু! ছেলে দুইটির জন্য এখনও আমার প্রাণ কাঁদে। সেই পর্যন্ত লব কুশির আমি কোন সংবাদ পাই নাই। তাহারা কোথাও আছে, কেমন আছে, বলিতে পারেন?

যাঁহাদের নিকট পাঁড়েনি লব ও কুশির গল্প করিতেছিল, সেই বাঙ্গালী বাবুগণ উত্তর করিলেন,—"না, পাঁড়েনি! আমরা তাহাদিগকে জানি না; যদি তুমি তাহাদের ঠিকানা বলিতে পারিতে, তাহা হইলে চিঠি লিখিয়া সংবাদ লইতে পারিতাম। তাহাদের বাড়ী কোন্ গ্রামে,

কোন্ জেলায়, যখন তাহার কিছুই তুমি জান না, তখন কি করিয়া আমরা তাহাদের সন্ধান লইব ?”

এই কথা শুনিয়া, আপনার পারিতোষিক লইয়া বিরস বদনে পাঁড়েনী চলিয়া গেল।

শম্ভু ঘোষের কন্যা

প্রথম পরিচ্ছেদ

হরিদাসী

“হ্যাঁ! মহাশয়! ইহার নাম হরিদাসী, আমার এক মাত্র কন্যা। হরিদাসী আমাদের প্রাণ, গৃহিণীর ও আমার। হরিদাসীকে এক দণ্ড না দেখিলে পৃথিবী আমরা আঁধার দেখি। হরিদাসীকে একবার ভাল করিয়া দেখুন, মহাশয়! আমাদের ঘরে এমন মেয়ে হয় না, রাজার ঘরে হইলে তবে শোভা পায়।

সত্য সত্যই হরিদাসীর রূপ-লবণ্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। কন্যাটির বয়স দশ বৎসরের অধিক নয়। তথাপি তাহাকে একবার দেখিলে, বার বার দেখিতে ইচ্ছা হয়। রংটি ফুটফুটে; চক্ষু দুইটি টানা টানা; চক্ষুর তারা দুইটি উজ্জ্বল, চুল চুলে ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; চক্ষুর পাতাগুলি ঘন দীর্ঘ; নিবিড় মেঘরাশির ন্যায় মাথার চুল:—ফল কথা, কৃষকের ঘরে এরূপ কন্যা অতি বিরল।

হরিদাসী শম্ভু ঘোষের কন্যা। শম্ভূ ঘোষের নিবাস বীরভূম জেলা। ইঁহার ঘরে আজি কুটুম্ব আসিয়াছেন। আহারাদি করিয়া কুটুম্ব বাহিরের একখানি চালায় বসিয়া আছেন। বৈশাখ মাস, বেলা দুই প্রহর, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। শম্ভু ঘোষ কুটুম্বের নিকট বসিয়া গল্প করিতেছেন। এমন সময় নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে হরিদাসী আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। চালাখানি সহসা যেন আলোকিত হইল। কুটুম্ব

হরিদাসীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া হরিদাসীর পিতা উপরের কথাগুলি বলিলেন॥

শম্ভু ঘোষ পুনরায় বলিলেন,—"হা মহাশয়! ধর্ম কর্ম করিলে, জীবের প্রতি দয়া করিলে, ভগবান্ যে প্রসন্ন হন, তাহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি।"

কুটুম্ব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন? কি হইয়াছিল?"

শম্ভূ বলিলেন,—"আপনি একটু শয়ন করুন, কাছে বসিয়া আমি সেই গল্প করি। বড় গল্প করিয়া আপনাকে আমি বিরক্ত করিব না, গল্পটি ছোট। হরিদাসী, মা! তুমি ঘরের ভিতর যাও।"

শম্ভূ বলিলেন,—আজ পাঁচ বৎসরের কথা বলিতেছি। একবার ধান বেচিতে আমি শিউড়ি গিয়াছিলাম। আমার নিজের সামান্য একখানি গরুর গাড়ী আছে। ধানের থলিগুলি সেই গাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলাম।

যাইবার চারি পাঁচ দিন পূর্ব হইতে পাড়াপ্রতিবাসী সকলে আসিয়া বলিতেছিলেন,—"ঘোষের পো! আমার জন্য এ জিনিস আনিও, কেহ বলিতেছিলেন, আমার জন্য সে জিনিস আনিও। কাহারও কাপড়, কাহারও বাসন, কাহারও শিল, এইরূপ নানাবিধ জিনিস আনিতে সকলে আমাকে অনুরোধ করিতেছিলেন। তাহার পর আমার নিজের গৃহিণীর ফর্দ। সেও একরাশি জিনিসের ফর্দ! আমি লেখা পড়া জানি না; মন আমার কাগজ কলম; যাহার যে বস্তু আবশ্যক, সে সব আমি মনে করিয়া লইলাম। অবশেষে হরিদাসীকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, —"তোমার কি চাই, মা?"

হরিদাসী উত্তর করিল,—"আমার জন্য ভাল একটি কাঠের পুতুল আনিও, বাবা।"

যাইবার দিন প্রাতঃকালে হরিদাসী গাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আদর করিয়া আমি তাহাকে কোলে লইলাম। আমার বক্ষঃস্থলে মাথা রাখিয়া হরিদাসী পুনরায় বলিল,—"আমার জন্য ভাল

দেখিয়া কাঠের পুতুল আনিও, বাবা।”

আমি উত্তর করিলাম,—“হাঁ, মা! নিশ্চয় আনিব। শিউড়ির বাজারে সকলের চেয়ে ভাল যে কাঠেরপুতুল পাই, তোমার জন্য তাহাই আনিব।”

আমাদের গ্রাম হইতে শিউড়ি দশ ক্রোশ পথ। সন্ধ্যা বেলা সে স্থানে উপস্থিত হইলাম। তাহার পর ধান বেচিলাম। কতক কতক জিনিসও ক্রয় করিলাম। তৃতীয় দিন যাহা বাকী ছিল, সেই সমস্ত জিনিস-পত্র কিনিলাম? বলা বাহুল্য যে, হরিদাসীর জন্য একটি কাঠের পুতুল কিনিলাম। এই সব কাজ সারিতে অনেকটা বেলা হইয়া গেল। আজ আমার বাড়ী ফিরিবার কথা। সকলকে নিশ্চয় করিয়া বলিয়া আসিয়াছিলাম যে, তৃতীয় দিন যেমন করিয়া পারি বাড়ী আসিয়া পৌঁছিব। কিন্তু এত বেলায় শিউড়ি হইতে বাহির হওয়া উচিত নয়; কারণ, বাড়ী পৌঁছিতে রাত্রি হইয়া যাইবে। সময়টাও ভাল ছিল না। দেশে এক প্রকার আকাল উপস্থিত হইয়াছিল। ঠেঙাড়েরা পথে দুই একটা মানুষও মারিয়াছিল। ধান বেচিয়া আমার সঙ্গে টাকা ছিল। এই সকল কারণে একবার মনে করিলাম, আজ আর বাটী ফিরিব না। কিন্তু না গেলে বাড়ীর লোকে অতিশয় চিন্তিত হইবে। তাহার পর হরিদাসীর চাঁদমুখখানি দেখিবার নিমিত্ত প্রাণ বড়ই কাতর হইয়া উঠিল। যা থাকে কপালে, যাই! অবশেষে এই মনে করিয়া দুর্গা বলিয়া যাত্রা করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাবা গো!

শীতকাল! দারুণ শীত। তাহার উপর সমস্ত দিন বাদলার মত করিয়াছিল। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। হু-হু শব্দে বাতাস বহিতেছিল। সন্ধ্যাবেলা বিলক্ষণ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেল। আমার কাপড়-চোপড় সব ভিজিয়া গেল। শীতে আমি কাঁপিতে লাগিলাম।

সর্ব শরীর আমার অবশ হইয়া গেল। তখনও আমার গ্রাম হইতে আমি পাঁচ ক্রোশ দূরে।

দ্রুতবেগে গাড়ী হাঁকাইয়া দিলাম। আমাদের গ্রাম হইতে দুই ক্রোশ দূরে বড় মাঠের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পুনরায় ঘোর মেঘ করিয়া আসিল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহার উপর প্রবল ঝড় উপস্থিত হইল। নিবিড় অন্ধকার। কোলের মানুষ দেখা যায় না। আমাদের গ্রাম হইতে এক ক্রোশ দূরে একটি নদী আছে। সেই নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নদীটি পার হইয়াছি, এমন সময় হঠাৎ একবার শিশু কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। কোন শিশু যেন কাঁদিতেছে, এইরূপ বোধ হইল। কিন্তু একবারের অধিক আর সে শব্দ শুনিতে পাইলাম না। কারণ, তাহার পরক্ষণেই বাতাসের ঝট্‌কা প্রবল হইয়া উঠিল। সেই বাতাসের শব্দে অন্য শব্দ সব ডুবিয়া গেল।

মনে করিলাম, এ কিছু নয়, ভ্রান্তিবশতঃ ওরূপ শব্দ আমার কানে লাগিয়াছিল। এরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় আবার 'বাবা গো!' এইরূপ একটি শিশুকণ্ঠ-শব্দ আমার কানে প্রবেশ করিল। তখন আমার মনে অতিশয় ভয় হইল। একবার মনে করিলাম, এ আর কিছু নয়, এ ভূত কি পেতিনী। আবার মনে হইল, না, তা নয়, এ ঠেঙাড়ে, আমাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য এরূপ কৌশল করিতেছে। একবার মনে করিলাম যে, গাড়ী ছাড়িয়া আমি দৌড়িয়া পলায়ন করি। কিন্তু গরু যোড়াটি নূতন কিনিয়াছিলাম। তাহার মায়া ছাড়িতে পারিলাম না। গাড়ী দ্রুত-বেগে হাঁকাইয়া দিলাম।

দুই চারি পা গিয়াছি, এমন সময় আবার 'মা গো!' বলিয়া শব্দ হইল। তখন মনে আমার চিন্তা হইল—সত্য সত্যই যদি কোন ছেলে এই মাঠের মধ্যে, এই রাত্রিকালে, এই দুর্য্যোগে, এই শীতে, একা পড়িয়া থাকে! তাহা হইলে শম্ভু ঘোষ, তুমি কি বলিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছ? তোমার মনে কি দয়ামায়া নাই? তুমি না যাদব ঘোষের বেটা? ছি! শম্ভু ঘোষ! তোমার এরূপ করা উচিত নয়।

এইরূপে মনকে প্রবোধ দিয়া আমি গাড়ী হইতে নামিলাম। যে দিক হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে আস্তে আস্তে যাইতে লাগিলাম। কিন্তু ঘোর অন্ধকার! কিছু দেখিবার যো ছিল না। যথাসাধ্য এ দিক্ ও দিক্ খুঁজিতে লাগিলাম। কিছুই পাইলাম না। গাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় একবার বিদ্যুৎ হইল। সেই আলোকে দেখিলাম যে, আমার নিকট হইতে অল্প দূরে নদীর ধারে ঝোপের ভিতর সাদা রঙ্গের কি পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটে গিয়া হাত দিয়া দেখিলাম যে, একটি চারি পাঁচ বৎসরের শিশু! তখনও জীবিত আছে, শীতে কাঁপিতেছে, কিন্তু কথা কহিতে পারে না। যাহার শিশু হউক, হাড়ীর হউক, আর মুচির হউক, বালক হউক, কি বালিকা হউক, ভগবানের জীব! আমি যে তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলাম, সে জন্য আমার মনে ঘোর আনন্দের উদয় হইল।

তাড়াতাড়ি আমি তাহাকে বুকে তুলিয়া লইলাম। শিশুটিকে গাড়ীর উপর শয়ন করাইলাম। আমার পাছুড়িখানির যে দিক্‌টি একটু শুষ্ক ছিল, সেই দিক্‌টি তার গায়ে চাপা দিলাম। এইরূপ করিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিলাম।

যখন আমার বাড়ীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম, সকলে নিদ্রা গিয়াছে; কিন্তু তাহা নহে। দূর হইতে দেখি যে, আমার বাড়ীতে অনেকগুলি আলো জ্বলিতেছে, অনেকগুলি মেয়ে-পুরুষ আমার বাটীতে আসিয়াছে। আমার ভয় হইল। মনে করিলাম, কি বিপদ ঘটিয়াছে। রাস্তায় গাড়ী রহিল, আমি লাফাইয়া পড়িলাম। দৌড়িয়া গিয়া গৃহে উপস্থিত হইলাম। আমার স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিল। পাড়ার মেয়েরা হাউ কাউ করিয়া উঠিল। শশব্যস্ত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হইয়াছে? হরিদাসী ভাল আছে তো? হরিদাসী কই?"

গোলমালের ভিতর হইতে অনেক কষ্টে এক জনের মুখ হইতে শুনিলাম যে, হরিদাসী হারাইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা হইতে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। গ্রামের ঘরে ঘরে, মাঠে ঘাটে

সর্বত্র অনুসন্ধান হইয়াছে ; কিন্তু কোথাও হরিদাসীকে পাওয়া যায় নাই। তাহার গায়ে গহনা ছিল, নিশ্চয় তাহাকে চোরে মারিয়া ফেলিয়াছে।

এত দূর বলিয়া কুটুম্বের দিকে লক্ষ্য করিয়া শম্ভু ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! নিদ্রা গেলেন কি ?"

কুটুম্ব উত্তর করিলেন,—"না, নিদ্রা যাই নাই। সকল কথা শুনিয়াছি। তাহার পর কি হইল ?"

শম্ভু পুনরায় বলিলেন,—নয়নের পুতলী আমার হরিদাসী নাই, প্রতিবাসিনীর মুখে এই নিদারুণ শুনিয়া আমি জ্ঞান-হারা পাগলের ন্যায় হইয়া পড়িলাম। কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া পুনরায় ঘর হইতে বাহির হইলাম। রাস্তায় যে স্থানে আমার গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, নক্ষত্র-বেগে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গাড়ী হইতে তুলিয়া শিশুটিকে বুকে লইলাম। দৌড়িয়া পুনরায় ঘরের ভিতর গিয়া প্রদীপের আলোকে শিশুর মুখখানি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম। সেই চাঁদ-মুখ খানি দেখিয়া শূন্য দেহে আমি প্রাণ পাইলাম। তাহার পর অনেক তাপ দিয়া, অনেক শুশ্রূষা করিয়া মেয়েকে আমরা ভাল করিলাম।

কুটুম্ব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাটী হইতে মাঠের মাঝে সে কি করিয়া গিয়াছিল ?"

শম্ভু বলিলেন.—"আমি যে সে দিন বাটী পৌঁছিব, হরিদাসী তাহ শুনিয়াছিল। বাবা কখন আসিবেন, কখন আমার জন্য পুতুল আনিবেন, সমস্ত দিন সে বার বার সকলকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল। বৈকালবেলা আর থাকিতে পারিল না। চুপি চুপি একাকী আগে হইতে আমাকে আনিবার নিমিত্ত সে বাটী হইতে বাহির হইল। পাঁচ বৎসরের শিশু। পথ-ঘাট জানে না। মাঠের মাঝখানে গিয়া পড়িল। সন্ধ্যা হইল, ঝড়-জল হইল, অন্ধকার হইল। জনশূন্য সেই মাঠের মাঝ-খানে কত কাঁদিল, কাহারও সাড়া শব্দ পাইল না। ভয়ে ও শীতে মৃতপ্রায় হইয়া সেই নদীর ধারে ঝোপের ভিতর গিয়া শুইয়া পড়িল। ভাগ্যে আমার মনে একটু দয়ার উদয় হইল, তাই সে রাত্রিতে আমার মেয়ে বাঁচিল। সেই জন্য বলি যে, জীবে দয়া করা ভাল। যে জীবে দয়া করে, ভগবান্ তাহার প্রতি কৃপা করেন।"

ললিত ও লাবণ্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাইজের পুস্তক

হাসিতে হাসিতে ললিত আজ বাটী আসিল। স্কুলে ললিত আজ প্রাইজ পাইয়াছে। ললিত সাত বৎসরের ছেলে। কিন্তু এরূপ সুবোধ শিশু পৃথিবীতে অতি বিরল।

প্রাইজের পুস্তকগুলি ললিত মাতাকে দেখাইতে লাগিল। পাঁচ বৎসরের ভগিনী লাবণ্য আহ্লাদে কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

ললিত বলিল,—"মা! আমি ভাল পড়া বলিতে পারি, সে জন্য এই বইখানি পাইয়াছি; কাহারও সহিত ঝগড়া করি না, একটিও মিথ্যা কথা বলি না, সে জন্য এই বইখানি পাইয়াছি।"

ললিতের মা বলিলেন,—"বাঁচিয়া থাক, বাবা! চিরজীবী হও!"

লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল,—"ইহাতে ছবি আছে, দাদা?"

ললিত উত্তর করিল,—"কেবল একটি গরু ও একটি ঘোড়ার ছবি আছে; ভাল ছবি নাই।"

মাতার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া, ললিত পুনরায় বলিল,—"মা! বইগুলি বাবাকে দেখাইব? কিন্তু মা, ভয় করে। আর সকলের বাবা ছেলেদের আদর করেন, কিন্তু আমাদের বাবা কেবল বকেন কেন,মারেন কেন, মা? কিন্তু মা! যা থাকে কপালে, কেবল আজ আমি তাঁহাকে প্রাইজের বইগুলি দেখাইব।"

ছেলের কথা শুনিয়া ললিতের মা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাতার কান্না দেখিয়া লাবণ্য তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। লাবণ্যও কাঁদিতে লাগিল। হয় তো মন্দ কথা বলিয়াছি, এই মনে করিয়া ললিত অপ্রতিভ হইল।

সন্ধ্যা হইলে পিতা বাটী আসিলেন। রাগত মনে আরক্ত নয়নে তিনি স্বতন্ত্র ঘরে গিয়া বসিলেন। কিছু পরে কাঁপিতে কাঁপিতে ললিত দ্বারের নিকট গিয়া বলিল,—"বাবা! আজ আমি প্রাইজ

পাইয়াছি, এই বইগুলি পাইয়াছি।”

ঘরের ভিতর হইতে কর্কশ বচনে পিতা উত্তর করিলেন,—“যা যা, ছোঁড়া, আমাকে বিরক্ত করিসনে।”

বিষণ্ণ বদনে ললিত ফিরিয়া যাইতেছে, এমন সময় পিতা কি ভাবিয়া পুনরায় বলিলেন,—“কই। কি বই পাইয়াছিস, দেখি?”

ললিত পুস্তক দুইখানি লইয়া পিতার নিকট গেল। পিতা বলিলেন, —“বই এখন এইখানে রাখিয়া যা, পরে দেখিব।”

পুস্তকগুলি পিতার নিকট রাখিয়া ললিত চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে পিতা পুস্তক দুইখানি বাজারে লইয়া বিক্রয় করিলেন। নয় আনা পয়সা হইল। সেই নয় আনা পয়সায় মদ খাইয়া প্রতিদিন যে স্থানে তিনি রাত্রিযাপন করেন, সেই স্থানে গিয়া রাত্রিযাপন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মেয়ের হাতের বালা

ললিতের পিতার কিছু সম্পত্তি ছিল। সে সমুদয় তিনি নষ্ট করিয়াছেন। যে দুই বিষয়ে মানুষ অধঃপাতে যায়, সে দুই বিষয় এখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সংসার চলিবার আর উপায় নাই; কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসামে ভাল কর্ম করেন। বড় ভ্রাতৃবধূকে তিনি মাতার ন্যায় ভক্তি করেন, আর ললিত ও লাবণ্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহ। পাছে ইহাদের কোনরূপ কষ্ট হয়, সে নিমিত্ত তিনি প্রতি মাসে টাকা পাঠাইয়া দেন। যে টাকা পাঠাইয়া দেন তাহাতে সংসার সুখে স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। কিন্তু কর্তাটির দোষে সংসারে নিয়তই কষ্ট।

চারি মাস পূর্বে ভাই কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সংসারের কথা লইয়া দুই ভ্রাতার বাদানুবাদ ও অবশেষে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। নানারূপ বকাবকির পর, কনিষ্ঠ বলিলেন,—“তুমি যাহা জান, তাহা কর। এখন হইতে তোমাকে আর একটি পয়সাও দিব না।”

ললিতের মাতা সেই কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। সুতরাং স্বামী যখন তাঁহাকে বলিলেন যে,—"ভাই আর আমাকে টাকা পাঠায় না," তখন কাজেই তাঁহাকে সে কথায় বিশ্বাস করিতে হইল।

ভাই রাগবশতঃ টাকা বন্ধ করিবার কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত তাহা করেন নাই। তিনি মাসে মাসে টাকা পাঠাইতেছিলেন। স্ত্রীকে লুকাইয়া কর্তাটি সে টাকা লইয়া অপব্যয় করিতেছিলেন। সে নিমিত্ত সেই দিন হইতে সংসারে আরও ঘোরতর কষ্ট হইল।

খিদিরপুরে এক বিধবা স্ত্রীলোকের বাটীতে দুইটি ঘর ভাড়া করিয়া ইহারা বাস করিতেছিলেন। বিধবার এই ভাড়াটিই ছিল দিনযাপনের একমাত্র সম্বল। তিন মাস তিনি ভাড়া পান নাই। সে জন্য অনেক তাগাদা ও অনেক ভৎর্সনা করিয়া অবশেষে বিধবা ইঁহাদিগকে বাটী হইতে উঠিয়া যাইবার নিমিত্ত বার বার বলিতেছিলেন।

এই একখানি যা গহনা ছিল, ললিতের মাতা তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সে টাকাও স্বামী কাড়িয়া লইয়া বাহিরে খরচ করিয়া ফেলিলেন। নিজের যাহা হউক, শিশু দুইটিকে লইয়া ললিতের মাতা বড় বিপদে পড়িলেন। তাহাদের আহারের নিমিত্ত ঘটি-বাটি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। দুই তিনখানি থালা, দুই একটি লোটা ও লাবণ্যের হাতের দুইগাছি ছোট ছোট সোনার বালা, ইহা ভিন্ন ঘরে আর কিছুই রহিল না।

কিন্তু সে দুইগাছি বালাও এক দিন গল। কর্তাটি একদিন মেয়ের হাত হইতে সেই বালা দুইগাছি বলপূর্বক খুলিয়া লইলেন। পাঁচ বৎসরের শিশুকন্যা! মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। পিতার মনে দয়ার লেশমাত্র হইল না। বালা দুইগাছি লইয়া স্বামী চলিয়া গেলে, ললিতের মাতা, ললিত ও লাবণ্য তিনজনে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে ললিত বলিল,—"লাবণ্য, তুমি কাঁদিও না। আমি যখন টাকা আনিতে শিখিব, তখন তোমাকে বড় বড় বালা কিনিয়া দিব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এখন হইতে ভাল হইব

কর্তাটি এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করিয়া বালা লইয়া গেলেন সত্য; কিন্তু তাহার সুখ হইল না। প্রতিদিন যে স্থানে তিনি রাত্রিযাপন করেন, যাহার জন্য তিনি স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে এরূপ নিদারুণ ক্লেশ দেন, বালা বিক্রয়ের টাকা যাহার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছিলেন, দুই চারি দিন পরে সে তাঁহাকে অনেক অপমান করিয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া দিল। ললিতের পিতা শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন।

ক্ষুণ্ণ মনে ললিতের পিতা সন্ধ্যার পর বাটী আসিলেন। নিঃশব্দে আপনার ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন।

পাশের ঘরে শিশু দুইটিকে লইয়া ললিতের মাতা নিদ্রা যাইতেছিলেন। ঘোর রাত্রিতে স্বামীর ঘরে একরূপ শব্দ শুনিয়া সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিয়া স্বামীর ঘরে গিয়া দেখিলেন যে, স্বামী "গোঁ গোঁ,' শব্দ করিতেছেন, তাঁহার মুখ দিয়া ফেনা বাহির হইতেছে, চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ হইয়াছে। কি হইয়াছে, বার বার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবু কোন উত্তর দিলেন না। ললিতের মাতা তখন আর কি করিবেন? সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, টাকা নাই —যে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনিবেন। বাড়ীওয়ালী বিধবাকে ডাকিয়া মাথায় জল দিয়া তাঁহার যথাশক্তি শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকাল হইল। নিকটস্থ একটি ডাক্তারের নিকট গিয়া ললিত অনেক কাঁদিয়া ও মিনতি করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিল। ডাক্তার আসিয়াই বলিলেন যে, "ইনি আফিম খাইয়াছেন; আমি পুলিশে খবর দিই। ইহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইতে হইবে।"

ললিতের পিতার তখন জ্ঞান ছিল। হাঁসপাতালে যাইতে তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। ডাক্তারের নিকট অনেক মিনতি করিয়া পুলিশে সংবাদ-প্রেরণ-বিষয়েও তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। ডাক্তার যথাসাধ্য বাটীতেই তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

সমস্ত দিন গেল। সন্ধ্যার পর তাঁহার শরীর একটু সুস্থ বলিয়া বোধ হইল। রাত্রি নয়টার সময়ে তিনি স্ত্রী ও পুত্র কন্যাকে আপনার নিকট বসাইয়া স্নেহের সহিত বলিতে লাগিলেন,—"দেখ, আমি এতদিন অন্ধ ও পাগল হইয়া ছিলাম; তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।"

ললিতের মাতা বলিলেন,—"নিশ্বাস ফেলিতে তোমার কষ্ট হইতেছে এখন আর অধিক কথা কহিয়া কাজ নাই। সম্পূর্ণরূপে ভাল হইয়া তাহার পর যাহা কিছু বলিবার, তখন বলিবে।"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে ললিতের পিতা উত্তর করিলেন,—"না না! আমি বেশ আছি। আমার শরীরে এখন আর কোন অসুখ নাই। ললিত বাবা! লাবণ্য মা! এস বাবা, এস মা, আমার কাছে এস! ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, তবু কেন চারিদিক্ অন্ধকার হইয়া আসিতেছে? আমি তোমাদিগকে ভালরূপ দেখিতে পাইতেছি না। আমি বড় নিষ্ঠুর, তোমাদিগকে আমি বড় কষ্ট দিয়াছি। কিন্তু এখন হইতে আমি খুব ভাল হইব। এখন হইতে তোমাদিগকে খুব আদর করিব। আমি খুব ভাল হইব; এখন হইতে আমি খুব—"

বাকি কথা আর মুখ দিয়া বাহির হইল না! চক্ষু দুইটি কপালে উঠিল। আর তাঁহার ভাল হইতে হইল না, জনমের মত ললিতের পিতার সব ফুরাইল।

ললিতের মাতা কাঁদিয়া উঠিলেন। মাটীতে পড়িয়া ললিত কাঁদিতে লাগিল। লাবণ্য কাঁদিতে লাগিল।

সে রাত্রিতে আর কিছুই হইল না। পর দিন ঘটি বাটি যাহা কিছু বাকি ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া কর্তার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া নির্বাহিত হইল। সহায় সম্পত্তি হীনা স্ত্রী, শিশুসন্তান দুইটিকে লইয়া যে কি করিবেন, কি খাওয়াইবেন, তাহার কোন উপায় ছিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মা, তুমি না খাইলে আমি খাইব না

মা কথাগুলি বলিয়া দিলেন, ললিত শিশুহাতে কাকাকে পত্র লিখিল,—"খুড়া মহাশয়! পিতার হঠাৎ পরলোক হইয়াছে। আপনি কয় মাস খরচ দেন নাই। তাহাতে ঘরের গহনা-গাঁটী, বাসন-কোষণ যাহা ছিল, সমুদয় বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। মাতার হাতে আর কিছুই নাই। আপনি শীঘ্র আসিয়া আমাদের যাহা হয় বিলি করিবেন। তা না করিলে, অনাহারে আমরা মরিয়া যাইব।"

বাড়ীওয়ালী বলিলেন,—"ললিতের মা! আমি অনাথা বিধবা। ঘর দুইটি ভাড়া দিয়া আমার চলে। তিন মাস ভাড়া পাই নাই। আমি কি করিয়া খাই, তা বল। তুমি বাছা, অন্য স্থানে যাও।"

ললিতের মাতা উত্তর করিলেন,—"দিদি! ললিতের কাকাকে চিঠি লেখা হইয়াছে। চিঠি পাইলেই তিনি আসিবেন। তখন তোমার ভাড়া দিয়া আমরা চলিয়া যাইব। আর দুই দিন অপেক্ষা কর। তা না করিলে, শিশু দুইটিকে লইয়া কোথায় যাই, তা বল? আমার বাপের বাড়ীতে কেহ নাই যে, এক দিন গিয়া দাঁড়াই।"

দুই দিন গেল, তিন দিন গেল। বাড়ীওয়ালী পুনরায় উঠিয়া যাইবার নিমিত্ত উত্তেজনা করিলেন। চারিদিন গেল, পাঁচ দিন গেল, তবুও কাকার কোন সংবাদ নাই। বাড়ীওয়ালী পুনরায় বলিলেন,—"দুই ভাইয়ে তুমুল ঝগড়া হইয়াছিল। তোমার স্বামী তাঁহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তোমার দেবর, বাছা, আসিবেন না; আর তিনি তোমাদের মুখ দেখিবেন না। সে আশা ছাড়িয়া দাও। আমার বাটী হইতে আজই তোমরা উঠিয়া যাও।"

যাহা হউক, আরও দুই দিন কাটিয়া গেল। তবুও কাকার কোনও সংবাদ নাই। সাত দিনের দিন, "আমি তারকেশ্বরে যাই"—এই কথা বলিয়া, ললিতের মাতা ও শিশু দুইটিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া, দ্বারে চাবি দিয়া, বাড়ীওয়ালী কোথায় চলিয়া গেলেন।

শিশু দুইটির হাত ধরিয়া ললিতের মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে রাস্তা দিয়া যাইতে লাগিলেন। কোথায় যে যাইবেন, তাহা কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না। ক্রমে গড়ের মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিভৃত একটি পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে মনে হইল যে, তাঁহার পিতার একজন জ্ঞাতি কলিকাতায় বাস করেন। তাঁহার বাটীতে ললিতের মাতা একবার গিয়াছিলেন। কুলের কুলবধু; পথ-ঘাট জানেন না। অনেক সন্ধান করিয়া, অতি কষ্টে অপরাহ্লে, তাঁহার বাটী আসিয়া ললিতের মাতা দিন কয়েকের নিমিত্ত আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন।

পিতার জ্ঞাতি অতি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বলিলেন,—"তোমাদের এখন অশৌচ অবস্থা। আমার ঘর-দ্বার অধিক নাই। আমাকে ত্রিসন্ধ্যা করিতে হয়, পূজা-অর্চনা করিতে হয়, শুদ্ধাচারে থাকিতে হয়, তাহার উপর আমার স্ত্রীর শুচি-বাই। তোমার ছেলে-পিলে আমার পূজার দ্রব্যাদি সব ছুঁইয়া ফেলিবে। আমার এখানে বাছা স্থান হইবে না।"

নিরাশ হইয়া ললিতের মাতা সন্ধ্যাব সময় গঙ্গার ধারে আসিয়া একটি ঘাটে বসিলেন। তখন পর্য্যন্ত কেহ কিছু আহার করে নাই। লাবণ্য ক্ষুধা ক্ষুধা করিয়া কাঁদিতেছিল। ললিত নীরবে ছল ছল নয়নে চুপ করিয়া ছিল। ললিতের মাতার কেবল চারটি পয়সা ও একটি সিকি ছিল। ললিত গিয়া সেই চাব পয়সার মটর ডাল ও কদলী কিনিয়া আনিল। মটর ডাল ভিজাইয়া মাতা পুত্র-কন্যাকে ভাগ করিয়া দিলেন, নিজের জন্য কিছুই রাখিলেন না। ললিত বলিল,—"না মা! তুমি যদি না খাও, তাহা হইলে আমি খাইব না।" পুত্রের অনুরোধে কাজেই তাঁহাকে খাইতে হইল। বাকি আঁচলে বাঁধিয়া রাখিলেন। শিশু দুইটিকে লইয়া সে রাত্রি মাতা সেই গঙ্গার ঘাটেই রহিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

একবার উঠ বাবা

পর দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া পুনরায় তিন জনে আস্তে আস্তে খিদিরপুরে গমন করিলেন। সে স্থানে গিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, ললিতের কাকা আসেন নাই, তাঁহার নিকট হইতে কোন চিঠিও আসে নাই। নিরাশ হইয়া পুনরায় কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে লাবণ্য ক্ষুধা ক্ষুধা করিয়া বড়ই কাঁদিতে লাগিল। ললিত অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িল। গড়ের মাঠে সেই নিভৃত পুষ্করিণীর ধারে পুনরায় তিন জনে গিয়া বসিলেন। পূর্বদিনের মটর ডালের কিয়দংশ মায়ের আঁচলে বাঁধা ছিল। শিশু দুইটিকে তাহাই খাইতে দিলেন। তাহার পর পুনরায় সেই ঘাটে আসিয়া বসিলেন। লাবণ্য পুনরায় ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিতে লাগিল। মাতার নিকট তখনও একটি সিকি ছিল। সিকিটি ভাঙ্গাইয়া চারি পয়সার কদলী আনিবার নিমিত্ত ললিতকে তিনি দোকানে পাঠাইলেন।

ললিত দোকানে যাইতেছে, এমন সময় দৈবক্রমে তাহার হাত হইতে সিকিটি পড়িয়া গেল। সিকিটি গড়াইয়া একখানি ইটের ধারে গিয়া লাগিল। নিমিষের মধ্যে ইতর লোকের একটি বালক সিকিটি কুড়াইয়া লইল। ললিত তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিল, বালক সিকিটি আপনার মুখের ভিতর পুরিল। ললিত তাহার গলা টিপিয়া ধরিল, বালক সিকিটি গিলিয়া ফেলিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে ললিত মাতার নিকট আসিয়া সকল কথা বলিল। শেষ সম্বল যাহা ছিল, তাহা গেল। মাতা ভাবিলেন,—"আর উপায় নাই। দেবর আসিবেন না। ভগবান আর আমাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবেন না। এখন আমি শিশু দুইটিকে লইয়া করি কি? যাই কোথা?"

ক্ষুধার জ্বালায় লাবণ্য অতিশয় কাঁদিতে লাগিল। সন্ধ্যা হইয়া গেল। মাতা, শিশু দুইটিকে লইয়া পুনরায় খিদিরপুর অভিমুখে

চলিলেন। আর চলিতে পারেন না। গড়ের মাঠের সেই পুষ্করিণীর ধারে পুনরায় গিয়া বসিলেন। দুঃখের আর কূল-কিনারা নাই, অকূল পাথার। ভাবিতে লাগিলেন,—"হায় হায়! আমি কি করি, আমি কোথায় যাই!"

পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাতা একেবারে পাগলিনী হইয়া পড়িলেন। সেই উন্মত্ত অবস্থায় সহসা তিনি বাম হস্তে লাবণ্য ও দক্ষিণ হস্তে ললিতকে ধরিয়া পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দিলেন। 'ঝপ' করিয়া একটি শব্দ হইল, জলে অল্প তরঙ্গ উঠিল, তাহার পর সেই গভীর জল পুনরায় পূর্বরূপ স্থির প্রশান্ত আকার ধারণ করিল।

পরদিন বেলা দশটার সময় শিয়ালদহ হইতে একখানি গাড়ী দ্রুত-বেগে খিদিরপুর অভিমুখে যাইতেছিল। গাড়ীর ভিতর একটি বাবু বসিয়া ছিলেন। "গাড়োয়ন শীঘ্র চল, তোমাকে বক্‌শিস্ দিব," এই কথা বাবু বার বার বলিতেছিলেন। গড়ের মাঠ দিয়া যাইবার সময় বাবু দেখিলেন যে, একটি পুষ্করিণীর ধারে অনেকগুলি লোক একত্র হইয়াছে। কি হইয়াছে তাহা দেখিবার নিমিত্ত, গাড়ী থামাইয়া, বাবু সেই স্থানে গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন যে, জল হইতে পুলিশের লোকে একটি অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক, একটি সাত আট বৎসরের বালক ও একটি পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকার মৃতদেহ উপরে তুলিয়াছে। মৃতদেহ বটে, কিন্তু তিনটির রূপে পুষ্করিণীর পাড় আলো করিয়াছিল। যে দেখিতেছিল, সেই হায় হায় করিতেছিল।

অজ্ঞান পাগলের ন্যায় হইয়া বাবু গিয়া সেই মৃতদেহের উপর পড়িলেন। "ললিত! লাবণ্য! একবার উঠ। একটা কথা কও! আমি তোমাদের কাকা আসিয়াছি। আর তোমাদের ভাবনা নাই, আমি তোমাদের জন্য টাকা আনিয়াছি। উঠ বাবা! উঠ মা! একটা কথা কও।"

ললিত, লাবণ্য ও তাহাদের মাতা আর উঠিলেন না, আর কথা কহিলেন না।

মূল্যবান্ তামাক ও জ্ঞানবান্ সর্প

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

ফরাস্‌ডাঙ্গায় পূর্বে অনেক গুলির আড্ডা ছিল। তাহার সঙ্গে দুই একটি গাঁজার আড্ডাও ছিল। তাহাদিগের মধ্যে জয়গোবিন্দ ভড়ের আড্ডাটি সর্বপ্রধান ছিল। সেই আড্ডায় মাণিক বাবু, নবীন বাবু, হরেন বাবু, গণেশ বাবু প্রভৃতি অনেক বাবু সভ্য ছিলেন। ভড় মহাশয় ইহার আড্ডাধারী ছিলেন।

একদিন তিন ছিলিম মূল্যবান বড় তামাক সেবনের পর, হরেন বাবু যুদ্ধের কথা আরম্ভ করিলেন। মাণিক বাবু জ্ঞানগম্ভীরস্বরে তাহার আলোচনা করিলেন। গণেশ বাবু তাহার উপর টীকা করিলেন। নবীন বাবু কিছু বলিবার জন্য হাঁ করিয়াছেন, এমন সময় আড্ডাধারী মহাশয় তাঁহাকে নিষেধ করিলেন।

আড্ডাধারী বলিলেন,—"হরেন! তোমাদের মুখে কি আর অন্য কথা নাই? যুদ্ধের কথা শুনিয়া শুনিয়া কান ঝালা-পালা ধরিয়া গেল। যদি অন্য গল্প থাকে তো বল, যে শুনি।"

আড্ডাধারীর বিরক্তভাব দেখিয়া হরেন কিছু অপ্রতিভ হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিসের গল্প করিব?'

আড্ডাধারী ভাবিতে লাগিলেন। সেই অবসরে নবীন বাবু বলিলেন,—"শাস্ত্র-প্রসঙ্গ, ভূত-প্রসঙ্গ, ব্যাঘ্র-প্রসঙ্গ এ সভায় অনেক হইয়া গিয়াছে। তাহাতে নূতনত্ব আর কিছু নাই। অদ্যকার সংবাদ-পত্রে দেখিলাম যে, আফ্রিকা মহাদেশে এক প্রকার সর্প আছে। তাহাদের শরীর কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মত স্থূল। তথাপি তাহারা আস্ত হংসডিম্ব গলাধঃকরণ করিতে পারে। সামান্য বাঁশের ন্যায় স্থূল অজগর সর্পও মহিষ প্রভৃতি পশুকে গ্রাস করে। আজ সাপের গল্প হউক না কেন?"

আড্ডাধারী বলিলেন,—"ঠিক বলিয়াছ, নবীন! আমি একখানি নভেল লিখিব মনে করিয়াছি। ভূতের গল্প সংগ্রহ করিয়াছি; বাঘের গল্প সংগ্রহ করিয়াছি। এখন সাপের গল্প পাইলেই আমার পুস্তকখানি পূর্ণ হয়। কেহ যদি ভাল ভাল, অথচ সম্পূর্ণ সত্য, সাপের গল্প জান তো বল দেখি, শুনি, ভাই!"

সকলে চুপ করিয়া রহিলেন। সকলকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মাণিক বলিলেন,—"তোমরা সকলেই দেখিতেছি, সর্প বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সঙ্গে করিয়া আজ আমি এই যে বাবুটিকে আনিয়াছি, ইঁহার নাম তিনু, সম্প্রতি ইনি দেশ হইতে আসিয়াছেন। ইঁহাদের দেশে অনেক প্রকার সাপ আছে। ইনি বোধ হয় সাপের গল্প করিতে পারেন।"

এই কথা শুনিয়া তিনু বাবুকে সম্বোধন করিয়া আড্ডাধারী বলিলেন,—মহাশয়! আপনার সহিত আমার আলাপ-পরিচয় নাই। কিন্তু আপনি যখন মাণিকের বন্ধু, তখন আমারও বন্ধু। অনুগ্রহ করিয়া যদি দুই একটি সাপের গল্প করেন, তাহা হইলে, বড়ই বাধিত হই। যে পুস্তকখানি ছাপাইতে আমি মানস করিতেছি, তাহাতে আপনার নাম দিয়া ছাপাইব। আপনার দেশ কোথায়?"

তিনু বাবু উত্তর করিলেন,—"অতি নিকটে। এক দিন রেলে যাইতে হয়; তাহার পর, দুই দিন জাহাজে যাইতে হয়; তাহার পর তিন দিন হাঁটিয়া যাইতে হয়। আমাদের দেশে রং বেরংয়ের সাপ আছে। সেই সব সাপের গল্প আমি করিতে পারি।"

আড্ডাধারী জিজ্ঞাসা করিলেন;—"নূতন গল্প, না পুরাতন?'

তিনু বাবু উত্তর করিলেন,—"আনকোরা টন্‌টনে টাটকা গল্প।"

আড্ডাধারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সত্য গল্প? না মিথ্যা কল্পিত বানানো গল্প?"

তিনু বাবু উত্তর করিলেন,—"সম্পূর্ণ সত্য গল্প। তামা-তুলসী, গঙ্গাজল হাতে লইয়া বলিতে পারি। যাহা আমার নিজের বাটীতে

ঘটিয়াছে' যাহা নিজে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সেইরূপ গল্প আমি করিব। এই যে সর্প, ইহারা নাগ জাতি। মানুষ অপেক্ষা ইহাদের বুদ্ধি শতগুণ অধিক। ইহাদের বুদ্ধিবিষয়ে আজ আমি দুই তিনটি দৃষ্টান্ত দিব। তবে বলিতে ভয় হয়। একে তো পাষণ্ডগণ আমাকে গাঁ্যাজাখোর বলে। তাহার উপর গল্পগুলি কিছু অদ্ভুত। পাছে আপনারা বিশ্বাস না করেন, সেই ভয়।"

আড্ডাধারী, নবীন, মাণিক প্রভৃতি সকলে এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন,—"না, না, আপনার সে ভয় নাই। আপনি যখন বড় তামাক সেবন করেন, তখন আপনি আমাদের ভাই। আপনার কথা সকলেই আমরা বিশ্বাস করিব।"

এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া, তিনু বাবু বলিলেন,—"আচ্ছা! তবে প্রথমে একটি গল্প করি। মহাশয়গণ একটু প্রণিধান করিয়া শ্রবণ করুন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

বালিকা ও কৃষ্ণসর্প

তিনু বলিতেছেন,—"আমার বাড়ীর নিকট এক পুষ্করিণী আছে। তিন বৎসর বয়স্কা আমার একটি কন্যা আছে। একদিন প্রাতঃকালে বালিকাটি পুষ্করিণীতে পড়িয়া গিয়া হাবু-ডুবু খাইতেছিল। কেহই দেখিতে পায় নাই, আর একটু হলেই জলমগ্ন হইয়া সে মরিয়া যাইত। এমন সময় কোথা হইতে একটি কৃষ্ণসর্প আসিয়া উপস্থিত হইল। বালিকার বিপদ দেখিয়া সাপটি তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিল ও তাহাকে ধরিয়া অবিলম্বে কিনারায় আনিয়া ফেলিল। সাপটি বালিকার প্রাণরক্ষা করিল; কিন্তু যেরূপ বুদ্ধি সহকারে সে এ কার্য সাধন করিল, তাহাই আশ্চর্যের বিষয়।

আড্ডাধারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরূপ বুদ্ধি?"

তিনু বাবু উত্তর করিলেন,—"সাপটি প্রায় দশ হাত লম্বা হইবে। পুষ্করিণীর মাঝখানে যে স্থানে মেয়ে আমার হাবু-ডুবু খাইতেছিল, সাপটি তাড়াতাড়ি প্রথম সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর আপনার শরীরের মধ্যভাগ দিয়া বালিকার গলায় সে দৃঢ়রূপে একটি পাক দিল। সেই পাকে গলা বন্ধ হইয়া বালিকা আর জল গিলিতে পারিল না। সাপটি তখন তাহার মস্তক ও লাঙ্গুল দ্বারা সাঁতার দিতে লাগিল। এইরূপে সন্তরণ করিয়া বালিকাকে ক্রমে সে কিনারায় আনিয়া ফেলিল। এমনি দৃঢ়রূপে সাপ তাহার গলায় পাক দিয়াছিল যে, এক ফোঁটা জলও বালিকার উদরস্থ হইতে পায় নাই। অতি সুবুদ্ধি সাপ। কেমন, গল্পটি ভাল নহে?"

আড্ডাধারী উত্তর করিলেন,—"অতি চমৎকার গল্প। তাহার পর?"

তিনু বলিলেন,—"মেয়েকে কিনারায় রাখিয়া সাপটি আস্তে আস্তে তাহার গলার পাক খুলিয়া দিল। তখন মেয়ে নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিল। নিঃশ্বাস ফেলিয়া মেয়ে ভূমি হইতে উঠিল। তখন সাপটি কুলোপানা চক্র ধরিয়া তাহার সন্মুখে দাঁড়াইল। আমার মেয়ে সেই ফণার উপর স্নেহের সহিত ধীরে ধীরে চাপড়াইয়া তাহাকে অনেক আদর করিল। আহ্লাদে আটখানা হইয়া সাপটি হাসিতে লাগিল। এইরূপে আমোদ-আহ্লাদ করিয়া সে দিন বনে চলিয়া গেল। তাহার পর দিন সকাল বেলা দেখি যে, সেই সাপটি আবার আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত! আমার মেয়ে তখন ধামি করিয়া মুড়ি খাইতেছিল। সুড়-সুড় সুড়-সুড় করিয়া সাপটি তাহার নিকট গিয়া বসিল। চিনিতে পারিয়া ধামি হইতে আমার মেয়ে তাহাকে দুই গাল মুড়ি দিল। কুড়-কুড়-কুড়-কুড় করিয়া সাপ বসিয়া বসিয়া সে মুড়িগুলি খাইল। মুড়িগুলি খাইয়া সে পুনরায় বনে চলিয়া গেল। এইরূপে প্রতিদিন সকাল বেলা আমার মেয়ের কাছে সে মুড়ি খাইতে আসে। বিশ্বাস না করেন, চলুন আমার বাড়ী গিয়া দেখিয়া আসিবেন।"

আড্ডাধারী বলিলেন,—"না না! আপনার বাড়ী অতি নিকটে

বটে ; কিন্তু সেই স্থানে আমাদের যাইতে হইবে না। আপনার কথাই যথেষ্ট। আর আছে ?”

তৃতীয় অধ্যায়

শিশু ও বেঁড়ে

তিনু বলিলেন,—“আছে বৈ কি। আর একটি বলি শুনুন। আট মাসের আমার এক শিশু ছেলে আছে। গৃহিণী কাজকর্মে ব্যস্ত থাকেন। ছেলেটিকে বাড়ীর উঠানে ছাড়িয়া দেন। বাড়ীর প্রাঙ্গণে সে হামাগুড়ি দিয়া বেড়ায়, আর মাঝে মাঝে ষাঁড়ের মত চীৎকার করে। তাহার কান্নার শব্দ শুনিলে গর্ভিণীর গর্ভপাত হয়। কিন্তু এখন আর সে কাঁদে না। দু এক দিন চুপ করিয়া থাকিবার পর, আমরা এক দিন ভাবিলাম যে, ছেলে পূর্ব্বের মত আর কাঁদে না কেন ? মন্-মন্সারে এক দিন আমরা আড়ি পাতিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, ছেলে যেই কান্নার সুর তুলিল, আর নিকটে এক গর্ত্তের ভিতর হইতে একটি সাপ উঁকি মারিয়া দেখিল। তাহার পর সাপটি ক্রমে ক্রমে সেই গর্ত্তের ভিতর হইতে বাহির হইল। চন্দ্রবোড়া কাহাকে বলে তা জানেন তো ? এ সেই চন্দ্রবোড়া সাপ। কিন্তু এ সাপটির একটু বাহার আছে। সাপটির লেজ কিরূপে খসিয়া গিয়াছে। সে জন্য এটি বেঁড়ে বোড়া সাপ। গর্ত্তের ভিতর হইতে বাহির হইয়া ক্রমে শিশুর নিকট আসিয়া সাপটি বসিল। তাহার পর শিশুর মুখপানে চাহিয়া চক্ষু টিপিয়া কি ইশারা করিল। অবশেষে সাপ পিছন ফিরিয়া, আপনার সেই বেঁড়ে লেজটি শিশুর হাতে পুরিয়া দিল।

আড্ডাধারী বলিলেন,—“বটে। তাহার পর ?”

তিনু উত্তর করিলেন,—“বেঁড়ে লেজটি হাতে পাইয়া মায়ের স্তন মনে করিয়া, শিশু সন্তোষের সহিত তাহা চুষিতে লাগিল। আমরা ভাবিলাম,—ওঃ, এই জন্যে ছেলে আর কাঁদে না বটে। এইরূপ প্রতিদিন আসিয়া সাপ আপনার বেঁড়ে লেজটি শিশুর হাতে প্রদান করে। শিশু

তাহা চুষিয়া চুপ করিয়া থাকে, কখন বা লেজটি মুখে করিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে। এইরূপে কিছু দিন যায়, এমন সময় এক দিন দেখি না যে,—ছেলে পুনরায় কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সাপের দেখা নাই। আমরা ভাবিলাম যে, বড়ই বিপদ হইল ; সাপ আসিল না, এখন ছেলে ভুলাই কি করিয়া ? ঘোর চিন্তায় আমরা নিমগ্ন আছি, এমন সময় কোথা হইতে আর একটি কিছু বড় বেঁড়ে বোড়া সাপ হুড়তে পুড়তে ছেলের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সেও সেইরূপ চক্ষু টিপিয়া ছেলেকে প্রথমে ইশারা করিল ; তাহার পর আপনার বেঁড়ে লেজটি তাহার হাতে গুঁজিয়া দিল। লেজটি মুখে দিয়া ছেলে চুপ করিল। এই নূতন সাপটি এইরূপে সাত দিন ছেলের নিকট আনাগোনা করিল। তাহার পর সেই পুরাতন সাপটি পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা দেখিলাম, পুরাতন সাপটি কিছু রোগা হইয়া গিয়াছে। তাহা দেখিয়া ভাবিলাম,—ওঃ, আর কিছু নয়, পুরাতন সাপটির জ্বর হইয়াছিল তাই নূতন সাপকে এই কয় দিনের নিমিত্ত আপনার একৃটিনী করিতে সে পাঠাইয়া দিয়াছিল। চট করিয়া আপনার মত আর একটি বেঁড়ে সাপ সে খুজিয়া পায় নাই। পাঠাইতে তাই একটু বিলম্ব হইয়াছিল। কেমন মহাশয়, এ গল্পটি কেমন ?"

আড্ডাধারী বলিলেন,—"অতি চমৎকার!"

তিনু বলিলেন,—"ছেলেটির নাম আমরা সুরেন্দ্র রাখিয়াছি। তাহার নামটি ছাপাইবেন। তাহা হইলে তাহার গর্ভধারিণীর মনে খুব আনন্দ হইবে। আর শিশুদের সরল হৃদয়,—কাল-সর্পকেও তাহাদের বিশ্বাস ; এইরূপ নানাপ্রকার অলঙ্কার দিবেন। আর 'সাপিনী তাপিনী-তাপে বিবরে লুকায়'—এইরূপ ছড়াও তাহার ভিতর দুই একটি দিবেন।"

আড্ডাধারী বলিলেন,—"ছড়ায় আবশ্যক নাই, গল্পটি অতি চমৎকার। তাহাই যথেষ্ঠ। আর আছে ?"

৵

চতুর্থ অধ্যায়

গরুর দড়ি

তিনু উত্তর করিলেন,—"আছে বই কি। আর একটি গল্প বলি, তবে শুনুন। দাঁড়াশ সাপ কারে বলে তা জানেন? আমাদের বাড়ির কাছে প্রকাণ্ড এক দাঁড়াশ সাপ ছিল। বিশ হাতের কম নয়। জাহাজি দড়া বলিলেও চলে। প্রতিদিন রাত্রিতে গোয়ালে আমার গরু বাঁধা থাকে; তাহার একটু দূরে বাছুরটি বাঁধা থাকে। এক দিন রাত্রিতে কি করিয়া গরুর দড়িটি ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। আর একটু হইলেই সমস্ত দুধটুকু বাছুরে খাইয়া ফেলিত। ভাগ্যে, সেই সময় নিকটে সেই পাড়ার দাঁড়াশ সাপটি ছিল। দাঁড়াশ সাপ যেই দেখিল যে, গরুর দড়ি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, গরু ছুটিয়া বাছুরের নিকটে যাইতেছে, আর দুধ খাইবার জন্য বাছুর লাফালাফি করিতেছে, তখন সাপটি আপনার মাথার দিক্ দিয়া গরুর গলায় একটি বেড় দিল, আর লেজটি খোঁটায় জড়াইয়া গরুকে আটক করিয়া রাখিল। এইরূপে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। গরু কত টানাটানি করিল, কিন্তু সাপ কিছুতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিল না। প্রাতঃকালে উঠিয়া আমরা গরু ও সাপকে এই অবস্থায় দেখিলাম। সাপের সঙ্গে ঘরকন্না করিয়া আমাদের ভরসা হইয়াছিল। সে জন্য গোয়ালের ভিতর গরুর গলায় সাপ দেখিয়া আমাদের কিছুমাত্র ভয় হইল না। ছেঁড়া দড়িতে গিরা দিয়া আমরা গরুকে বন্ধন করিলাম। সাপ তখন ছাড়িয়া বনে চলিয়া গেল। গাভী দোহন হইলে, আমি মনে করিতেছি যে, এইবার যাই, গরুর জন্য একগাছি নূতন দড়ি কিনিয়া আনি। এমন সময়ে দেখি না যে, সেই সাপটি পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এবার সে একেলা আসে নাই, আপনার স্ত্রী, দাঁড়াশনীকেও সঙ্গে আনিয়াছিল! আমার মনের ভাব বুঝিয়া দুই জনেই ঘাড় নাড়িতে লাগিল। সাপে কথা কহিতে পারে না, তাই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'দড়ি কিনিবার জন্য তোমাকে আর পয়সা খরচ করিতে হইবে না।' এখন

হইতে আমরা দুই জনে দড়ির কাজ করিব।'

এই বলিয়া একটি সাপ পূর্ববৎ মস্তকের দিক্ দিয়া গরুর গলায় ও লেজের দিক্ দিয়া খোঁটাতে ফের দিয়া রহিল। তখন আমি ছেঁড়া দড়ি গাছটি গরুর গলা হইতে খুলিয়া লইলাম। পালা করিয়া পাখিতে যেরূপ ডিমে তা দেয়, সেইরূপ দাঁড়াশ ও দাঁড়াশনী এখন পালা করিয়া আমার গরু বাঁধিয়া রাখে। আমাকে আর দড়ি কিনিতে হয় না। তবে প্রতিদিন সাপ দুইটিকে খাইবার নিমিত্ত একটু একটু দুগ্ধ প্রদান করিতে হয়। হয় না হয়, আমার বাড়ি গিয়া দেখিয়া আসুন।"

আড্ডাধারী বলিলেন,—"না না, আপনার বাড়ি আমাকে যাইতে হইবে না। আপনি কি আর মিথ্যা বলিতেছেন। আর আছে?"

পঞ্চম অধ্যায়

চুল বাঁধা ফিতা

তিনু উত্তর করিলেন,—"আজ আর অধিক বলিব না। আর একটি বলি, শ্রবণ করুন। আমার বড় মেয়েটি যখন দশ বৎসরের, তখন এক দিন তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমি রথ দেখিতে যাইতেছিলাম। মেয়েটির চুল বড় দীর্ঘ ছিল না, কেবল কাঁধের উপর পড়িত। গৃহিণী তাহার সাজগোজ করিয়া চুলগুলি একটি সবুজ ফিতা দিয়া বাঁধিয়া দিয়াছেন যাইতে যাইতে একটি আমবাগানের নীচে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এমন সময় মেয়ের মাথা হইতে ফিতাটি খুলিয়া বাতাসে কোথায় উড়িয়া গেল। আর খুঁজিয়া পাইলাম না। মেয়ের চুল এলোথেলো হইয়া পড়িল। দুই হাত মাথায় দিয়া মেয়ে আমার কাঁদিতে লাগিল। এই স্থানে একটি আঁব-ডাল ঝুলিয়া ছিল। লাউ-ডগা সাপ জানেন? সেই সুন্দর উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের সরু সাপ? যাহারা গাছের পাতার সঙ্গে মিশিয়া থাকে? সেই স্থানে সেই আঁব-ডালে পাতার ভিতর লাউ-ডগা সাপের একটি ছানা ছিল! মেয়ের কান্না শুনিয়া সাপের ছানাটি ডাল হইতে তড়াক্ করিয়া মেয়ের কাঁধের উপর পড়িল। তাহার পর মস্তকের

উপর উঠিয়া প্রথম মুখ ও লেজ দিয়া চুলগুলি পরিষ্কার ও সমান করিল। অবশেষে চারিদিকে ফের দিয়া চুলগুলি বাঁধিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু হায়! ছানা সাপ! বেড় দিতে কুলান হইল না। সে-নিমিত্ত বিরস বদনে সে পুনরায় গাছের ডালে গিয়া উঠিল। ডালে উঠিয়া ঘাড় নাড়িল। ঘাড় নাড়িয়া যেন সে বলিল,—"আমি ছানা-সাপ, আমি ছোট, সে জন্য আমার দ্বারা এ কাজ হইল না, ইহাতে আমার দোষ নাই।"

আড্ডাধারী বলিলেন,—"তাহার পর?"

তিনু বলিলেন,—"তখন আমরা আর কি করি! মেয়ের চুল বাঁধা হইল না। সেই আলুথালু চুলে মেয়েকে সঙ্গে লইয়া চলিলাম। প্রায় তুই শত হাত আগে গিয়াছি, তখনও সে আঁব-বাগান পার হই নাই, এমন সময়ে দেখি না, আর একটি আঁবগাছের ডাল হইতে একটি বড় লাউ-ডগা সাপ সহসা লাফ দিয়া টপ করিয়া মেয়ের মাথার উপর পড়িল। গাছ পানে চাহিয়া দেখি যে, সে ছানা সাপটিও ডালে বসিয়া আছে। তুইটি সাপে অতি দ্রুতবেগে দৌড়িয়া আসিয়া থাকিবে। কারণ, তুই জনেরই ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছিল, তুই জনেই গলদ্ঘর্ম হইয়া গিয়াছিল। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, ছানা সাপটি নিজে চুল বাঁধিতে না পারিয়া, তাহার মাকে তাড়াতাড়ি ডাকিয়া আনিয়াছে। ডালে ছানা ও আমার মেয়ের মাথায় তাহার মা। তুই জনে চক্ষুঠারে প্রথম যেন কি বলাবলি করিল। তাহার পর বড় সাপটি মেয়ের চুলগুলির গোড়ায়, যে স্থানে ফিতা ছিল, সেই স্থানে আপনার শরীরটি জড়াইল। অবশেষে মাথার ঠিক মাঝখানে, যে স্থানে ফিতার ফাঁস থাকে, সেই স্থানে আপনার মুখটি রাখিল। তাহার পর মুখের ভিতর আপনার লেজ প্রবিষ্ট করাইয়া সাপটি নিদ্রা গেল। তাহার মুখ ও লেজ সংলগ্ন হইয়া চমৎকার ফুল-কাটা ফাঁসের মত হইল ও সাপটিকে অতি সুন্দর রেশমী সবুজ ফিতার ন্যায় দেখাইতে লাগিল। রথ দেখা হইলে, বাটী প্রত্যাগমন করিয়া সাপটিকে আমরা উঠানে লাউ-মাচায় ছাড়িয়া দিলাম। প্রতি দিন বৈকাল বেলা মেয়ের চুল বাঁধিবার

সময়, সে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাকে ডাকিতে হয় না। আমার গৃহিণী সাপটিকে লইয়া মেয়ের চুল বাঁধিয়া দেন। হয় না হয়, চলুন, এখনি আমার দেশে চলুন, স্বচক্ষে সাপটিকে দেখিয়া আসিবেন।”

আড্ডাধারী বলিলেন,—“আর আছে ?”

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাকা মুহুরী

তিনু উত্তর করিলেন,—“আরও ? আমার গৃহিণী অনেক জানেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আপনাকে আরও অনেক সাপের কথা বলিব। আপাততঃ কেবল আর একটি বলিয়া শেষ করি। আমার আট বৎসরের একটি বালক আছে। স্কুলে সে পড়িতে যায়। বাড়ি আসিয়া যোগ করিবার নিমিত্ত মাষ্টার তাহাকে এক তেরিজ দিয়াছিলেন। শ্লেটে লিখিয়া অঙ্কটি ছেলে ঘরে আনিয়াছিল। বালক অনেক চেষ্টা করিল ; কিন্তু অঙ্কটি বড় ছিল, কিছুতেই সে ঠিক দিতে পারিল না। হতাশ হইয়া বিরসবদনে শ্লেটের পানে চাহিয়া ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার কাঁধের উপর বসিয়া একটি সাপ মুখ বাড়াইল। তাহার পর সাপটি আরও অগ্রসর হইয়া পেন্সিল সহিত তাহার দক্ষিণ হস্তে অনেক-গুলি পাক দিয়া জড়াইয়া ধরিল। এইরূপে বালকের হাঁত ধরিয়া শ্লেটের উপর তাহাকে লিখাইতে লাগিল। মুহূর্তমধ্যে বিনা ভুলে যোগটি সমাপ্ত করাইল। তাহার পর দিন আমরা সকলে মিলিয়া বালককে ত্রৈরাশিক প্রভৃতি আরও নানারূপ কঠিন কঠিন অঙ্ক দিলাম। বালক যোগও ভাল করিয়া শিক্ষা করে নাই। কিন্তু সেই সর্পের সহায়তায় মুহূর্তের মধ্যে সমুদয় অঙ্কগুলি সে কষিয়া ফেলিল। সেই অবধি মুহুরি-গিরি করিবার নিমিত্ত সাপটিকে আমরা পুষিয়া রাখিয়াছি। সংসার খরচের হিসাব, গয়লার সহিত দুধের হিসাব, ধোপার সহিত কাপড়ের হিসাব, আমাদের সামান্য একটু পৈতৃক সম্পত্তির হিসাব,—কড়ায় গণ্ডায় সমুদয় হিসাব সেই সাপটি রাখে। জমিদারী সেরেস্তায় হিসাবের

গোলমাল হইলে, সাপটিকে ভাড়া দিয়া আমরা মাঝে মাঝে বিলক্ষণ দু'পয়সা উপার্জন করি। তাহাকে আমায় মাহিনা দিতে হয় না, খাইতে দিতেও হয় না। সাপটি বনে চরিয়া আসে। তবে ভাল ব্যাঙ পাইলে, সমাদর করিয়া কখন কখন তাহাকে আমরা নিমন্ত্রণ করি।"

আড্ডাধারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার বাড়িতে যে মুহুরিগিরি করে, এ কোন জাতীয় সাপ? এ সাপের নাম কি?"

তিনু উত্তর করিলেন,—"ইহার নাম শঙ্খচূড়। হিসাবপত্রে এ জাতীয় সাপ সাক্ষাৎ শুভঙ্কর।"

তিনু বাবুর গল্পে সকলেই ঘোরতর বিস্মিত হইলেন। সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

সে-কালের মোহর

প্রথম অধ্যায়

বালিকা

কলিকাতা সহর। গলির পথ। সন্ধ্যার সময়। ঘোর অন্ধকার। বর্ষাকাল। টিপ-টিপ করিয়া জল পড়িতেছে। গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হন্ হন্ করিয়া যাইতেছেন। গিরিশচন্দ্র এক জন নব্য-যুবক। শান্ত সুশীল সভ্যভব্য নব্য-যুবক। গিরিশচন্দ্রের বয়ঃক্রম প্রায় কুড়ি বৎসর হইবে। শ্যাম বর্ণ; মুখে দুই চারিটা ব্রণের দাগ আছে। গোঁপ-দাড়ির রেখা দেখা দিয়াছে। গিরিশচন্দ্র মাঝারি গোছের মানুষ; দীর্ঘও নহেন, খর্বও নহেন, স্থূলও নহেন, কৃশও নহেন। তাঁহাকে দেখিলে বলবান্ ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয় না, বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলের সঙ্কুচিত গঠনটি দেখিলে ভবিষ্যতের লক্ষণ ভাল বলিয়া বোধ হয় না।

গিরিশচন্দ্রের গায়ে কামিজ আছে। কুঞ্চিত পাকানো চাদরখানি তাঁহার বক্ষঃস্থলের দুই দিকে লম্বমান রহিয়াছে। সেই অন্ধকারে ছাতি মাথায় দিয়া গিরিশচন্দ্র হন্ হন্ করিয়া চলিতেছেন। সে গলির রাস্তায়

সে সময় কেবল দুই একটি লোক যাতায়াত করিতেছিল। গিরিশ দেখিলেন যে, এক জন শুভ্রবস্ত্র-পরিধারী ব্যক্তি বিপরীত দিক্ হইতে তাঁহার দিকে দ্রুত বেগে আসিতেছে। এক পার্শ্বে কতকগুলি খোয়া জমা করা ছিল। সহসা সেই খোয়ার উপর সেই ব্যক্তি পতিত হইল। গিরিশ তাড়াতাড়ি গিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন। কিছুদূরে অবস্থিত রাস্তার লণ্ঠনের ঈষৎ আলোকে দেখিলেন যে, ব্যক্তি একটি বালিকা। বালিকার বয়স দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বৎসর হইবে। মুখশ্রী ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাহাকে ভদ্রবংশীয় কন্যা বলিয়া বোধ হইল।

গিরিশ তাহার হাত ধরিয়া তুলিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাকে কি বড় আঘাত লাগিয়াছে?"

বালিকা অধোমুখে উত্তর করিল,—"আজ্ঞা না, আমাকে অধিক লাগে নাই।"

গিরিশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেখিতেছি, তুমি ভদ্রলোকের কন্যা। এ অন্ধকারে রাত্রিতে একাকিনী তুমি কোথায় যাইতেছ? নিকটে কোন লোকের বাটীতে যাইবে?"

বালিকা ছল্ ছল্ চক্ষে মৃদুস্বরে উত্তর করিল,—"আমার পিতা সহসা অতিশয় পীড়িত হইয়াছেন। আমাদের কেহ নাই। সে নিমিত্ত আমি ডাক্তার ডাকিতে দৌড়িয়া যাইতেছি। আমার পিতা ডাক্তারখানায় কর্ম করেন। সেই ডাক্তারখানায় যাইতেছি। সে ডাক্তারখানা এ স্থান হইতে কিছু দূরে।"

বালিকার মৃদু-মধুর স্বর গিরিশের মন হরণ করিল। এরূপ ভাব —কখন কাহাকেও দেখিয়া কি কাহারও কথা শুনিয়া তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। গিরিশ মনে মনে ভাবিলেন যে, এই বালিকার জন্য আমি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করিতে পারি।

গিরিশ বলিলেন,—"আমি ডাক্তারি শিক্ষা করিতেছি। অল্প দিনের মধ্যেই বোধ হয় ডাক্তার হইব। চল, তোমার পিতাকে গিয়া দেখি। আমি যদি কোন প্রতিকার করিতে পারি, তো ভালই; তাহা না হইলে, আমাকে ঠিকানা বলিয়া দিও, আমি ডাক্তার আনিয়া দিব। এ রাত্রিতে,

এ অন্ধকারে, এ বৃষ্টিতে তোমায় যাইতে হইবে না।”

বালিকা সে কথায় সম্মত হইল। বালিকা আগে আগে যাইতে লাগিল। গিরিশ তাহার পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাধব চক্রবর্তী

বালিকা আগে আগে চলিল; গিরিশ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া তাঁহারা আরও একটি সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় অপরিষ্কার গলিতে প্রবেশ করিলেন। সেই গলির ভিতর একটি একতলা বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বালিকা দ্বারে ঘা মারিল। ভিতর হইতে এক জন বয়স্কা স্ত্রীলোক আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। বালিকা তাঁহাকে মৃদুস্বরে বলিলেন,—“সে ডাক্তার হয় নাই, অন্য ডাক্তার আনিয়াছি।”

গিরিশ তাঁহাদের সঙ্গে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলেন। বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়াই বাম দিকে সামান্য একটা বৈঠকখানা দেখিলেন। সে ঘরে কেহ নাই; সব অন্ধকার। বৈঠকখানার পর সামান্য একটু প্রাঙ্গণ। তাহার পর, ভিতর-বাটী। ভিতর-বাটীতে দুইটি ছোট একতলা ঘর। ঘরের অবস্থা, জিনিসপত্রের অভাব, স্ত্রীলোক দুইটির অলঙ্কারশূন্য দেহ, মলিন বস্ত্র, এই সমুদয় দেখিয়া গিরিশ মনে করিলেন যে, ইহারা নিতান্ত দরিদ্র। যে ঘরে মিট্-মিট্ করিয়া একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল, সকলে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘরের একপার্শ্বে একখানি তক্তপোশ ছিল। সেই তক্তপোশে একজন কৃষ্ণকায় পুরুষ শয়ন করিয়া ছিলেন। তাঁহার শরীর কৃশ ও রুগ্ন বলিয়া বোধ হইল। বয়ঃক্রম পঞ্চাশের অধিক হইবে। গলায় যজ্ঞোপবীত, তাহাতে গিরিশ বুঝিলেন যে, ইহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ। গিরিশ আরও বুঝিলেন যে, বয়স্কা স্ত্রীলোকটি তাঁহার গৃহিণী ও বালিকা তাঁহার কন্যা। কিন্তু তাহাকে সেই কৃষ্ণকায় ব্যক্তির কন্যা বলিয়া বোধ হয় না। চমৎকার

আহা-মরি রূপ না হউক, বালিকা সুন্দরী বটে ;—মাজা-মাজা রং, বড় বড় চক্ষু, বক্র ভ্রূযুগল, পূর্ণ গণ্ডদেশ, গোল গোল গড়ন, মেঘরাশির ন্যায় কেশ, তাহার উপর একটু মৃদু-মধুর ভাব। সেই মৃদু-মধুর ভাবে মন আকর্ষণ করে.। সেই মৃদু-মধুর ভাবে মস্তক অবনত করিয়া, বালিকা যখন দুই একটি কথা বলে, তখন সতৃষ্ণ নয়নে সকলকেই তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিতে হয়, তাহার সেই কমলমুখনির্গত পীযূষময় কথা আরও দুই একটি শুনিতে ইচ্ছা হয়। সামান্য সেই প্রদীপের আলোকে বালিকার মুখশ্রী দেখিয়া গিরিশের মন মোহিত হইল। বালিকার বয়স বুঝি দ্বাদশ উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ব্রাহ্মণী আধ ঘোমটা দিয়া স্বামীর পদতলে তক্তপোশের এক কোণে বসিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার চক্ষু দিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়িতেছিল। মাঝে মাঝে আঁচল দিয়া তিনি সেই জল মুছিতে ছিলেন। বালিকা পিতার নিকট অগ্রসর হইয়া বলিল,—"বাবা! পথে বড় অন্ধকার; বৃষ্টি পড়িতেছে। এক স্থানে আমি পড়িয়া গিয়াছিলাম। ইনি আমাকে ধরিয়া তুলিয়াছিলেন। ইনি ডাক্তার। সে জন্য, তোমার ডাক্তারখানা পর্যন্ত আর যাই নাই। ইঁহাকে আনিয়াছি।"

ইঁহারা ব্রাহ্মণ; তাহা দেখিয়া গিরিশের মনে প্রথম কতকটা আনন্দ-সঞ্চার হইয়াছিল। তাহার পর, কন্যার এখনও বিবাহ হয় নাই, এই কথা শুনিয়া গিরিশের মন আরও প্রফুল্ল হইল। গিরিশ মনে মনে ভাবিলেন, যে, আজ রাত্রির এই ঘটনাতে বিধাতার কোনরূপ অভিপ্রায় আছে। তা না হইলে, পথে প্রথম এই অপরিচিতা বালিকার কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিবে কেন? তাহার পর, আলোকে ইহার মুখশ্রী দেখিয়া আমার মন এত চঞ্চল হইবে কেন? বালিকা যেন কত দিনের পরিচিতা, এ যেন আমার, এইরূপ ভাব আমার মনে উদয় হইবে কেন? দেখা যাউক,—বিধাতা কিরূপ ভবিতব্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

গিরিশ মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণী পুনরায় বলিলেন,—"কেন বাবা! চুপ করিয়া রহিলে যে? তবে কি কোন

বিপদের সম্ভাবনা আছে ? তবে কি ইনি এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন না ?”

গিরিশ চমকিত হইয়া তাড়াতাড়ি উত্তর করিলেন,—“না মা ! কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। আপনি যখন আমাকে ছেলে বলিলেন, তখন আমিও আপনাকে মা বলিয়া ডাকি। কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু একটু ঔষধ সেবন করিতে হইবে। আমি ঔষধ লিখিয়া দিতেছি, সেই ঔষধ সেবন করিলে রাত্রিতে ভালরূপ নিদ্রা হইবে, আর কাল ইনি ভাল হইয়া যাইবেন। ইহাকে প্রকৃত রক্তবমন বলে না। ইহাতে কোন ভয় নাই।”

ব্রাহ্মণী বলিলেন,—“এত রাত্রিতে ঔষধ আনিতে যায় কে ? তার পর—” ব্রাহ্মণী সহসা চুপ করিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—“তাহার পর ঔষধের দাম কোথা হইতে আসিবে ? আমি যে ডাক্তারখানায় কাজ করি, সে ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ আনিতে পারিলে দাম লাগে না। কিন্তু এত রাত্রিতে সে স্থানে যায় কে ? তখন প্রাণের দায়ে মেয়েকে পাঠাইয়াছিলাম। এত রাত্রিতে পুনরায় আর কন্যাকে পাঠাইতে পারি না।”

গিরিশ উত্তর করিলেন,—“সে জন্য কোন ভাবনা নাই। কোন্ ডাক্তারখানা আমাকে বলিয়া দিন, আমি এইক্ষণে গিয়া ঔষধ আনিয়া দিতেছি।”

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—“গোপীমোহন রায়ের ডাক্তারখানা। তোমাদের মুহুরি মাধব চক্রবর্তীর পীড়া হইয়াছে এই কথা বলিয়া ঔষধ চাহিলেই, তাহারা তৎক্ষণাৎ দিবে।”

গিরিশ একটু কাগজ লইয়া যথাপ্রয়োজন ঔষধ লিখিলেন। তাহার পর নিজেই ঔষধ আনিতে গেলেন।

গোপীমোহন রায়ের ডাক্তারখানা কিছু দূর। যথাসময়ে গিরিশ সেই বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাটীতে প্রবেশ করিয়া গিরিশ দেখিলেন যে, বাম দিকে একটি বড় ঘর ; দক্ষিণ দিকেও সেইরূপ একটি বড় ঘর। সম্মুখে প্রাঙ্গণ ; প্রাঙ্গণের পরে পূজার দালান। পূজার দালানের পশ্চাতে অন্তঃপুর। সদর দরজায় গ্যাস জ্বলিতেছিল। বাম

দিকের বড় ঘরখানিতে ডাক্তারখানা,—নানারূপ ঔষধের বোতলে ও নানারূপ যন্ত্রে সুসজ্জিত। বাম দিকের সেই বড় ঘরের পার্শ্বে একটি ছোট ঘর। সেই ঘরে কম্পাউণ্ডার ঔষধ প্রস্তুত করে। দক্ষিণ দিকের বড় ঘরখানিতে ঔষধাদি কোনরূপ দ্রব্য ছিল না। ঘরের মধ্যস্থলে একটি টেবিল ছিল; তাহার পার্শ্বে তিনখানি চৌকি ছিল। ঘরের তিনদিকে দেয়ালের নিকট এক একখানি বেঞ্চি ছিল। সেই ঘরে বসিয়া গোপীমোহন ডাক্তার প্রাতঃকালে আগত রোগীদিগের নিমিত্ত ব্যবস্থা করেন। যেমন বাম দিকের বড় ঘরের পার্শ্বে এক ছোট ঘর, দক্ষিণ দিকেও সেইরূপ একটি ছোট ঘর। এই ছোট ঘরের দ্বার তখন বন্ধ ছিল। এ ঘরে কি আছে না আছে, গিরিশ তাহা দেখিতে পাইলেন না। গিরিশ দেখিলেন যে, পূজার দালানে অনেকগুলি বড় বড় কাঠের বাক্স আছে। বিলাত হইতে যাহাতে ঔষধ আমদানি হয়, সেই বাক্স।

বাম দিকে ডাক্তারখানায় প্রবেশ করিয়া, গিরিশ কম্পাউডারের নিকট ঔষধ প্রার্থনা করিলেন। গিরিশ বলিলেন,—"আপনাদের মুহুরি মাধব চক্রবর্তী মহাশয়ের অসুখ হইয়াছে; তিনি আমাকে এই ঔষধ লইতে পাঠাইয়াছেন।"

কম্পাউণ্ডার গিরিশকে দক্ষিণ দিকের ঘরে বসিতে বলিল;—যে ঘরে টেবিল, চেয়ার ও বেঞ্চি ছিল, গিরিশ সেই ঘরে বসিলেন। তাহার পার্শ্বে যে ছোট কুঠরি ছিল, তাহা তখন তালা দ্বারা বন্ধ ছিল।

কম্পাউণ্ডার ঔষধ প্রস্তুত করিয়া গিরিশকে দিল। গিরিশ প্রত্যাগমন করিয়া, ঔষধ মাধব চক্রবর্তী মহাশয়কে প্রদান করিলেন; আর বলিলেন,—"প্রাতঃকালে আমায় কলেজে যাইতে হইবে। এগারটার সময় ছুটি পাইব। সেই সময় আসিয়া আপনি কেমন থাকেন, তাহা দেখিয়া যাইব।"

তৃতীয় অধ্যায়

মোহর চুরি !

গিরিশ আপনার বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। সে রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইল না। সেই বালিকার মুখখানি কেবল তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল। বালিকা অবিবাহিতা, নাম সরলা, মাধব চক্রবর্তীর কন্যা। গিরিশ কুপাত্র নহেন। তবে কেনই বা বিবাহ হইবে না? এইরূপ কত চিন্তা গিরিশের মনে উদয় হইতে লাগিল। তাহার পর, গিরিশ নিজের অবস্থা ভাবিয়া দেখিলেন। বালিকার পিতা-মাতা বিবাহ দিতে সম্মত হইলেও এ অবস্থায় কি করিয়া তিনি পরিবার প্রতিপালন করিবেন? গিরিশের নিবাস কৃষ্ণনগর জেলায় সামান্য একখানি গ্রামে। তাঁহার মাতার অনেকদিন পরলোক হইয়াছে। অভিভাবকের মধ্যে একমাত্র পিতা ছিলেন। পল্লীগ্রামে ডাক্তারি করিয়া তিনি গিরিশের খরচ যোগাইতেন। এক বৎসর গত হইল, পিতার কাল হইয়াছে। গিরিশ তখন চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। গ্রামে গিয়া যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, সমুদয় বিক্রয় করিয়া তিন শত টাকা হইল। ডাক্তারি পাশের তখনও দুই বৎসর বাকি ছিল। গিরিশ মনে করিলেন, এই তিন শত টাকা সম্বল করিয়া কোনরূপে আমি ডাক্তারি পাশ দিব। কলিকাতা আসিয়া সেই তিন শত টাকা এক স্থানে জমা রাখিলেন। মনে করিলেন, নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে এ তিন শত টাকায় হাত দিব না। সন্ধ্যার সময় এক ধনবান ব্যক্তির দুইটি পুত্রকে পড়াইয়া যাহা পাইতেন, তাহাতেই বাসা ও কলেজের খরচ নির্বাহ করিতেন। গিরিশ ভাবিলেন,—"এ অবস্থায় আমার বিবাহ করা কিছুতেই উচিত নহে। আমার ডাক্তারি পাশ হইবার এক বৎসর বাকি আছে। যদি চক্রবর্তী মহাশয় অপেক্ষা করেন, আর যদি পাশ হইতে পারি, তাহা হইলে দেখা যাইবে।"

এইরূপ নানা প্রকার চিন্তায় গিরিশ রাত্রিযাপন করিলেন।

কলেজের ছুটী হইলে, পর দিন এগারটার সময় গিরিশ,—মাধব চক্রবর্তীকে দেখিতে গেলেন। দেখিলেন যে, তিনি ভাল আছেন; কিন্তু অতিশয় দুর্বল।

মাধব চক্রবর্তী বলিলেন,—"এই অবস্থায় আমাকে ডাক্তারখানায় যাইতে হইয়াছিল। আমার মনিব গোপীবাবু আমাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিলেন। ডাক্তারখানায় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছে। গোপীবাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই দক্ষিণ দিকে যে বড় ঘরখানি আছে, যে ঘরে বসিয়া প্রাতঃকালে তিনি বাহিরের রোগীদিগের নিমিত্ত ব্যবস্থা করেন, সেই ঘরের পাশে একটি ছোট কুঠরি আছে। সেই কুঠরিতে একটি দেরাজ আছে; দেরাজে অনেকগুলি ছোট ছোট টানা আছে। সেকালের মোহর ক্রয় করা গোপীবাবুর শখ। মাঝে মাঝে এক একটি মোহর কিনিয়া কাগজ নির্মিত একটি সাবানের বাক্সর ভিতর ফেলিয়া তিনি দেরাজের টানার ভিতর রাখিয়া দেন। ক্রমে ক্রমে পঞ্চাশটি মোহর হইয়াছিল। এ কথা কিন্তু জনপ্রাণী কেহই জানিত না। দেরাজের টানার চাবি, সে কুঠরির চাবি, গোপীবাবু আপনার কাছে রাখিতেন, কাহারও হাতে কখনও দিতেন না। আজ প্রাতঃকালে গোপীবাবু নিজে দাঁড়াইয়া সেই ঘরের দেরাজ আলমারি প্রভৃতি স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি মোহরগুলি গণিয়া দেখিতেন। জিনিসপত্র স্থানান্তরিত হইলে আজও যথারীতি মোহরগুলি গণিয়া দেখিতে গেলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য কথা এই যে, সেখানে মোহর একটিও দেখিতে পাইলেন না। দেরাজের টানার ভিতর সে সাবানের বাক্সও নাই, সে মোহরও নাই। চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। গোপীবাবু বলেন যে, দুই দিন পূর্বে তিনি মোহর গণিয়া দেখিয়াছিলেন। এই দুই দিনের ভিতর কেহ তাহা চুরি করিয়াছে। এই দুই দিনের ভিতর কে সে কুঠরির ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, অথবা কুঠরির নিকট বড় ঘরে একাকী কে ছিল, সেই বিষয়ের অনুসন্ধান হইতেছে।"

গিরিশ বলিলেন,—"আমি কাল রাত্রিতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেই

বড় ঘরে একাকী বসিয়াছিলাম। পাশের কুঠরিও দেখিয়াছিলাম। তখন তাহাতে তালা বন্ধ ছিল।”

মাধব চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—“হাঁ, তোমারও কথা উঠিয়াছিল। গোপীবাবু তোমার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য কথা এই যে, আজ প্রাতঃকালে কুঠরির তালা যেমন বন্ধ সেইরূপ বন্ধ ছিল। দেরাজের চাবিও বন্ধ ছিল। সে নিমিত্ত গোপীবাবু বলেন যে, বাহিরের চোর আসিয়া তাঁহার মোহর চুরি করে নাই; ঘরের চোরেই করিয়াছে।”

দুই মাস গত হইল। চোর ধরা পড়িল না। মোহর পুনঃপ্রাপ্তির আশা গোপীবাবু ছাড়িয়া দিলেন। গিরিশ, মাধব চক্রবর্ত্তীর বাটীতে আনা-গোনা করিতে লাগিলেন। মাধব চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীকে তিনি মা বলিতেন। গিরিশ তাঁহাদের বাটী গেলে সরলার মুখ প্রফুল্ল হইত। গিরিশের কথা সরলা এক মনে এক ধেয়ানে শুনিত। দুই এক দিন গিরিশ যদি তাঁহাদের বাটিতে না যাইতেন, তাহা হইলে সরলা ভালরূপে কাজ-কর্ম করিত না, সর্বদাই বিরস মনে থাকিত।

এক দিন সরলার মাতা স্বামীকে বলিলেন,—“মেয়ে বড় হইয়াছে। তাহার জ্ঞান হইয়াছে। বিবাহের জন্য আমরা কতই না ভাবিতেছিলাম। বিধাতা আপনি বুঝি সরলার বর আনিয়া দিলেন।”

মাধব চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—“আমি চুপ করিয়া নাই। সকল বিষয়ে সুপাত্র বটে, কিন্তু অবস্থা ভাল নহে, তাহা ব্যতীত, গিরিশের কোন কূলে কেহ নাই। তাহার সহিত এ বিষয়ে আমার কথা হইয়াছিল। সরলাকে বিবাহ করিতে গিরিশের বিশেষরূপ আগ্রহ আছে। কিন্তু সে বলে যে, পাশ না দিয়া কিরূপে বিবাহ করি? যদি পাশ না হই, তাহা হইলে কি করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিব? ভাল, যখন এত দিন গিয়াছে, তখন আরও কিছু দিন অপেক্ষা করা যাক। গিরিশ আমার নিকট সত্য করিয়াছে যে, পাশ হইলে সে অন্য কোন স্থানে বিবাহ করিবে না।”

মাধব চক্রবর্ত্তীর মনিব, গোপীমোহন ডাক্তারের সহিতও গিরিশের

আলাপ পরিচয় হইল। গিরিশের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও শান্ত স্বভাব দেখিয়া গোপীবাবু সর্বদাই তাহার প্রশংসা করিতেন।

একদিন গোপী বাবু গিরিশকে বলিলেন,—"আমি দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়িতেছি। হাঁপানি কাশিতে বড়ই কষ্ট পাইতেছি। প্রতিদিন যত বাড়ি হইতে ডাক আসে, সে সকল স্থানে যাইতে পারি না। তুমি যদি আমার ডাক্তারখানায় আসিয়া নিযুক্ত হও, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়। প্রাতঃকালে আমার বাটীতে যে সমুদয় রোগী আসে, অবসর পাইলে তাহাদিগকে তোমায় দেখিতে হইবে, আর ডাক্তারখানার কাজ-কর্মের ভারও লইতে হইবে। আপাততঃ তোমার সমুদয় খরচ আমি দিব, তাহার পর তুমি পাশ হইলে তোমাকে ডাক্তারখানার একটা অংশ দিব। আর যাহাতে তোমার ভালরূপ পসার হয়, তাহাও আমি করিব।"

গিরিশ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। যে বালক দুইটিকে তিনি পড়াইতেন, তাহাদের নিমিত্ত অন্য শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া, গিরিশ ডাক্তারখানার কাজেই সমুদয় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। যে দিন প্রাতঃকালে কলেজে যাইতে হইত না, সে দিন বাহিরের রোগী-দিগকে দেখিয়া, তাহাদের নিমিত্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন। সন্ধ্যার সময় ডাক্তারখানার কাজ দেখিতেন।

গিরিশের বাসা কিছু দূরে ছিল। সে-নিমিত্ত এক দিন মাধব চক্রবর্তী তাঁহাকে বলিলেন,—"প্রতিদিন এত দূর হইতে ডাক্তারখানায় আসিতে তোমার কষ্ট হয়। আমার বাটীর বাহিরে ছোট ঘরটি পড়িয়া আছে। যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সেই ঘরে আসিয়া থাকিতে পার। আর আমাদেরও যদি এক মুঠা হয়, তোমারও একমুঠা হইবে।"

সরলার নিকট বাস করিবেন, সরলাকে প্রতিদিন দেখিতে পাইবেন, সে জন্য গিরিশের মনে আনন্দ হইল। মাধব চক্রবর্তীর সেই ছোট বৈঠকখানায় গিরিশ বাস করিতে সম্মত হইলেন।

গিরিশ বলিলেন,—"আপনার বাহিরের ঘরে আমি থাকিব, আপনার ঘরেও আমি খাইব। কিন্তু আপনার অবস্থা ভাল নহে।

আপনাকে খরচ লইতে হইবে। আমার যত ব্যয় যখন গোপীবাবু নির্বাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তখন আপনি খরচ লইবেন না কেন? খরচ না লইলে আপনার বাটীতে থাকিব না।"

অগত্যা মাধব চক্রবর্তীকে এ কথায় সম্মত হইতে হইল। গিরিশ মাধব চক্রবর্তীর বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঘরে আহার করিতে লাগিলেন। সরলাকে সর্বদাই দেখিতে পাইতেন। সরলার লজ্জাশীলতা, সরলার মধুর কথা, সরলার নানা গুণ দেখিয়া তিনি নিতান্ত মুগ্ধ হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

বাক্সমোড়া চট

গোপীবাবুর ডাক্তারখানায় এক দিন বিলাত হইতে অনেক ঔষধ আসিয়াছিল। গিরিশ সেই বাক্সগুলি পূজার দালানে রাখাইলেন। কিন্তু মূল্যবান ঔষধের বাক্স কয়টি গোপীবাবু সেই মোহর-চুরির কুঠরিতে রাখিতে আদেশ করিলেন।

গোপীবাবু বলিলেন,—"ছোট কুঠরিতে ঐ দেরাজটা মিছামিছি স্থান যোড়া করিয়া আছে। ঐ দেরাজ হইতে আমার মোহর চুরি গিয়াছে। ওটাকে দেখিলে আমার রাগ হয়। দেরাজটা বিক্রয় করিয়া ফেল। তাহার পর ঐ ঘরে ভাল ভাল ঔষধের বাক্সগুলি রাখিয়া দাও।"

যাহারা কাঠ-কাঠরার ব্যবসা করে, সেইরূপ এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া, মাধব চক্রবর্তী দেরাজটা বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। কুলি ডাকিয়া সেই ব্যক্তি দেরাজ বাহিরে আনিল। গোপীবাবু দেরাজের টানার চাবিগুলি ফেলিয়া দিলেন। চাবি কয়টি হাতে করিয়া গিরিশ মনে করিলেন,— "দেখি, দেরাজের ভিতর কিছু আছে কি না!"

একে একে টানাগুলি খুলিয়া, তাহার ভিতর হাত প্রবিষ্ট করাইয়া গিরিশ উত্তমরূপে দেখিতে লাগিলেন। এ টানা সে টানা দেখিবার পর, অবশেষে একটির ভিতর যেই তিনি হাত দিয়াছেন, অমনি তাঁহার

হাতে কি ঠেকিয়া গেল। তিনি সেই জিনিসটি টানিয়া বাহিরে আনিলেন। দেখিলেন যে, সাবানের বাক্স! খুলিয়া দেখিলেন যে, তাহার ভিতর মোহর।

সকলের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। মোহরগুলি গোপী-বাবু গণিয়া দেখিলেন যে, ঠিক তাঁহার সেই পঞ্চাশটি মোহর রহিয়াছে। মোহর দেখিতে ডাক্তারখানার সকলে দৌড়িয়া আসিল। সকলেই এক একবার এক একটি মোহর তুলিয়া হাতে করিয়া দেখিল। গিরিশও একবার একটি মোহর তুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন।

টানার ভিতর মোহরের বাক্স কি করিয়া পুনরায় আসিল? মোহর যখন চুরি গিয়াছিল, তখন গোপীবাবু এক একটি টানার ভিতর হাত দিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছিলেন। বিলাতী দেরাজ। টানা একেবারে বাহির করিয়া ফেলিবার যো ছিল না। কিন্তু খুঁজিতে তিনি বাকি রাখেন নাই। তিনি একেলা নহেন, ডাক্তারখানার প্রায় সকল লোকই টানার ভিতর হাত দিয়া দেখিয়াছিল। কাহারও হাতে তখন সাবানের বাক্স ঠেকে নাই। আজ পুনরায় ইহার ভিতর সে মোহরপূর্ণ বাক্স কোথা হইতে আসিল?

যে লোক দেরাজ কিনিয়াছিল, সে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া ও অনেক বার দেরাজের টানাগুলি টানিয়া ও নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। তাহার পর গোপী বাবুর নিকট হইতে সাবানের বাক্সটি লইয়া কাত অর্থাৎ আড় করাইয়া টানার ভিতর প্রবিষ্ট করিয়া দিল। সাবানের বাক্স গিয়া দেরাজের পশ্চাৎ দিকের কাঠের গায়ে লাগিল। তখন সকলকে সে হাত দিয়া দেখিতে বলিল। সাবানের বাক্স আড় হইয়া কাঠের গায়ে ঠিক সমানভাবে লাগিয়াছিল। হাত দিলেই কাঠের মত বোধ হইতে লাগিল। যে দিন মোহর অন্তর্হিত হয়, সে দিন গোপীবাবু দেরাজ নাড়িয়াছিলেন। সেই নাড়া-চাড়ায় টানার ভিতর সাবানের বাক্স আড় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর, টানার ভিতর যে হাত দিয়া দেখিয়াছিল, তাহার হাতেই সাবানের বাক্সের পৃষ্ঠদেশ ঠিক কাঠের মত বোধ হইয়াছিল। সকলেই বুঝিল যে, মোহর অন্তর্হিত হইবার

কারণ ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

গোপীবাবু তাঁহার বৃদ্ধা মাতা ও স্ত্রীকে দেখাইবার নিমিত্ত মোহর-পূর্ণ সাবানের বাক্সটি লইয়া সত্বর বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। যে দিন এ ঘটনা ঘটিল, সে দিন মঙ্গলবার।

গিরিশ বাসায় আসিলেন। মাধব চক্রবর্তী তখন বাটী আসেন নাই। মোহর পুনঃপ্রাপ্তির বিষয়ে গিরিশ সরলা ও সরলার মাতার নিকট গল্প করিলেন।

সরলা বলিল,—"মোহর কিরূপ, আমি কখনও দেখি নাই!"

গিরিশ বলিলেন,—'মোহর কখন দেখ নাই? রও! আমি তোমাকে দেখাইতেছি। আমার যে দিন জন্ম হয়, সেই দিন পিতামহ আমাকে একটি মোহর দিয়া দেখিয়াছিলেন। আমি বড় হইলে পিতা সেই মোহরটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন,—'গিরিশ! ইহা আক্‌বরী মোহর, ইহা লক্ষ্মী; যাহার কাছে থাকে, তাহার ভাল হয়। সে জন্য তোমাকে আমি ইহা দিতেছি। অতি যত্নে ইহা রাখিবে, কিছুতেই ইহা নষ্ট করিবে না।' সেই অবধি মোহরটি আমি অতি সাবধানে রাখিয়াছি।'

এই কথা বলিয়া গিরিশ আপনার ঘরে গমন করিলেন। বাক্স হইতে মোহরটি আনিয়া সরলাকে দেখাইলেন। সরলা হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া মোহরটি পুনরায় গিরিশকে দিল। গিরিশ তখন তাহা আপনার পকেটে রাখিলেন। মনে করিলেন যে, পরে ইহা বাক্সতে তুলিয়া রাখিবেন।

কিছুক্ষণ পরে গোপীবাবুর দরওয়ান আসিল। হোলির সময় গিরিশের নিকট সে বক্‌শিশ চাহিয়াছিল। আট আনা দিতে গিরিশ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। গিরিশ বলিলেন,—"তোমার আমি আট আনা পয়সা ধারি; দিই, লইয়া যাও।"

এই বলিয়া গিরিশ পকেট হইতে একটি সিকি ও কতকগুলি পয়সা বাহির করিলেন। সেই পয়সার সহিত মোহরটিও বাহির হইয়া পড়িল। দরওয়ান তাহা দেখিল। মোহরটি পুনরায় পকেটে রাখিয়া, গিরিশ

তাহাকে একটি সিকি ও চারি আনা পয়সা গণিয়া দিলেন। দরওয়ান তাহা লইয়া চলিয়া গেল।

পরদিন বুধবার প্রাতঃকালে গিরিশ ডাক্তারখানায় গমন করিলেন। বিলাত হইতে যে সমুদয় বাক্স আসিয়া পূজার দালানে ছিল, গিরীশ তাহার গুটিকত-বাক্স খুলাইয়া, একেলা ফর্দ্দের সহিত ঔষধ মিলাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সেই মোহরপূর্ণ সাবানের বাক্স হাতে করিয়া গোপীবাবু সেই স্থানে আসিলেন। গিরিশ যে স্থানে মাটীতে বসিয়া ফর্দ্দের সহিত ঔষধ মিলাইতেছিলেন, তাহ'র পার্শ্বে একখানি তক্তপোশ ছিল। মোহরপূর্ণ সেই সাবানের বাক্স তক্তপোশের উপর রাখিয়া গোপীবাবু বন্ধু-বান্ধবদিগকে ডাকিয়া আহ্লাদ-সহকারে সেই মোহর দেখাইতে লাগিলেন।

সকলকে তিনি বলিতে লাগিলেন,—"দুই বৎসর পরিশ্রম করিয়া আমি এই মোহরগুলি জমা করিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, আর ইহাদের মুখ দেখিতে পাইব না। কিন্তু কা'ল হঠাৎ পুনরায় বাহির হইয়া পড়িল। আর একটু হইলেই যে দেরাজ কিনিয়াছিল, সে লইয়া চলিয়া যাইত। ভাগ্যে গিরিশ টানার ভিতর হাত দিয়া দেখিল, তাই আমি পুনরায় মোহরগুলি পাইলাম। সে এই গিরিশ, যে মাটিতে বসিয়া কাজ করিতেছে। এই গিরিশ হইতেই আমি আমার মোহরগুলি পাইয়াছি।"

গোপীবাবু গিরিশের প্রতি চাহিয়া একটু হাসিলেন। গিরিশও তাঁহার মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিলেন। বন্ধুবান্ধবকে ডাকিয়া গোপীবাবু এইরূপ পরিচয় দিয়া মোহর দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহারা বাক্স হইতে দুই একটি মোহর তুলিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া, চলিয়া গেলেন। তাহাতেও গোপীবাবুর মন তৃপ্ত হইল না। তিনি সদর দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন। রাস্তা দিয়া পরিচিত লোক যে যায়, তাহাকে মোহর দেখিবার নিমিত্ত ডাকিয়া আনেন।

গিরিশ আপনার মনে কাজ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে গোপীবাবুর বৃদ্ধা মাতা এক দাসী সঙ্গে করিয়া দালানে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। তিনি গিরিশকে বিশেষরূপে স্নেহ করিতেন। গিরিশকে তিনি বলিলেন,—"গিরিশ! বাক্সমোড়া এই চটগুলি ফেলিয়া দিও না, অনেক কাজে লাগিবে। যারে রাখ, সেই রাখে! চটগুলি আমাকে দাও, আমি বাড়ির ভিতর লইয়া যাই।"

যে চট-দ্বারা আবৃত হইয়া বিলাত হইতে কতকগুলি বাক্স আসিয়াছিল, গোপীবাবুর মাতা সেই চটগুলি বাছিয়া ও ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া তক্তপোশের উপর রাখিতে লাগিলেন। এ কার্যে চাকরাণীও তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বাড়ির ভিতর একটি ছেলে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। গোপীবাবুর মাতা বলিলেন,—"ঐ যাঃ! খোকা বুঝি পড়িয়া গেল! আহ্লাদি! মাটীতে যে চট পড়িয়া আছে, তুই সেইগুলি লইয়া আয়।

এই বলিয়া গোপীবাবুর মাতা তক্তপোশের উপর যে চটগুলি রাখিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি দুই হাতে সেইগুলিকে জড় করিয়া বাড়ির ভিতর লইয়া গেলেন। নীচে অর্থাৎ মাটির উপর যে চটগুলি পড়িয়াছিল আহ্লাদী চাকরাণী তাহা লইয়া তাঁহার সঙ্গে বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল। গিরিশ এক মনে আপনার কাজ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

শোণিত-পাত

বন্ধু-বান্ধবের প্রতীক্ষায় গোপীবাবু সদর দরজায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। আর এক জন পরিচিত লোককে পাইয়া মোহর দেখাইতে আনিলেন। দালানে উপস্থিত হইয়া তক্তপোশের উপর চাহিয়া তিনি বলিলেন,—"মোহরের বাক্স কি হইল? গিরিশ! মোহরের বাক্স কই?"

গিরিশ উত্তর করিলেন,—"মোহরের বাক্স আমি কি জানি!'

গোপীবাবু বলিলেন,—"সে কি, তক্তপোশের উপর আমি এই স্থানে বাক্স রাখিয়াছিলাম। সে বাক্স কোথায় গেল?"

গিরিশ বলিলেন,—"আহ্লাদী ঝীকে সঙ্গে লইয়া আপনার মাতা

চট লইতে দালানে আসিয়াছিলেন। তবে বোধ হয় তিনিই বাক্স বাটীর ভিতর লইয়া গিয়াছেন।"

গোপীবাবু বাটীর ভিতর দৌড়িয়া গেলেন ও মোহরের কথা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার মাতা বলিলেন,—'সে কি! আমি কেন মোহরের বাক্স আনিব? বাক্স তক্তপোশের উপর রহিয়াছে, আমি এইমাত্র দেখিয়া আসিলাম।" আহ্লাদী ঝীও ঠিক সেই কথা বলিল।

গোপী বাবু পুনরায় দালানে আসিয়া গিরিশকে বলিলেন,—"গিরিশ! মা বাক্স লইয়া যান নাই। বাক্স তক্তপোশের উপর রহিয়াছে, তিনি দেখিয়া গিয়াছেন। আহ্লাদী ঝীও তাহা দেখিয়া গিয়াছে। তুমি বোধ হয়, তামাশা করিয়া বাক্স লুকাইয়া রাখিয়াছ। আর কেন, দাও। বাক্স বাহির করিয়া দাও।"

গিরিশ উত্তর করিলেন,—"সে কি মহাশয়! আপনার সহিত আমি তামাশা করিব, এ কি সম্ভব! বাক্স তক্তপোশের উপর ছিল, তাহা আমিও দেখিয়াছি। বন্ধু-বান্ধবকে আনিয়া আপনি দেখাইতেছেন, তাহাও শুনিতেছি। কিন্তু আমি আপনার মনে কাজ করিতেছি। আপনার বাক্সতে আমি হাত দিই নাই। বাক্স কে লইল, কোথায় গেল, তাহার বিন্দুবিসর্গও আমি জানি না!"

গোপীবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"বাক্সর পা নাই যে উড়িয়া যাইবে। আমার মা কিছু আর বাক্স চুরি করেন নাই। বাক্স তক্তপোশের উপর রহিয়াছে, তিনি দেখিয়া গিয়াছেন। আহ্লাদী ঝীও তাহা দেখিয়া গিয়াছে। তাহার পর এ দালানে অপর কোন ব্যক্তি আসে নাই। তুমি একেলা এই দালানে আছ। দাও, বাক্স কোথায় রাখিয়াছ, বাহির করিয়া দাও।"

গিরিশও রাগত হইয়া উত্তর করিলেন, "তবে কি মহাশয় আমাকে চোর বলেন নাকি?"

গোপীবাবু আরও কুপিত হইয়া বলিলেন,—"বাক্স না পাওয়া গেলে আর কি বলিব?"

গিরিশ বলিলেন,—"তবে এই আপনার ঔষধ রহিল, এই কাগজ

রহিল, এই দোয়াত কলম রহিল, আমি চলিলাম। এই দেখুন, আমার হাতে কিছুই নাই, কাপড়ে কিছু নাই, গদরে কিছু নাই, জামার ভিতর কিছু নাই। আপনার মোহর আমি খাইয়া ফেলি নাই।"

এই কথা বলিয়া গিরিশ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। ক্রোধে কম্পিত হইয়া গোপীবাবু বলিলেন,—"তুমি যাবে কোথা? বাক্স বাহির করিয়া দিয়া তবে যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাও। তা না হইলে তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়িব না। ওরে, এরে ধর তো। ঐ ছোট কুঠরিতে বন্ধ করিয়া রাখ।"

পূর্বে গোপীবাবুর ডাক্তারখানা হইতে অনেক ঔষধ চুরি যাইত। কম্পাউণ্ডার, দ্বারবান প্রভৃতি সকলের তাহাতে যোগ ছিল ও সকলের তাহাতে ভাগ ছিল। গিরিশ আসিয়া সেই সব চুরি বন্ধ করিয়াছিলেন। সে নিমিত্ত গিরিশের উপর সকলের ঘোরতর রাগ ছিল। সকলে আসিয়া গিরিশকে ধরিল ও সেই মোহর-চুরির ছোট কুঠরিতে লইয়া গেল। সেই স্থানে লইয়া, কাপড় দ্বারা মুখ বন্ধ করিয়া গিরিশকে তাহারা নিদারুণ প্রহার করিতে লাগিল। প্রহারের চোটে গুরুতর আঘাত লাগিয়া গিরিশের মুখ দিয়া ভলকে ভলকে রক্ত বাহির হইতে লাগিল। সে রক্ত মুখ হইতে বাহির হয় নাই; সে রক্ত কৃষ্ণবর্ণের নহে। গিরিশের শ্বাস-প্রশ্বাস-যন্ত্র বাল্যকাল হইতেই দুর্বল ছিল। সে রক্ত লোহিতবর্ণ; বক্ষঃস্থলের ভিতর হইতে বাহির হইয়াছিল। গিরিশকে যাহারা মারিতেছিল, শোণিত দেখিয়া তাহাদের ভয় হইল। হাতে মুখে জল দিয়া গিরিশকে তাহারা একটু সুস্থ করিল, রক্তের চিহ্ন ধুইয়া ফেলিল। তাহার পর গিরিশকে সেই ঘরে বন্ধ করিয়া, দালানে ও সকল স্থানে পাতি পাতি করিয়া তাহারা মোহরের বাক্স খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু সকল অনুসন্ধান বৃথা হইল, মোহরের বাক্স বাহির হইল না। যখন এই সমুদয় ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তখন মাধব চক্রবর্তী ডাক্তারখানায় ছিলেন না। তিনি তাগাদায় গিয়াছিলেন।

এই গোলযোগের সময় গোপীবাবুর দরওয়ান তাঁহাকে বলিল যে, -"মহাশয়। গত কল্য গিরিশ বাবর নিকট আমি একটা মোহর

দেখিয়াছি। কাল আমার সাক্ষাতে গিরিশ বাবু পকেটে হাত দিয়া কতকগুলি পয়সা বাহির করিলেন। সেই পয়সার সহিত একটা মোহর দেখিয়াছিলাম।"

দরওয়ান বলিল, কাল সে গিরিশের নিকট মোহর দেখিয়াছে। গোপীবাবুর মোহর চুরি গেল, আজ প্রাতঃকালে। সে কথা গোপীবাবুর বড় হৃদয়ঙ্গম হইল না। ক্রোধে ও দুঃখে তিনি জ্ঞানহারা হইয়াছিলেন। দরওয়ান গিরিশের নিকট মোহর দেখিয়াছে, এই কথা শুনিয়াই তাঁহার নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, মোহর গিরিশ চুরি করিয়াছে। পূর্ব দিনে যখন দেরাজ হইতে বাহির হয়, তখন দুই একটা মোহর হাতে করিয়া সকলেই নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছিল। গিরিশও তাহা হাতে করিয়াছিলেন। সে নিমিত্ত গোপীবাবু ভাবিলেন যে, গিরিশ কাল একটা মোহর কোনরূপে পকেটে ফেলিয়াছিল। তাহার পর আজ সমুদয়গুলি লইয়াছে। মোহর আবার কে কবে পয়সার সঙ্গে পকেটে রাখিয়া থাকে?

ষষ্ঠ অধ্যায়

হাতে হাতকড়ি

মাতা অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাহা না শুনিয়া গোপীবাবু পুলিশে নালিশ করিলেন। পুলিশের লোক আসিয়া তদন্ত আরম্ভ করিল।

গোপীবাবু বলিলেন যে,—"আর এক বার আমার এই মোহর চুরি গিয়াছিল। যে রাত্রিতে চুরি যায়, সে রাত্রিতে গিরিশ আসিয়া পাশের ঘরে অনেকক্ষণ বসিয়াছিল। কিন্তু তখন আমি তাহাকে কোনরূপ সন্দেহ করি নাই। তাহার পর সে আমার ডাক্তারখানায় কর্ম করে। গত কল্য সেই গিরিশ টানার ভিতর হইতে মোহর বাহির করিয়া আমাকে প্রদান করে। কি অভিপ্রায়ে তাহা আমি বুঝিতে পারি না। সে বোধ হয়, টানার ভিতর প্রথম নিজেই রাখিয়া তাহার পর আপনি

সেই মোহর বাহির করিয়াছিল। আজ প্রাতঃকালে মোহরের বাক্স দালানে তক্তপোশের উপর রাখিয়া আমি সদর-দরজায় গিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। এই অবসরে মোহর সে কোন স্থানে সরাইয়া থাকিবে। ইহার একটি মোহর আমার দরওয়ান তাহার পকেটে দেখিয়াছে। দালানে আজ প্রাতঃকালে এক গিরিশ ব্যতীত অপর কেহ আসেনাই। একবার কেবল আমার মাতা, ঝীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। মাতা যখন বাটীর ভিতর ফিরিয়া যান, তখন মোহরের বাক্স তক্তপোশের উপর ছিল। ঝীও তাহা দেখিয়াছে।"

গোপীবাবুর মাতা, আহ্লাদী ঝী, দ্বারবান প্রভৃতি সকল লোকের সাক্ষ্য পুলিশের লোকে গ্রহণ করিল। গিরিশের পকেট অনুসন্ধান করিয়া তাহারা একটি মোহর পাইল। গিরিশের ঘরতল্লাস করিয়া কিন্তু আর কিছু পাইল না। যাহা হউক, অবশেষে হাতে হাতকড়ি দিয়া পুলিশের লোক গিরিশকে চালান দিল। মাধব চক্রবর্তী, তাঁহার স্ত্রী ও সরলা শোকে অভিভূত হইলেন। চক্রবর্তী মহাশয় গোপীবাবুর অনেক হাতে-পায়ে ধরিলেন, কিন্তু তিনি কোন কথাই শুনিলেন না।

দুই দিন পরে গিরিশের মকদ্দমা আদালতে উঠিল। গিরিশ যে মোহর চুরি করিয়াছে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার কোন প্রমাণ ছিল না। কিন্তু গোপীবাবু মকদ্দমার বিশেষরূপ তদবির করিতে লাগিলেন। যে হাকিমের নিকট গিরিশের বিচার হইতেছিল, তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যে দুই একটি কথা নির্গত হইল, তাহাতে সকলের বোধ হইল যে, গিরিশের তিনি দণ্ড না করিয়া ছাড়িবেন না। ফরিয়াদির পক্ষের সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য গৃহীত হইলে, হাকিম গিরিশকে চুরি অপরাধে অভিযুক্ত করিলেন ও তাঁহার কোন রূপ সাফাই সাক্ষী আছে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। গিরিশ বলিলেন যে, তাঁহার কোন সাফাই সাক্ষী নাই। গিরিশকে কারাবাস-প্রেরণের উদ্দেশে হাকিম রায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময় আদালতে একটা গোল পড়িল। সকলে দেখিল, এক জন কৃষ্ণকায় ব্যক্তি এক বালিকার হাত ধরিয়া ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছে। কন্যাটি ঠিক বালিকা নহে, যৌবন প্রস্ফুটিতপ্রায়। বালিকার

মধু-মাখা লাবণ্য দেখিয়া সকলেই তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

বলা বাহুল্য যে, সে বালিকা আর কেহ নহে—সরলা। গিরিশের বিপদে সরলা ও সরলার মাতা নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন। কয় দিন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দুই জনেই এক মনে ভগবানকে ডাকিতেছিলেন। লোকপরম্পরায় সরলা শুনিল যে, গিরিশের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই, কেবল তাঁহার নিকট হইতে সেই যে মোহরটি বাহির হইয়াছিল, তাহার জন্য গিরিশের কয়েদ হইবার সম্ভাবনা।

পিতাকে সরলা বলিল,—"বাবা! গোপীবাবুর মোহর বুধবার দিন চুরি গিয়াছে, কিন্তু মঙ্গলবার দিন গিরিশ বাবুর নিকট আমি মোহর দেখিয়াছি। তাহা হইলে গিরিশ বাবু কি করিয়া মোহর চুরি করিলেন? আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, গিরিশ বাবুর পিতামহ এই মোহর দিয়া আঁতুড়ে তাহাকে দেখিয়াছিলেন। গিরিশ বাবু কাহারও কোন বস্তু চুরি করিবার লোক নহেন। চুরি হইবার পূর্ব দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার দ্বারবান যে গিরিশ বাবুর পকেটে মোহর দেখিয়াছিল, সে কথা সকলে গোপন করিয়াছে। আমি গিয়া হাকিমকে এ কথা বলিব। কোথায় বিচার হইতেছে, সে স্থানে আমাকে লইয়া চল।"

মাধব চক্রবর্তী উত্তর করিলেন,—"বাপ রে! ও কথা মুখে আনিও না। আমি নিশ্চয় জানি বটে যে, গিরিশ মোহর চুরি করে নাই। কিন্তু কি করিব বল, গোপীবাবুর কত হাতে-পায়ে ধরিলাম, তিনি আমার কথা শুনিলেন না। ভগবান যা কপালে লিখিয়াছেন, তাহাই হইবে। তুমি এখন বালিকা নও, তোমাকে কি আদালতে লইয়া যাইতে পারি? লোকের কাছে তাহা হইলে মুখ দেখাইতে পারিব না। তাহার পর গোপীবাবু আমাকে ছাড়াইয়া দিবেন। এ বৃদ্ধ বয়সে কোথায় আবার চাকরি খুঁজিয়া বেড়াইব?"

সরলা ও সরলার মাতা বার বার তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। দুই জনে কাঁদিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন যে,—"সরলা যদি একটা কথা বলিলে গিরিশ বিপদ হইতে উদ্ধার পায়, তাহা হইলে সে কাজ

নিশ্চয় করিতে হইবে। ব্রাহ্মণের ছেলেকে অন্যায় করিয়া গোপীবাবু কয়েদ দিতেছেন। তাহাকে রক্ষা করিলে লোকে যদি আমাদের নিন্দা করে, তো করুক। গোপীবাবু যদি তোমাকে ছাড়াইয়া দেন, এতই যদি তিনি নরাধম হন্ তো হউন ; আমরা ভিক্ষা মাগিয়া খাইব।”

মাধব চক্রবর্তী অগত্যা সরলাকে আদালতে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়

ফণ্ডে টাকা

কন্যাকে লইয়া মাধব চক্রবর্তী আদালতে উপস্থিত হইলেন। হাকিম তৎক্ষণাৎ সরলার সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন। সরলাকে বড় অধিক কিছু বলিতে হইল না। গিরিশের পক্ষ হইয়া সরলার আগমন, তাহাই যথেষ্ট হইল। এরূপ সুশীলা সুরূপা ভদ্রকন্যা যাহার সপক্ষ সাক্ষী, সে যে নির্দোষ, সরলাকে দেখিয়াই হাকিমের মনে সেই বিশ্বাস জন্মিল, চুরি হইবার পূর্ব দিন গিরিশের নিকট তিনি মোহর দেখিয়াছিলেন, সরলাকে কেবল এই কথা বলিতে হইল।

সরলার আন্তরিক ভাব হাকিম বুঝিতে পারিলেন। গিরিশকে ছাড়িয়া দিবার সময় ঈষৎ হাসিয়া তিনি সরলাকে বলিলেন,—“ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তোমরা দুই জনে সুখী হও।”

লজ্জায় সরলা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া গিরিশ, মাধব চক্রবর্তী ও সরলা তিন জনে বাটী ফিরিয়া আসিলেন। চক্রবর্তী মহাশয়ের বাটীতে সে দিন আর আনন্দের সীমা রহিল না। সরলার মাতা সন্ধ্যার সময়ে হরিরলুট দিলেন।

তাহার পর দিন গোপীবাবু মাধব চক্রবর্তীকে কর্ম হইতে জবাব দিলেন। বিরস বদনে চক্রবর্তী বাড়ী প্রত্যাগমন করিলেন। গিরিশ বলিলেন,—“মহাশয়! এজন্য কিছুমাত্র ভয় করিবেন না। আর এক মাস পরে আমি পাশ হইব, নিশ্চয় পাশ হইব। তখন আমি ডাক্তার

হইব। যে কোন প্রকারে হউক, নিশ্চয় আপনাদিগের প্রতিপালন করিতে পারিব। আপাততঃ আমার তিন শত টাকা জমা আছে, সেই তিন শত টাকা খরচ করিব। তবে আর ভাবনা কি? আপনার যদি অমত না থাকে, তাহা হইলে সত্বর একটা ভাল দিন দেখাইয়া সরলাকে আমার হস্তে প্রদান করুন।”

এই ঘটনার আট দিন পরেই সরলার সহিত গিরিশের শুভ বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হইল। গিরিশ শ্বশুরের সংসারেই রহিলেন।

এক মাস পরে গিরিশ সুখ্যাতির সহিত ডাক্তারি পাশ দিলেন। তিন শত টাকার যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা দিয়া নিকটে ভাল একটি বাড়ী ভাড়া লইয়া নিজের ডাক্তারখানা খুলিলেন। কিন্তু গোপীবাবু তাঁহার পরম শত্রু হইয়া উঠিলেন। গিরিশ চোর, গিরিশের চরিত্র ভাল নহে, ভদ্রলোকের বাড়ীতে ইহাকে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে, চারিদিকে এইরূপ কুৎসা রটাইতে লাগিলেন। সে জন্য গিরিশের পসার ভাল হইল না, ভালরূপ অর্থোপার্জন হইল না। যাহা হউক, তিনি, শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে, পিতা-মাতার ন্যায় ভক্তি সহকারে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। মাধব চক্রবর্তী মহাশয় দুই এক স্থানে কর্মের যোগাড় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শরীর দুর্বল ও রুগ্ন, সে জন্য গিরিশ তাঁহাকে আর চাকরি করিতে দিলেন না। চাকরি আর তিনি করিতেও পারিতেন না। কারণ, অল্প দিন পরে বাতরোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। ধন না হউক, গহনা না হউক, মনের মত পতি পাইয়া, বাপ মায়ের কাছে থাকিয়া, সরলা সুখে কাল-যাপন করিতে লাগিল। কিছু দিন পরে সরলার এক কন্যা হইল। মাতামহ আদর করিয়া কন্যার নাম রাখিলেন,—লীলা।

গোপী বাবুর ধন-ঐশ্বর্য অনেক ছিল বটে; কিন্তু মনে তাহার সুখ ছিল না। যত বয়স হইতে লাগিল, তাহার হাঁফানি কাশি ততই প্রবল হইতে লাগিল। জীবন তাহার কষ্টময় হইল, শরীর ক্লেশের আগার হইল, প্রত্যেক নিঃশ্বাস প্রশ্বাস তাহার যন্ত্রণাদায়ক হইল। ইহার উপর তাঁহার দুইটি পুত্রই বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া এক দিনেই

মৃত্যুমুখে পতিত হইল। একটির বয়ঃক্রম দ্বাদশ ও অপরটির বয়স দশ বৎসর। ইহার কিছু দিন পরে গোপীবাবুর আর একটি বিপদ ঘটিল। তাঁহার একমাত্র কন্যা ছিল। সেই কন্যার একটি শিশু পুত্র ছিল। যে দিন মোহর চুরি যায়, সে দিন তাহারই কান্না শুনিয়া গোপীবাবুর মাতা তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর গমন করেন। কয়েক বৎসর পরে গোপীবাবুর কন্যার শ্বশুর-বাড়িতে এক দিন তাঁহার পুত্র পুষ্করিণীর জলে পড়িয়া যায়। তখন ঘাটে আর কেহ ছিল না। পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য গোপীবাবুর কন্যা জলে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু তিনি সাঁতার জানিতেন না। মাতা-পুত্র দুই জনেই জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। গোপীবাবু এইরূপে নিঃসন্তান হইলেন। সকলেই বলিল, এমন কি, তাঁহার নিজের মাতাও বলিলেন যে, বিনা দোষে গিরিশের প্রতি অন্যায় হইয়াছিল, তাহারই প্রতিফলস্বরূপ তাঁহার এই সমুদয় বিপদ ঘটিল। কিন্তু এ পর্যন্ত সে মোহরের কোন সন্ধান হয় নাই। সে নিমিত্ত এখনও তাহার মনে নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, গিরিশই তাহার মোহর চুরি করিয়াছে। গিরিশের সহিত পুনরায় সদ্ভাব করিতে মাতা তাহাকে বার বার অনুরোধ করিলেন। কিন্তু এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তিনি মাতার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না।

বাল্যকাল হইতেই গিরিশের বক্ষঃস্থল বড় ভাল ছিল না। বিশেষ কোন রোগ ছিল না বটে, কিন্তু বক্ষঃস্থলের সঙ্কুচিত গঠন দেখিয়া, তিনি নিজেই সর্বদা ভয় পাইতেন। তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস-যন্ত্র ভালরূপ সবল নহে, গিরিশের মনে এই ধারণা ছিল। তাহার পর গোপী বাবুর লোক দ্বারা প্রহারের পর তাহার বক্ষঃস্থলে যে বেদনা জন্মে, সে বেদনা কিছুতেই দূর হয় নাই। সেই সময় হইতে মাঝে মাঝে কাসি হইয়া তিনি বড়ই কষ্ট পাইতেন। এই সকল কারণে, অর্থোপার্জন করিতে আরম্ভ করিয়াই, গিরিশ লাইফ-ইনশিয়োর অর্থাৎ ফণ্ডে টাকা জমা দিতে লাগিলেন। দুইটি ফণ্ডে তিনি টাকা দিতেন। প্রথম স্থানের সহিত এই নিয়ম নির্ধারিত হইয়াছিল যে, গিরিশের মৃত্যু হইলে সে ফণ্ড হইতে তাহার স্ত্রী নগদ তিন সহস্র টাকা পাইবেন। দ্বিতীয় স্থানের সহিত এই

নিয়ম করিয়াছিলেন যে, তাহার মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রী যত দিন জীবিত থাকিবেন, তত দিন মাসে মাসে দশ টাকা করিয়া পাইবেন। প্রথম স্থানে গিরিশকে ছয় মাস অন্তর পঞ্চাশ টাকা দিতে হইত; দ্বিতীয় স্থানে তিনি প্রতি মাসে তিন টাকা করিয়া দিতেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সঙ্কট পীড়া

এইরূপে প্রায় সাত বৎসর কাটিয়া গেল। মাধব চক্রবর্তী মহাশয়ের শরীর আর সুস্থ ও সবল হইল না। গ্রীষ্মকালে তাহার বাত বেদনার প্রকোপ যখন কিছু হ্রাস হইত, তখন তিনি একটু উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে পাইতেন। কিন্তু সে কেবল অল্প দিনের জন্য। বলিতে গেলে প্রায় বারো মাস তাহাকে বিছানায় পড়িয়া থাকিতে হইত। সরলার আর সন্তানাদি হয় নাই, কেবল সেই একমাত্র কন্যা,—লীলা। লীলা পিতার বড় আদরের সামগ্রী। পিতার সহিত তাহার যত মনের কথা হইত। বাবা, বাবা—বলিয়া অজ্ঞান। বলা বাহুল্য যে, মেয়েটিকে গিরিশ প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন। গিরিশের ধন-ঐশ্বর্য ছিল না বটে, কিন্তু লীলার কথা, লীলার হাসি, লীলার ভালবাসা, তাহার লক্ষ টাকার অধিক ছিল। ফল কথা, গিরিশের সংসারে শান্তি ছিল, সুখ ছিল।

কিন্তু হায়! লীলার যখন বয়স পাঁচ বৎসর হইল, তখন এই সুখের সংসারে এক ঘোর দুর্ঘটনা ঘটিল। এই সময় গিরিশের ভয়ানক কাসি হইল, রাত্রি দিন কাসি, এক মুহূর্তের জন্য বিরাম নাই, বক্ষঃস্থল যেন খানখান হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। শ্লেষ্মার সহিত ক্রমে ঈষৎ রক্ত দেখা দিল। প্রত্যহ বৈকাল বেলা অল্প অল্প জ্বর হইতে লাগিল। গিরিশ নিজে ডাক্তার ছিলেন। কি হইতেছে, তাহা তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন। যক্ষ্মা-কাস রোগ দ্বারাই তিনি আক্রান্ত হইলেন। গিরিশ ভাবিলেন যে,—আর আমার নিস্তার নাই!

ক্রমে তিনি শুষ্ক ও দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। শ্বশুর, শাশুড়ী স্ত্রী ও কন্যার মুখপানে চাহিয়া তিনি যত দিন সম্ভব, সংসার-নির্বাহের নিমিত্ত অর্থোপার্জন করিতে লাগিলেন। নিতান্ত অশক্ত হইয়াও তিনি যথাশক্তি পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। পীড়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এরূপ সংকট সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত হইয়া লোকে আর কত দিন পরিশ্রম করিতে পারে! ছয় মাস পরেই তিনি শয্যাগত হইয়া পড়িলেন।

গিরিশের সঞ্চিত অর্থ ছিল না। মাসে মাসে যাহা উপার্জন করিতেন তাহাই খরচ হইয়া যাইত। স্ত্রী ও কন্যাকে যে কয়খানি গহনা দিয়াছিলেন, সম্বলের মধ্যে কেবল তাহাই ছিল। শয্যাশায়ী হইয়া, নিরুপায় হইয়া, গিরিশ এখন সেই গহনাগুলি বেচিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

রোগ আরও প্রবল হইয়া উঠিল। দিন দিন তিনি বিছানার সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিলেন। গিরিশ বুঝিলেন যে, তাহার আসন্নকাল উপস্থিত, আর অধিক বিলম্ব নাই। অবশিষ্ট যে অলঙ্কার ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া পঞ্চাশ টাকা হইল। গিরিশের এই শেষ সম্বল। কিন্তু এ পঞ্চাশ টাকা কয়দিন? এ পঞ্চাশ টাকা ফুরাইলে তাহার পর কি হইবে? বৃদ্ধ ও রুগ্ন শ্বশুর ও বৃদ্ধা শাশুড়ীর দশা কি হইবে? সহায়-সম্পত্তিহীনা কুলের কুলবধূ সরলার দশা কি হইবে? প্রাণাধিকা শিশু লীলার কি হইবে? আহা! সংসারের সে কিছুই জানে না। সদাই মনের আনন্দে সে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। হায়! দুই দিন পরে সে লীলার কি দশা ঘটিবে? ক্ষুধায় কাতর হইয়া দুইটি মুড়ির জন্য কি এক মুষ্টি ভাতের জন্য লীলা যখন কাঁদিবে, তখন কে দুইটি মুড়ি কি এক মুষ্টি ভাত দিয়া তাহাকে শান্ত করিবে? গিরিশ ভাবিয়া আকুল হইলেন, চারিদিক্ তিনি অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। হে ভগবান! তোমার মনে কি এই ছিল!

গিরিশ অনেক দিন ধরিয়া ফণ্ডে টাকা দিয়া আসিতেছেন। ফণ্ডের সহিত তিনি এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার

স্ত্রী নগদ তিন হাজার ও মাসে দশ টাকা পাইবেন। তবে আর ভাবনা কি? সত্য বটে। কিন্তু এক ফণ্ডে মাসে তাঁহাকে তিন টাকা করিয়া দিতে হয়। শয্যাগত হইয়াও অতি কষ্টে তিনি তাহা দিয়া আসিতেছেন। এখন আর তিনি কি করিয়া দিবেন? তাহার পর অপর ফণ্ডে ছয় মাস অন্তর যে পঞ্চাশ টাকা করিয়া দিতে হয়, পাঁচ দিন পরে সেই পঞ্চাশ টাকা দিতে হইবে। এখন কোথা হইতে সে পঞ্চাশ টাকা তিনি দিবেন? নিয়মিত দিনে টাকা দিতে না পারিলে, নিরূপিত প্রাপ্য হইতে তাঁহার পরিবার বঞ্চিত হইবেন। এত দিন তিনি যে ফণ্ডে টাকা দিয়া আসিতেছেন, সে বৃথা হইবে; তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইলে, স্ত্রী একটি পয়সাও পাইবে না। যে পঞ্চাশটি টাকা হাতে আছে, তাঁহার সেই শেষ সম্বল। তাহা যদি তিনি ফণ্ডে প্রদান করেন, তা হলে জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন কি খাইয়া তিনি জীবিত থাকিবেন? অপর দিকে, ফণ্ডে সেই পঞ্চাশ টাকা না দিলে, দুই দিন পরে তাঁহার অনাথা স্ত্রী ও কন্যা একেবারে পথে দাঁড়াইবে। "হে জগদীশ্বর! এই পাঁচ দিনের ভিতর আমার মৃত্যু হয়, তবেই রক্ষা! তাহা না হইলে, হে ঈশ্বর! আমার অবর্তমানে এ অনাথাদিগের কি দশা হইবে?"

এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া গিরিশ নিতান্ত আকুল হইয়া পড়িলেন।

নবম অধ্যায়

এ কে?

গিরিশের যিনি চিকিৎসা করিতেছিলেন, তিনি তাঁহার পরম বন্ধু। দুই জনে একসঙ্গে পড়িয়াছিলেন। গিরিশ তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, —"ভাই! আমার শ্বাস-প্রশ্বাস-যন্ত্রটি তুমি ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখ। আমার নিকট কোন কথা গোপন করিবে না। ঠিক করিয়া বল দেখি, আর কত দিন আমার বাঁচিবার সম্ভাবনা আছে?"

গিরিশের বন্ধু তাঁহার বক্ষঃস্থল অতি সাবধানে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—"ভাই! যখন তুমি আমাকে ঠিক সত্য কথা বলিতে

অনুরোধ করিতেছ, তখন আমাকে তাহা বলিতে হইবে। আমার উপর অসন্তুষ্ট হইও না। এ যাত্রা তুমি কিছুতেই রক্ষা পাইবে না। তবে তিন মাসের ভিতর তোমার মৃত্যু হইবে না, ছয় মাসের অধিক তুমি কিছুতেই বাঁচিবে না। চারি পাঁচ মাস পরেই নিশ্চয় তোমাকে এ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। তোমার বক্ষঃস্থলের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া আমার এইরূপ অনুমান হইতেছে। কিন্তু একেলা আমার কথায় তোমার বিশ্বাস করা উচিত নয়। আমি আরও দুই জন ভাল ডাক্তার আনিয়া দেখাইব। তাঁহারা কি বলেন, শুনিতে হইবে।"

গিরিশের বন্ধু, আরও দুই জন ভাল ডাক্তার আনিয়া দেখাইলেন। সকলেই একমত হইয়া বলিলেন যে, ছয় মাসের অধিক গিরিশ কিছুতেই জীবিত থাকিবেন না।

গিরিশ বলিলেন,—"আমি ডাক্তার। আমার শরীরের ভিতর যাহা হইতেছে, তাহা আমি উত্তমরূপ জানি। এ রোগে বাঁচিবার আশা বড়ই প্রবল হয়। কিন্তু আমি শিশু নই। শীঘ্রই যে আমাকে যাইতে হইবে, তাহা আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি। এক্ষণে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি,—পাঁচ দিনের ভিতর মৃত্যু হইবার কোন সম্ভাবনা আছে কি?"

সকলেই একবাক্যে বলিলেন,—"কিছুতেই নয়। পাঁচ দিন কেন, তিন মাসের ভিতর কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।"

অন্য ডাক্তার দুই জন চলিয়া গেলে, গিরিশ আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই। তুমি আজ আমার নিমিত্ত যে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছ, তাহাতে কি কি আছে?"

যে ঔষধ যে পরিমাণে দিয়াছিলেন, গিরিশের বন্ধু তাহার নাম করিলেন।

গিরিশ বলিলেন,—"বারো দাগ ঔষধ দিয়াছ। আচ্ছা, কেহ যদি ভুলিয়া একেবারে বারো দাগ খাইয়া ফেলে, তাহা হইলে কি হয়।"

বন্ধু উত্তর করিলেন,—"কি হয়, তাহা কি তুমি জান না? দুর্বল লোকের কথা দূরে থাকুক, সুস্থ সবল ব্যক্তিও মরিয়া যায়।"

ঈষৎ হাসিয়া গিরিশ বলিলেন,—"তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

সে দিন এইরূপে গত হইল। তাহার পরদিন সন্ধ্যাকালে গিরিশ বলিলেন,—"সরলা! লীলা মা! তোমরা দুই জনে আমার নিকট এস। সরলা, তুমি এক পাশে থাক, লীলা তুমি এক পাশে থাক। তোমরা দুই জনে আমার নিকটে থাকিলে আমি ভাল থাকি।"

গিরিশ খাটে শুইয়া আছেন। সরলা বাম পাশে বসিল, লীলা তাহার দক্ষিণ পাশে বসিল। বাম হাতে গিরিশ সরলার একটি হাত ধরিলেন। সন্ধ্যাকাল, অন্ধকার হইয়াছে। ঘরে প্রদীপ জ্বালিতে গিরিশ বারণ করিল। সরলা ও লীলার হাত ধরিয়া সেই অন্ধকার ঘরে নিঃশব্দে চক্ষু বুজিয়া গিরিশ শয়ন করিয়া রহিলেন। এই ভাবে আধ ঘণ্টা শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় সহসা সেই ঘরে এক ব্যক্তি— আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সরলা চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এই ব্যক্তি কে?

দশম অধ্যায়

সেই চট

গিরিশ যে সময়ে সরলা ও লীলাকে ডাকিয়া কাছে বসাইলেন, সেই সময়ে গোপী বাবুর বাটীতে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল। গোপী বাবুর বৃদ্ধা মাতা যে ঘরে শয়ন করিতেন, সেই ঘরের দ্বারে-জানালায় কিছু ফাঁক হইয়া গিয়াছিল। অগ্রহায়ণ মাস, নূতন শীত পড়িয়াছে।

আহ্লাদী ঝিকে ডাকিয়া গোপীবাবুর মাতা বলিলেন,—"আহ্লাদি! দ্বার জানালার ফাঁক দিয়া রাত্রিতে ঘরে বড় হিম আসে। বুড়ো হাড়! সমস্ত রাত্রি যেন কুকুরে চিবায়। গায়ের ব্যথায় সকালে উঠিতে পারি না। তুই এক কাজ কর। এই ছেঁড়া কাপড়খানা ছিঁড়িয়া নেকড়া কর্, আর সেই নেকড়া জানালার ফাঁকে ফাঁকে গুঁজিয়া দে। তাহা করিলে আর রাত্রিতে ঘরে হিম আসিবে না।"

আহ্লাদী বলিল,—"ঠাকুর-মা! সে দিন চোরকুঠরি ঝাড়িতে ঝাড়িতে একটা ভাঙ্গা বাক্সর ভিতর কতকগুলি চট দেখিয়াছি! সেই চট দিয়া পর্দা করিলে হয় না?"

গোপী বাবুর মাতা বলিলেন,—"চোর-কুঠরিতে চট কোথা হইতে আসিল?"

আহ্লাদী বলিল,—"তা জানি না। একটা ভাঙ্গা বাক্স, ডালা নাই, তাহার ভিতর রহিয়াছে দেখিলাম।"

গোপী বাবুর মাতা বলিলেন,—"চল্ দেখি। দেখি কি—চট, কোথা হইতে আসিল, আর তাহাতে পর্দা হইবে কি না।"

ঝিকে সঙ্গে লইয়া গোপী বাবুর মাতা চোর কুঠরিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। চোর কুঠরির ভিতর সহজেই অন্ধকার, তাহাতে সন্ধ্যা হইয়াছে। আহ্লাদী গিয়া প্রদীপ আনিল। একটা কাঠের বাক্সে কতকগুলা ছেঁড়া চট রহিয়াছে, গোপীবাবুর মাতা তাহা দেখিতে পাইলেন।

গোপী বাবুর মাতা বলিলেন,—"ওরে! ও আহ্লাদি! এই সেই চট! তোর মনে পড়ে? যে দিন মোহর চুরি যায়, সেই দিন গিরিশের কাছ হইতে বাক্স-মোড়া চট আমি আনিয়াছিলাম। সেই চটগুলি আনিয়া আমি এই বাক্সটার ভিতর ফেলিয়াছিলাম। তাহার পর সেই মোহর লইয়া হাঙ্গাম-হুজ্জৎ, মকদ্দমা-মামলা! এ চটের কথা আমি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সে আজ সাত আট বৎসরের কথা। এ চটগুলা দেখিয়া আমার প্রাণে যেন কেমন একটা আতঙ্ক হইতেছে।"

আহ্লাদী ঝি বলিল,—"হাঁ! ঠাকুর-মা! এ চটের কথা এখন আমার সব মনে পড়িতেছে। তাড়াতাড়ি আমরা দুই জনে আসিয়া এই বাক্সর ভিতর চটগুলা ফেলিয়া রাখিলাম। তাহার পর সেই হাঙ্গামা, সেই পুলিশের লোক। এখনও সে সব কথা মনে হইলে ভয় হয়। আহা! গিরিশ বাবু না কি মরমর হইয়াছেন।"

গোপী বাবুর মাতা উত্তর করিলেন,—"হাঁ। আমি শুনিয়াছি, ডাক্তারেরা জবাব দিয়াছে। ছুঁড়ীর দশা যে কি হইবে! এত দিন পরে এ চটে আর কি কোনও কাজ হইবে? পচিয়া হয় তো গোবর হইয়া গিয়াছে!"

একাদশ অধ্যায়

আবার সেই মোহর

গোপী বাবুর মাতা দুই হাতে অনেকগুলি চট ধরিয়া সেই বাক্স হইতে বাহির করিলেন। সেই চটের ভিতর হইতে তৎক্ষণাৎ একটি কঠিন বস্তু ভূতলে পতিত হইল, আর সেই উজ্জ্বল নূতন পয়সার মত কি সব ঘরের চারিদিকে গড়াইয়া গেল।

আহ্লাদী ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। গোপী বাবুর মাতা থপ্ করিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িলেন, আর বলিলেন,—"আহ্লাদি! আমাকে বাতাস কর, আমার গা ঝিম্-ঝিম্ করিতেছে।"

একটু সুস্থ হইলে তিনি পুনরায় বলিলেন,—"শীঘ্র গোপীকে ডাকিয়া আন্।"

আহ্লাদী তাড়াতাড়ি গোপী বাবুকে ডাকিয়া আনিল। মাতা বলিলেন,—"গোপী! এই দেখ, কি বাহির হইয়াছে!"

গোপী বাবু আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন যে চটের সঙ্গে সেই সাবানের বাক্স দুই ভাগ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে ও তাহার ভিতর হইতে মোহর সকল বাহির হইয়া ঘরের চারিদিকে গড়াইয়া গিয়াছে।

গোপী বাবু সাবানের বাক্সটি তুলিয়া লইলেন ও মোহর কুড়াইতে লাগিলেন। আহ্লাদী ঝিকেও কুড়াইতে বলিলেন।

আহ্লাদী বলিল,—"না, ও মোহরে আমি হাত দিব না, ও বড় অপয়া মোহর, যে ইহাতে হাত দিবে, তাহার সর্বনাশ হইবে।"

গোপী বাবু নিজেই সমস্ত মোহর কুড়াইয়া গণিয়া দেখিলেন যে,—ঠিক পঞ্চাশটি মোহর রহিয়াছে।

মাতা তখন বলিলেন,—"গোপী! আমি হতভাগীই তবে চোর? গিরিশের মত হাতে হাতকড়ি দিয়া আমাকে এখনি পুলিশের লোক ধরিয়া লইয়া যাইবে। আমাকে জেলখানায় পাঠাইয়া দিবে। পায়ে

বেড়ি দিয়া আমাকে সেই জেলখানায় রাখিয়া দিবে। তারকেশ্বরের মোহান্তকে যেরূপ করিতে হইয়াছিল, আমাকেও সেইরূপ করিতে হইবে। হাঁটু পর্যন্ত ইজের পরিয়া আমাকে ফুলগাছে জল দিতে হইবে, ঘানিগাছে সরিষা হইতে তেল বাহির করিতে হইবে। কালীঘাটে মোহান্তর পট কিনিয়াছিলাম, তাহাতে এই সব দেখিয়াছি। কি লজ্জার কথা—কি ঘৃণার কথা! এ বৃদ্ধ বয়সে আমি কি করিয়া ইজের পরিব, সে সব কাজ কি করিয়া করিব ?”

গোপী বাবু বলিলেন, “না, মা! তোমার সে সব ভয় নাই।”

মাতা বলিলেন,—“পুলিশে যদি এ কথা জানিতে না পারে, তাহা হইলে আমি নিজে গিয়া ধরা দিব। আমার পাপের জন্য সে ব্রাহ্মণের ছেলের কত না লাঞ্ছনা হইয়াছে! শুনিতেছি, সে মর-মর হইয়াছে। আজ সাত বৎসরের কথা হইল বটে, কিন্তু সেই দিন হইতে সে কখন সুখী হয় নাই। সেই অপমান সে কখনও ভুলিতে পারে নাই। সেই মনস্তাপে অবশেষে তাহার এই উৎকট রোগ হইয়াছে। আমার এই পাপের জন্য পুলিশে আমি নিজে গিয়া ধরা দিব। তার পর, না হয় গলায় দড়ি দিয়া, কি আফিম খাইয়া মরিব। কিন্তু ধর্ম জানেন, আমি জানিয়া শুনিয়া এ কাজ করি নাই। তাড়াতাড়ি যখন চট সব গুটাইয়া লইলাম, সেই সঙ্গে বোধ হয়, এই কাল বাক্সটাও গুটাইয়া লইয়াছিলাম। যতক্ষণ দালানে ছিলাম, ততক্ষণ তক্তপোশের উপর বাক্স দেখিয়াছিলাম। বাক্স যে সেইখানেই ছিল, সে সময় নিশ্চয় তাহাই আমার মনে হইয়াছিল। তাই বলিয়াছিলাম যে, যখন আমি বাড়ির ভিতর আসি, তখনও তক্তপোশের উপর বাক্স দেখিয়া আসিয়াছিলাম। এ মিথ্যা কথার জন্য নরকেও আমার স্থান হইবে না। কিন্তু ভগবান্ জানেন, ধর্ম জানেন, যে—জানিয়া শুনিয়া আমি এ মিথ্যা কথা বলি নাই।”

আহ্লাদী বলিল,—“আমিও তো সেই কথা বলিয়াছিলাম। অত শত কে জানে বাপু! দালানে গিয়া তক্তপোশের উপর মোহরের বাক্স দেখিলাম। আমরা তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর আসিলাম। তুমি বাছা যে চটের সঙ্গে বাক্স গুটাইয়া আনিবে, আমি কি করিয়া জানিব ? আমি

ভাবিয়াছিলাম যে, বাক্স সেইখানেই রহিল, এই মনে করিয়া আমিও সেই কথা বলিয়াছিলাম। আমারও কত পাপ হইয়াছে!"

এই কথা বলিয়া আহ্লাদী কাঁদিতে লাগিল।

মাতা বলিলেন, "গোপী! সেই সময়ে গিরিশের নামে নালিশ করিতে আমি তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম। তুমি আমার কথা শুন নাই। মাধব চক্রবর্তীকে ছাড়াইয়া দিতে মানা করিয়াছিলাম। তুমি আমার কথা রাখ নাই। তাহার পর গিরিশের প্রতি শত্রুতা করিতেও নিষেধ করিয়াছিলাম। সে কথাও তুমি আমার রক্ষা কর নাই। বিনাদোষে সেই ব্রাহ্মণের ছেলের প্রতি তুমি ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছ। সেই পাপে একদিনে তোমার চাঁদের মত দুইটি ছেলে গিয়াছে। সেই পাপে আমার শ্বশুরের বংশ নির্বংশ হইয়া গেল; এক গণ্ডুষ জল দিতে আর কেহ রহিল না!"

গোপী বাবু বলিলেন,—"আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলাম যে, গিরিশ আমার মোহর চুরি করিয়াছে, তাই এ কাজ করিয়াছিলাম। আর মা, আমাকে ভর্ৎসনা করিও না। সেই সব কথা মনে করিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে।"

মাতা বলিলেন,—"এখন তোমাকে একটি কথা বলি, শুন। নিশ্চয় ইহা মাতৃ-আজ্ঞা বলিয়া জানিও। যদি এবার আমার কথা না রক্ষা কর, তাহা হইলে ভগবান্‌কে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, নিশ্চয় আমি গলায় দড়ি দিয়া, না হয় বিষ খাইয়া মরিব।"

গোপী বাবু বলিলেন,—"কি আজ্ঞা করিবে, মা, তা বল। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয় আমি তাহা করিব।"

মাতা বলিলেন,—"তুমি এই মুহূর্তে গিরিশের নিকট যাও। তাহার হাতে-পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর এই মোহরগুলি তাহাকে দিয়া এস। ও পাপ মোহরে আমাদের কাজ নাই।"

গোপী বাবু উত্তর করিলেন,—"তার আটক কি, মা! আমি এখনি তাহাই করিব। এ পঞ্চাশটা মোহরের আর কতই মূল্য হইবে? বার-শ'

টাকার অধিক নয়। এ বার-শ' টাকা দিলে আমরা দুঃখী হইয়া যাইব না।"

মাতা বলিলেন,—"তবে এখনি তাহাকে এ মোহরগুলি দিয়া এস. আর বিলম্ব করিও না।"

দ্বাদশ অধ্যায়

গোপী বাবুর দান

মোহরের বাক্সটি হাতে লইয়া গোপী বাবু বাটী হইতে বাহির হইলেন। গিরিশের বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সরলার মাতা তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সরলার পিতা ঘরের ভিতর ছিলেন, তিনি তাঁহাকে দেখেন নাই। গোপী বাবু কাহাকেও কিছু না বলিয়া, গিরিশ যে ঘরে শুইয়া ছিলেন, বরাবর সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। সামান্য বাড়ি, গিরিশের ঘর কোন্‌টি অনায়াসেই তাহা বুঝিতে পারিলেন। ঘরের ভিতর সহসা এক জন পুরুষ দেখিয়া সরলা চমকিত হইয়া দাঁড়াইল। সরলার মাতা ঘরে প্রদীপ লইয়া আসিলেন।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া, স্তব্ধ হইয়া, গোপী বাবু গিরিশের মুখ-পানে চাহিয়া রহিলেন। মুদিত চক্ষে গিরিশ শুইয়া আছেন। কিন্তু গিরিশ আর সে গিরিশ নাই, সর্বশরীর শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, হাত-পা কাঠির ন্যায় হইয়া গিয়াছে, বিছানার সহিত তিনি যেন মিশিয়া রহিয়াছেন। কেবল পূর্বের ভাব—মুখশ্রীর বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

গোপী বাবুর চক্ষু দিয়া টস্‌ টস্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন যে,—"এই শোচনীয় দৃশ্যের এক মাত্র কারণ আমি। আমি পাপিষ্ঠ নরাধম।"

গিরিশ চক্ষু মুদিত করিয়া পড়িয়া আছেন। পার্শ্বে পাঁচ বৎসরের সেই মেয়েটি নিঃশব্দে বসিয়া রহিয়াছে। শীঘ্রই কি বিষম সর্বনাশ ঘটিবে, সেই পাঁচ বৎসরের বালিকা যেন তাহা বুঝিয়াছে। এ বয়সের

অস্থিরতা ও চপলতা সেই জন্য যেন সে তুলিয়া চুপ করিয়া এক স্থানে বসিয়া আছে। গোপী বাবু মনে মনে ভাবিলেন,—"আমার নিষ্ঠুর ব্যবহারের ফলে এই শিশুটি শীঘ্রই অনাথা হইবে। আমা অপেক্ষা নরাধম পৃথিবীতে আর নাই।"

বালিকাকালে সরলা পিতার সহিত গোপী বাবুর বাটীতে যাইত। সুতরাং গোপী বাবুকে সে বিলক্ষণ জানিত। এত শত্রুতার পর গোপী বাবুকে সহসা আজ তাঁহাদের গৃহে দেখিয়া সরলা বিস্মিত হইল। খাট হইতে নামিয়া সে ভূমিতে দাঁড়াইল। লীলা সভয়ে গোপী বাবুর মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

গোপী বাবু খাটের নিম্নে ভূমিতে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন; বসিয়া আস্তে আস্তে গিরিশের একটি হাত ধরিলেন। গিরিশ চক্ষু চাহিলেন।

গোপী বাবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"গিরিশ! গিরিশ! আমাকে ক্ষমা কর।"

ধীরে ধীরে গিরিশ উত্তর করিলেন,—"এ সময় কাহারও উপর আমার রাগ-দ্বেষ নাই। সকলকেই আমি ক্ষমা করিয়াছি।"

গোপী বাবু পুনরায় বলিলেন,—"গিরিশ, আমি অতি পাপিষ্ঠ; আমি অতি নরাধম। বিনাদোষে আমি তোমার প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছি। তোমার এ রোগের কারণ আমি। ক্ষমার পাত্র আমি নই বটে, কিন্তু তোমার হাতে ধরিয়া বলিতেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর!"

গিরিশ বলিলেন,—"আপনাকে আমি ক্ষমা করিয়াছি। আপনি নিশ্চিন্ত মনে বাটী প্রত্যাগমন করুন। আমার কথা কহিবার শক্তি নাই। আমি নিদ্রা যাইব।"

গোপী বাবু পুনরায় বলিলেন,—"তুমি যে সম্পূর্ণ নির্দোষ, আজ এই মাত্র তাহা আমরা জানিতে পারিলাম। জানিতে পারিয়াই তোমার নিকট দৌড়িয়া আসিয়াছি। সেই মোহর আজ পুনরায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আমার মা না দেখিয়া চটের সহিত গুটাইয়া মোহরের

বাক্স বাটীর ভিতর লইয়া গিয়াছিলেন। বাটীর ভিতর চোর-কুঠরিতে একটা ভাঙ্গা বাক্সে সেই চটের সহিত মোহরগুলি এত দিন পড়িয়া ছিল। আজ তাহা পুনরায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এই দেখ, সেই সাবানের বাক্স, আর ইহার ভিতর সেই পঞ্চাশটি মোহর।"

গিরিশ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"মোহর যে এক দিন না এক দিন পাইবেন, তাহা আমি নিশ্চয় জানিতাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আজ সেই ঘটনা ঘটিল। সকলে আমাকে নিরপরাধ বলিয়া জানিল, এই কথা আমি যে শুনিয়া যাইতে পারিলাম, সে জন্য আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই।"

গোপী বাবু বলিলেন,—"যাইবে কেন গিরিশ? কোথায় যাইবে? যত টাকা আবশ্যক হয়, তাহা দিয়া তোমাকে আমি ভাল করিব।"

গিরিশ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"আপনি নিজে ডাক্তার। আপনি সব জানেন। এক্ষণে আপনি বাটী গমন করুন, আমি আর কথা কহিতে পারিতেছি না।"

গোপী বাবু বলিলেন,—"আর কেবল একটি কথা বলি। তোমাকে আর অধিক কষ্ট দিব না। সেই কথাটি বলিয়াই আজ আমি বিদায় হই। পুনরায় কাল আসিয়া তোমার ভালরূপ চিকিৎসার আয়োজন করিব।"

গিরিশ জিজ্ঞাসা করিলেন;—"কি কথা?"

গোপী বাবু বলিলেন,—"এই মোহরগুলি তোমাকে দিয়া যাইতে মাতা আজ্ঞা করিয়াছেন। এ মোহরগুলি আমি রাখিয়া যাই। এ মোহর এখন তোমার, এ আমার নয়।"

গিরিশের মুখ ঈষৎ রক্তিমবর্ণে রঞ্জিত হইল। অপেক্ষাকৃত একটু উচ্চৈঃস্বরে তিনি বলিলেন,—"কি! ঐ মোহরগুলি আমি লইব! কখনই না!"

মোহর লইবার নিমিত্ত গোপীবাবু গিরিশকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কথা কহিতে গিরিশের অতিশয় কষ্ট হইতেছিল। এমন কি, এক্ষণে শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া-সম্পাদনেও তাঁহার ক্লেশ হইতেছিল।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে গিরিশ বলিলেন,—"মহাশয়! কথা কহিবার আর আমার শক্তি নাই। মিনতি করি, এ শেষ অবস্থায় আর আমাকে কষ্ট দিবেন না। আপনার মোহর কিছুতেই আমি লইব না। আপনার ইচ্ছা হয় গরীব দুঃখীকে ইহা দান করিবেন। আমার স্ত্রী কি আমার শ্বশুর-শাশুড়ী কেহ যেন এ মোহর স্পর্শ না করে,অনাহারে মৃত্যু হইলেও কেহ যেন আপনার নিকট হইতে একটি পয়সাও গ্রহণ না করে। সরলা, লীলা! যদি অনাহারে তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও এ মোহর কি ইহার একটি পয়সা কখন স্পর্শ করিও না। সরলা! আমার এই অন্তিম দশায় তোমাকে আমি এই আজ্ঞা করিলাম। কখনও ভুলিও না।"

একটু নিঃশব্দে থাকিয়া, গোপীবাবুর মুখপানে চাহিয়া গিরিশ পুনরায় বলিলেন,—"মহাশয়! বিনা অপরাধে আমার প্রতি যাহা কিছু অত্যাচার হইয়াছে, সে সব আমি ক্ষমা করিলাম। কিন্তু মোহর লইতে আর আমাকে অনুরোধ করিবেন না। আমার শ্বশুর-শাশুড়ী, অথবা আমার স্ত্রী, অথবা আমার কন্যা, আমার অবর্তমানে কেহ আপনার মোহর স্পর্শ করিবে না। এক্ষণে বাটি প্রত্যাগমন করুন। এই আমার শেষ কথা। আর আমি কথা কহিতে পারি না।'

এই কথা বলিবার পর গিরিশের মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। সরলা তাড়াতাড়ি আসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। তাহার পর হাত যোড় করিয়া সে গোপীবাবুকে বলিল,—"মোহরের কথা, মহাশয় আর কখন মুখে আনিবেন না। প্রাণ গেলেও আপনার মোহর কখনই লইব না। আপনি বাটি প্রত্যাগমন করুন। আপনাকে দেখিলে ইহার মনে কষ্ট হয়। এ স্থানে আপনার আগমন না করাই ভাল ছিল।"

গোপীবাবুকে সরলা একপ্রকার বাটী হইতে দূর করিয়া দিল। নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া মোহরের বাক্স হাতে করিয়া বিরস বদনে তিনি স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আর কেন ভাই

সরলা ও লীলা পুনরায় গিরিশের দুই পার্শ্বে বসিল। গিরিশ পূর্ববৎ তাহাদের হাত ধরিয়া রহিলেন। মোহর প্রদানের প্রস্তাব শুনিয়া উত্তেজিত হইয়াছিলেন, সেই কারণেই হউক, অথবা অন্য কারণেই হউক গিরিশের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, ঘন ঘন সবলে নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। নিশ্বাসে এক প্রকার শব্দ হইতে লাগিল।

সরলা অতিশয় ভয় পাইল। তাড়াতাড়ি পিতাকে সে সেই ঘরে ডাকিয়া আনিল। লাঠি ধরিয়া মাধব চক্রবর্তী অতি কষ্টে সেই ঘরে আসিলেন। ঘরে আসিয়া গিরিশের অবস্থা দেখিয়া তিনি স্ত্রীকে বলিলেন,—"শীঘ্র যাও। গোপালকে শীঘ্র ডাক্তার আনিতে বল।"

গিরিশ চক্ষু চাহিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "না মহাশয়! ডাক্তার আনিতে হইবে না। শীঘ্রই আমি সুস্থ হইব।

সরলার মাতা সে কথা শুনিলেন না। ডাক্তার আনিবার নিমিত্ত তিনি গোপালকে বলিতে গেলেন। গোপাল একজন প্রতিবাসী।

কিছুক্ষণ পরে গিরিশের বন্ধু সেই ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গিরিশের পার্শ্বে যেমনি তিনি খাটের উপর বসিয়াছেন আর তাহার পা লাগিয়া খাটের নীচে কি ঠন্ করিয়া পড়িয়া গেল। মস্তক অবনত করিয়া খাটের নীচ হইতে তিনি সেই বস্তুটি বাহির করিলেন। দেখিলেন যে, একটি শিশি, যে শিশিতে কল্য তিনি বারো দাগ ঔষধ দিয়াছিলেন। আজ দেখিলেন যে, শিশিটি সম্পূর্ণ খালি। গিরিশ। চক্ষু মুদিত করিয়া ছিলেন। ডাক্তার চক্ষু চাহিতে বলিলেন। গিরিশ চক্ষু চাহিলেন না। চক্ষুর পাতা টানিয়া ডাক্তার দেখিলেন যে, চক্ষু দুইটি ঘোর রক্তবর্ণ হইয়াছে, তারা দুইটি সঙ্কুচিত হইয়াছে।

সরলা, লীলা, মাধব চক্রবর্তী ও তাঁহার স্ত্রীকে ডাক্তার সে ঘর হইতে যাইতে বলিলেন। তাহার পর একাকী পাইয়া, খালি শিশিটি দেখাইয়া

তিনি গিরিশকে বলিলেন,—"গিরিশ, ছি ভাই! এমন কাজও করিতে হয়?"

গিরিশ অতি মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন,—"কি করি ভাই। না করিলে নয়। দুই দিন আগে কি দুই দিন পরে—এই বই তো নয়! আর গোটা কত দিন অধিক বাঁচিয়া স্ত্রী ও কন্যাকে পথের ভিখারিণী করিতে পারি না। করুণাময় জগদীশ্বর আমার প্রতি কৃপা করিবেন, তিনি আমার বিচার করিবেন। কাহাকেও এ কথা বলিও না ভাই!"

ডাক্তার বলিলেন,—"কাহাকেও বলি না বলি, আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। যথারীতি তোমার চিকিৎসা আমি করিব। এখনি তোমাকে বমন করাইব, তাহার পর তড়িত-যন্ত্র প্রয়োগ করিব।"

গিরিশ বলিলেন—"আর কেন ভাই। এ মৃত্যু-সময়ে কেন আর আমাকে যন্ত্রণা দাও।"

ডাক্তার বলিলেন,—"না ভাই। আমি কিছুতেই চুপ করিয়া থাকিতে পারিব না। সে অনুরোধ করিও না, সে অনুরোধ আমি কিছুতেই রক্ষা করিতে পারব না।"

গিরিশ বলিলেন,—তবে যা জান তাই কর। কিছু করিতে পারিবে না। কিন্তু ভাই, আমার নিকট সত্য কর যে, এ কথা জনপ্রাণী কাহাকেও বলিবে না। ইহার ভিতর প্রতারণা কিছুই নাই। যে ফণ্ডে টাকা দিয়াছি, তাহাদের নিয়ম ভঙ্গ করি নাই। সে যাই হউক, এ কথা কাহাকেও বলিও না। তুমি আমার বালক-কালের বন্ধু, মরণকালে তোমার নিকট এই ভিক্ষা চাই।"

ডাক্তারের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। গিরিশের নিকট তিনি সেইরূপ সত্যে আবদ্ধ হইলেন। তাহার পর সরলার মাতাকে একটু জল গরম করিতে বলিয়া তিনি ঔষধ ও যন্ত্রাদি আনিতে সত্বর গমন করিলেন।

সরলা লীলা পূর্ববৎ গিরিশের নিকট আসিয়া বসিল। শ্বশুর-

শাশুড়ীকে সে ঘরে আসিতে হাত নাড়িয়া গিরিশ নিষেধ করিলেন। সরলা ও লীলার হাত ধরিয়া গিরিশ পূর্ব্ববৎ শুইয়া রহিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

সমাপ্ত।

গিরিশের নিশ্বাস-প্রশ্বাস এতক্ষণ অতি সবলে পড়িতেছিল, অতি ব্যস্ত হইয়া তিনি যেন বায়ু আকর্ষণ করিতেছিলেন। ক্রমে নিশ্বাসের সে ভাব কমিয়া আসিল। সরলা মনে করিল যে, গিরিশ বুঝি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন ও তাঁহার বুঝি নিদ্রা আসিতেছে। কিছুক্ষণ পরে গিরিশ মৃদুস্বরে বলিলেন,—"কি সুন্দর!"

সরলা মস্তক অবনত করিয়া শুনিতে চেষ্টা করিল।

গিরিশ পুনরায় বলিলেন,—"রম্য দেশ! অতি সুন্দর! সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে। ঘোর হরিদ্‌বর্ণে আচ্ছাদিত প্রান্তর, অদূরে নানা বৃক্ষে সুশোভিত পর্ব্বতশ্রেণী। মাঝে নদী কুল-কুল শব্দে বহিয়া যাইতেছে। নদীতীরে প্রস্ফুটিত ফুলগুলির কি সুন্দর বর্ণ! কি অপূর্ব সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত। ঐ শুন মধুর বাদ্য! না, ও বাদ্য নয়, মন্দ মন্দ বায়ুহিল্লোলে আলোড়িত বৃক্ষ-পত্রের মর্ম্মর শব্দ। কিন্তু কি মধুর শব্দ! ঐ যে, আমার মা, নদীর অপর পারে দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিতেছেন। ঐ যে, আমার পিতাও তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। আরও কত লোক রহিয়াছে। যাই মা যাই! এখনি যাইব। কিন্তু নদী পার হই কি করিয়া? কতকগুলো কাদায় যে আমাকে জড়িত করিয়া রাখিয়াছে! না, এ কাদা নয়, আমার শরীর। যাই হউক, এ শরীরে আর আমার কাজ নাই। এ ক্লেদরাশি আমাকে বড় ভারি করিয়া রাখিয়াছে। এ ক্লেদরাশি হইতে একবার নিষ্কৃতি পাইলেই আমি বাঁচি। ছি ছি! পুরাতন পুষ্করিণীর পাঁকের মত কি কদর্য বস্তু! আমাকে যেন জড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছে। একবার

এগুলা দূর করিয়া পরিষ্কৃত হইতে পারিলেই আমি ও-পারে উড়িয়া যাই। তখন সব সুখ, সব শান্তি! যাই, মা, যাই! আর বিলম্ব নাই।”

সরলা মনে করিল,—গিরিশ প্রলাপ বকিতেছেন। গিরিশের নিশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল।

ঈষৎ চক্ষু চাহিয়া ধীরে ধীরে গিরিশ পুনরায় বলিলেন,—“সরলা! তবে ভাই, যাই! লীলা, মা! তবে আমি যাই। ঐ দেখ, নদীতীরে আমার বাবা ও আমার মা দাঁড়াইয়া আছেন। অতি সুন্দর, অতি রম্য দেশ, সবলা! আমার পিতা-মাতার কি জ্যোতির্ময় শরীর হইয়াছে! ঐস্থানে যত লোক দেখিতেছি, সকলেরই ঐরূপ দেবশরীর। ঠিক যেন নির্মল, সুশীতল, সূর্যকিরণ দ্বারা গঠিত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষের জ্যোতি দ্বারা ঐ প্রদেশ আলোকিত হইয়াছে। তাঁহার বিমল জ্যোতি দ্বারা ঐ পরলোকবাসীদের, ঐ দেবতনুসম্পন্ন লোকদিগের দেহ ওতপ্রোতভাবে সিক্ত হইয়া রহিয়াছে। সামান্য জলকণা যেরূপ মহাসাগরবক্ষে ক্রীড়া করে, সেইরূপ পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, রোগ জরা শোক তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, প্রিয়জনকে সঙ্গে লইয়া, সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া, ঐ দেবতনুবিশিষ্ট জীবগণ পরমানন্দে ক্রীড়া করিতেছে। আমার মা আমাকে ঐস্থানে ডাকিতেছেন। সরলা! আর আমি অপেক্ষা করিতে পারি না। লীলা মা! তোমরা যখন আসিবে, তখন তোমাদের জন্যও আমি ঐ নদীতীরে দাঁড়াইয়া থাকিব। ঐস্থানে রোগ নাই, শোক নাই, কোন দুঃখ নাই। তোমরা দুই জনে আসিলে, তখন সকলে একসঙ্গে থাকিব। আর কখন ছাড়াছাড়ি হইবে না। সরলা! লীলা! তবে এখন আমি বিদায় হই।”

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া গিরিশ পুনরায় ধীরে ধীরে বলিলেন,—“কিন্তু সরলা! কিন্তু লীলা! তোমাদের আমি গুটিকত কথা বলিয়া যাই। আমার এ শেষ কথা। আমার কথাগুলি কখন ভুলিবে না। লীলা এখন আমার এ সকল কথা বুঝিতে পারিবে না। লীলা বড়

হইলে, সরলা তুমি তাহাকে আমার এই শেষ কথাগুলি বুঝাইয়া দিবে। সকল লোক ঐ পবিত্র স্থানে যাইতে পারে না। এই পৃথিবীতে আসিয়া যাহারা সত্য-পথ হইতে বিচলিত হয় না, যাহারা কাহারও অনিষ্ট করে না; যাহারা হিংসা, দ্বেষ ও ঘৃণার চক্ষে কাহাকেও দর্শন করে না; যাহারা সেই সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষকে কখন বিস্মৃত হয় না; যাহারা সর্বদা তাঁহাকে হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাখিয়া জগতের হিতসাধনে জীবন অতিবাহিত করে,—কেবল তাহারাই ঐ সুখের স্থানে গমন করিতে পারে, কেবল তাহারাই প্রিয়জনকে লইয়া ঐ স্থানে অনন্তকাল থাকিতে পায়। সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষকে বিস্মৃত হইয়া যাহারা অন্যরূপে জীবন অতিবাহিত করে,তাহাদের পরলোক অন্যরূপ। সেই স্থানে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে তাহারা ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। দেখিও সরলা! দেখিও লীলা! তোমরা যেন ঐ সুখের স্থান হইতে বঞ্চিত হইও না। দেখিও, যেন পুনরায় তোমাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। আজ আমার পিতা-মাতা যেমন আমাকে আদর করিয়া ঐ পবিত্র জ্যোতির্ময় স্থানে লইয়া যাইতেছেন, যেন যথাকালে তোমাদিগকেও আমি সেইরূপ আদর করিয়া লইয়া যাইতে পারি। তবে সরলা! তবে লীলা! এখন বিদায় হই।”

গিরিশ নীরব হইলেন। একান্ত মনে তিনি ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

সরলা এখন বুঝিতে পারিল যে, গিরিশের অধিক বিলম্ব নাই। নিঃশব্দে সরলা কাঁদিতে লাগিল। চক্ষের জলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। পিতার অবস্থা ও মাতার কান্না দেখিয়া লীলা বিস্মিত মনে, মলিন বদনে, সজল নয়নে, একবার মায়ের মুখপানে, একবার পিতার মুখপানে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। গিরিশের নিশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমেই হ্রাস হইতেছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সরলা তাঁহাকে বাতাস করিতেছিল। একবার সে পাখা বন্ধ করিল। চকিত হইয়া সে দেখিল যে, গিরিশের গায়ে যে চাদরখানি ছিল, বক্ষঃস্থলে এতক্ষণ যাহা

উঠিতেছিল ও নামিতেছিল, তাহা আর নড়িতেছে না, চাদরখানি স্থির হইয়া গিয়াছে। শশব্যস্ত হইয়া সরলা গিরিশের নাকে হাত দিয়া দেখিল। সেই মুহূর্তে সরলা মূর্চ্ছিত হইয়া খাটের উপর হইতে ভূমিতে পতিত হইল। লীলা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সরলার পিতা-মাতা সেই ঘরে দৌড়িয়া আসিলেন। সেই মুহূর্তে ডাক্তারও পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার দেখিলেন যে, গিরিশ চিরদিনের নিমিত্ত ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন।

॥ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ॥

জন্ম ঃ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে (১২৫৪ বঙ্গাব্দের ৬ই শ্রাবণ) ২৪-পরগনা জেলার শ্যামনগরের কাছে রাহুতা গ্রামে। পিতার নাম—বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়।

কর্মজীবন ঃ ১৮৬৬-৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে তিন বছর বীরভূমের দুটি স্কুলে এবং পাবনা জেলার (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত) একটি স্কুলে শিক্ষকতা; পরে উড়িষ্যার কটক জেলায় পুলিসের দারোগাগিরি। ১৮৭০-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বেঙ্গল গেজেটিয়ার' সংকলন-দপ্তরে সংকলন-কর্মে নিযুক্ত থেকে বিশেষ কর্মদক্ষতার পরিচয় প্রদান। ১৮৭৫-৮১ খ্রীষ্টাব্দে তখনকার উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে এবং সংযুক্ত-প্রদেশের (এখনকার উত্তর-প্রদেশের) অযোধ্যায় ভারত-সরকারের 'কৃষি ও বাণিজ্য' বিভাগে কর্মরত। ১৮৮১-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-সরকারের রাজস্ব ও কৃষি দপ্তরের 'প্রদর্শনী বিভাগের' মুখ্য-পরিচালক। এর মধ্যে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতার 'বেঙ্গল ইকনমিক মিউজিয়ম'-এর সহকারী-অধ্যক্ষের কাজও করেন। এই সময়ের মধ্যে একবার ও পরে ১৮৮৭-৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আর-একবার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী সংগঠনের ব্যাপারে ইউরোপে গমন। ভারত-সরকারের নির্দেশ মতো সেই সময় তিনি ইতালি, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, জার্মনি, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন সংগ্রহশালা ও সরকারী দপ্তরে ভারতের উৎপন্ন দ্রব্যাদি ও কারুশিল্পের সংগ্রাহকরূপে কাজ করেন। ১৭৮৭-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতীয় জাদুঘর' (ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম)-এর সঙ্গে যুক্ত 'বেঙ্গল ইকনমিক অ্যাণ্ড আর্ট মিউজিয়ম'-এর সরকারী কিউরেটার। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ।

সাহিত্যজীবন ঃ ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ।

গ্রন্থাবলী ঃ (ইংরেজী) এ হ্যাণ্ড বুক অব্ ইণ্ডিয়ান প্রোডক্টস্ অ্যাণ্ড র-মেটিরিয়াল্‌স্' (১৮৮৩); আর্ট ম্যানুফ্যাকচার্স অব্ ইণ্ডিয়া (১৮৮৮); এ ভিজিট টু ইয়োরোপ (১৮৮৯); ব্রাস্, ব্রোঞ্জ অ্যাণ্ড কপার ম্যানুফ্যাকচার্স (১৮৯৪); পটারী অ্যাণ্ড গ্লাসওয়্যার অব্ বেঙ্গল (১৮৯৪-৯৫)। (বাংলা) কঙ্কাবতী (১৮৯২); ফোকলা দিগম্বর (১৯০১)। মুক্তমালা (১৯০২); মজার গল্প (১৯০৬); ভূত ও মানুষ (১৯০৭); পাপের পরিণাম (১৯০৮); ডমরু-চরিত (১৯১৩)।

মৃত্যু ঃ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে, ৭৩ বছর বয়সে।